আরব সাগরের জল লোনা

কালকূট

লেখকের অন্যান্য বই ●

প্রাচেতস্
কোথায় সে-জন আছে
চলো মন রূপনগরে
মৃত্তবেণীর উজানে
মনভাসির টানে
নির্জন সৈকতে
মিটে নাই তৃষ্ণা
হারায়ে সেই মানুষে
কোথায় পাবো তারে
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে
বাণীধ্বনি বেণুবনে
প্রেম নামে বন
বনের সঙ্গে খেলা
মন চল বনে
অমাবস্যায় চাঁদের উদয়
তুষার সিংহের পদতলে
অমৃত বিষের পাত্রে
স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

পূর্ণতার স্বাদ। তা কি জীবনে কখনো মেলে? আমার জীবনে তো মেলে নি। মনে করি, নিরন্তর এই মানব জীবনের স্রোতধারায় কখনো তা মেলে না। তাই মানুষ চলেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, তার বহুতর আশা আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা নিয়ে। কথাগুলো মনে এল এই রচনাটির কথা ভেবে। লিখে যা শেষ করতে পারলাম না, পূর্ণতার থেকে অপূর্ণতাই যেন বেশি রয়ে গেল। আরব সাগরের কূল থেকে নিয়ে আসা আমার বঙ্গপুটে আশ্রিত আরো কতো মুখ, কতো মানুষ, কতো বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্রতর ঘটনা, বিচিত্রতম বিস্ময়।

সব কথা বলা হল না। বাঁধা বুলির মতন সেই কথাটিই বলি, পরবর্তী সংস্করণে আরো সংযোজনের ইচ্ছা রইল। তখনো কি বলতে পারবো, পূর্ণতাকে পেলাম। বোধ হয় না। তাই বলি, এই রচনার বর্তমান রূপে অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণতার একটি ছায়া টানতে চেয়েছি।

কালকূট

মনে ভ্রম, তাই কি ভ্রমি, না কি, ভ্রমি, ভ্রমের ঘোরে। সেই যে আপন ঘোরে, ক্ষ্যাপা গেয়ে ফেরে, 'মন চল যাই ভ্রমণে···' এ কি আমার সেই ঘোর। ঘরছাড়া, দূরে ফেরা, বিবাগী বৈরাগী যে না, মন জানে তা। অনেক টান, ঘরে, ঘরের মানুষে, তার চার পাশকে ঘিরে। ঘরছাড়া, ইতচ্ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কোনটা হতে চাই না। কে বা চায়। তথাপি, কে না বাঁশি বায়ে বড়ায়ি, কালিনী নই কূলে। ঘরকন্নার দমচাপা ছুটোছুটির মধ্যে, কার বাঁশি বেজে ওঠে। বাঁশি কালিন্দীর কূলে বাজে, না কি ঘরছাড়ার হাতছানি, আপন মনে বাঁশি বাজায়, বুকের খাঁচায়।

কোঁচড় ভরে তো সোনা তুলতে চেয়েছি ওহে আমি লক্ষ্মীমন্ত হব। সংসারের ফরমায়েশে, উদয়াস্ত খেটে, ঝকঝকিয়ে তুলব নিজের ঘেরা। বঞ্চিত করে রাখতে যদি চায় কোন ব্যবস্থা, তবে লড়ি, লড়ব। লাঞ্ছনাকে নেব গলায়, সাপ জড়ানো মালার মত। মনে মনে এমন অঙ্গীকার। এখানে থাকা, এ্যাকালযে'ড়ে স্বার্থ-পরটি না। সংসারে সবাই যাতে রত, তাতে আমিও অবিরত। এ তো উচিত কথা, ন্যায্য কথা। তা না হলে ফাঁকি। মিলজুলে থাক, মিলে মিশে খাও, সুখ দুঃখে ভাগাভাগি কর, হাত ধরে চল। তাতে কোঁচড়ে সোনা আসবে, আসবে। কানাকড়ি হলে বা ক্ষতি কী। যা দানা জোটে, খুদ্‌পিপাসা মিটুক তাতেই।

সংসার ছাড়া তুমি না। সমাজে কোটির একটি কণা, দেখা যাক বা না যাক। তারই আবর্তে তুমি নিরন্তর। মানো বা না মানো, দাবী মানতে হবে। আমি সংসার, আমার দাবী মানতে হবে। আমি কর্ম, আমার দাবী মানতে হবে। আমি সমাজ, নীতি, আমি বহুর কণ্ঠস্বর, আমার দাবী মানতে হবে। মানতে হবে। না হলে কবুল করতে হবে, পলাতক পলাতক।

মানি মানি মানি। এত রোল গোল করো না, ভেতরটা

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ছাড়তে চাইলেই কি, ছাড়া যায়। নিজের মন বলে কোন কথা নেই? সংসার কি আমাকেও একটা মন দেয় নি? আসলে নিজেই যে জড়াজড়ি লেপটে থাকতে চেয়েছি।

তথাপি, বুকের বাতাসে, হাড়ে বাজে শিস। সেই কালিনী নই কূলের কথা। কেউ সেখানে বসে বাজায় কি বাজায় না, জানি না। বাঁশি শুনি নিজের বুকে। বাঁশি সুরে কথা কয়, মন চল যাই ভ্রমণে···

তা-ই জিজ্ঞাসাবাদ, মনে ভ্রম, তাই কি ভ্রমি, নাকি, ভ্রমি, ভ্রমের ঘোরে। পিছনে ফাঁকি রাখতে মন নেই। দাবী ষোলকলা পূরণ, প্রয়োজনের তৃণকুটাটি তুলে দিয়ে, তারপরে সময়। ডাকাডাকি হাতছানিতে, সারাদিনে অনেক চমক লেগেছে। দিশাহারা হয়ে, থমকে, চোখ ফেরাতে গিয়ে, দিশায় ফিরেছি। তারপরে কোঁচড় ঝেড়ে দিয়ে, ঝাড়া হাত পা খালাস। এবার ত্বরায় চল হে, ত্বরায় চল। এ চলা যদি লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া হবে, তবে, ডানার পাখায় কেন ঝাঁপতাল বাজে। শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া পাখীটার শিস দিয়ে ওঠা, মিঠে ঝংকার কেন শোনা যায়। এতদিনে কেন মনে হল, পাখীর ভাঁজে ভাঁজে যত ধূলা ময়লা পোকা, সব সাফ সুরত হালকা ঝরঝরে। কেন খুশিতে মন নাচে, অথচ চোখের জল গলতে চায়। মনের আশমান জুড়ে, এ কি রৌদ্র মেঘের খেলা, হেসেও যায়, কেঁদেও যায়।

এমন যদি হয়, তবে না হয়, লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া হওয়া গেল।

কিন্তু মন এমন করে, এ কিসের ভ্রমণ? কেমন ভ্রমণ? এ ভ্রমণের স্বরূপ কী? কেমন যেন ধন্দ লাগে, লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া, কোনটাই না, ঘরছাড়ার বিরাগ। ঘরে থেকেও সে বিবাগী। যেন, ঘরেতে যাকে সেবা করেছে, শ্রমে আর স্বেদে, বাইরে তাকেই নতুন করে খুঁজতে যাওয়া। ঘরের চার দেওয়ালের মাঝখানে, যে ছিল বিগ্রহের বেশে, বাইরে তার অন্য রূপের হাতছানি।

তীর্থভ্রমণ নাকি!

এমন কথা ভিতর থেকেও কোনদিন কবুল করি নি। কবুল করার দায় কোথায়। তীর্থে যাদের গমন, ধর্মে তাদের মন

অবিরত। স্থান-মাহাত্ম্যে অচলা ভক্তি। ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিটি বিষয়ে, মন মরে খুঁতখুঁতিয়ে। আচার-আচরণে সদা শশব্যস্ত। কোথায় না জানি কতটুকু অনাচার হয়ে গেল। বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ শংকা, দেবতা কখন কতখানি রুষ্ট হলেন। সব কিছু বাঁচিয়ে, সর্ব উপাচারে দেবতার পূজা শেষ হলে, তবে সার্থক তীর্থভ্রমণ।

সে যার বিশ্বাস, তার বিশ্বাস। এমন তীর্থের হাতছানি আমি কোনদিন দেখিনি। ডাক শুনি নি। তাই তীর্থভ্রমণের কবুল আমার নেই। তবু যে বিগ্রহের কথা এল, তাকে কবুল না করে উপায় নেই। যদি সংসারকে মন্দির বলি, তবে সংসারের মানুষরাই আমার বিগ্রহ। নিত্য নিরন্তর যারা আমার পায়ে পায়ে ফেরে, কাজে কর্মে থাকে, তারা আমার বিগ্রহ। এই বিগ্রহকেই কি আমি অন্য রূপে, অন্য কোনখানে খুঁজতে যাই? চেনা অচেনার মাঝে যে বহু আর বিচিত্র। অপরূপ থেকে অরূপে যে বিরাজ করে, সেই বিগ্রহের মন্দির আকাশের নীচে। দেওয়াল গেঁথে, মাথা ঢেকে, সে বিগ্রহকে রাখা যায় না। সে অবস্থান করে পাহাড়ে সমতলে, অরণ্যে সমুদ্রে, নগরে বন্দরে। চিনি চিনি করে তাকে চেনা হয়ে ওঠে না। অচেনার ঝাপসায় সে মিটি মিটি হেসে যায়, নানা বেশে। যেন সে আমাকে এক রহস্যের গোলকধাঁধায় টেনে নিয়ে যায়।

এমন যদি হয়, তবে চল, সে বিগ্রহের সন্ধানে যাই। সেই তীর্থ সার করি।

কিন্তু ধাঁধা দেখি নিজের মধ্যে। নিজের মধ্যে মিটিমিটি হাসি দেখে, নিজের দিকে ফিরে তাকাই। এত হাসির ঘটা কিসের?

দেখছি, মিথ্যাবাদীটা এতক্ষণে ধরা দিয়েছে। সাত কাহন করে শিবের গীত গেয়ে, এখন বলে, ধান ভানিতে যাই। একে শঠ বলে, না প্রতারক? বিরাগ বিরাগ রূপ অরূপ ধর্ম তীর্থ বিগ্রহ, সব বয়ানের পরে, এখন কবুল করে, সব ঝুটা হ্যায়। চলেছি মহাপ্রাণীকে ঠাণ্ডা করবার ধান্দায়। অর্থাৎ কী না, রোজগারের ফিকিরে, যাকে বলে পেটের ধান্দায়।

ছি ছি ছি। সোজা কথা সহজ করে বলতে শিখলাম না কোনদিন। কেবল কথার বুড়বুড়ি। তার চেয়ে বলি না কেন,

যে-পসরা আপন হাতে গড়ে, ফেরী করে বেড়াই, তারই ডাক এসেছে। আসলে আমি ফেরীওয়ালা। কাগজে কলমে, আঁকি-বুকি কাটি, হিজিবিজি দাগি। যা গড়ি, তা একলা গড়ি, একলা ঘরে বসে। তারপরে, ঘরের বাইরে এসে হেঁকে বেড়াই, 'কে নেবে গো আমার হিজিবিজি কথার কাটাকুটি। কেউ নেয়, কেউ নেয় না। কেউ ভ্রূকুটি করে ঠোঁট ওলটায়। কেউ খুশির রঙে ঝলকায়। তবে মোদ্দা কথা, গালি আর কালি, কলঙ্ককে করেছি অঙ্গের ভূষণ। তার মধ্যেই, যেটুকু স্নেহ ভালবাসা জোটে, তাকে নিই অনেকখানি করে, অনেক বড় করে। নইলে চলি কোন্ জোরে।

এমনি এক পসরার ডাক এসেছে, তাই চলেছি। তার জন্য, এত বুড়বুড়ি কাটবার দরকার ছিল না। অভ্যাস খারাপ কী না, তা-ই। তথাপি, একটা কথা না বললে চলে না। কেবল কি মাল বয়েই খালাস? কলা বেচাই কি সার? রথ দেখাটা কি নেই? আসলে রথ দেখব, সেই খুশিতেই এত কথা। শুধু কলা বেচার ডাক হলে, সব শূন্য, শূন্য থেকে যেত। জীবনে রথ দেখাটা আছে বলে, কলা বেচাটা চালিয়ে যাওয়া যায়।

সময় যায়, পসরার ডালি কাঁধে নিয়ে এবার চল। ডাক এসেছে আরব সাগরের কূল থেকে। আরব সাগরের কূলে যাই, বঙ্গোপ-সাগরের কূল থেকে। কেবল একটি কথা বলব না। আরব সাগরের কূলে, কোন্ রকমের হাটে চলেছি পসরার ডালি নিয়ে, কী বা সে হাটের নাম। গেলে পরে জানা যাবে, দেখা যাবে, সে হাটের রঙ কেমন, রকম কেমন। সে হাটের অনেক নাম, অনেক গরব। তা যদি বলি, তবে একথাও বলতে হয়, শুনেছি, সে হাট বড় গরমও বটে। এ ফেরীওয়ালার তা সইলে হয়। কিন্তু এখন থেকে, সে হাটের নাম বলে দিলে, তোমাদের চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উঠবে। মন ঝনঝনিয়ে উঠবে, কৌতূহলের ঝলকে। রাশি খানেক জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে মারবে আমার মুখের 'পরে। তোমাদের চিনি তো।

কিন্তু আমি জবাব দেব কেমন করে। আগে যাই, দেখি, তারপরে জবাব।

বোঝ এখন অবস্থা। ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে, হাওয়াগাড়ির দরজায় ঠেক। ঢোকবার উপায় নেই, বেজায় ভিড়। এদিকে ঘণ্টা যদি বাজিয়ে দেয়, তবে রইলাম পড়ে। তাই কখনো থাকতে পারি? সকলের সঙ্গে গায়ে পায়ে চলতে হবে।

কিন্তু কার গায়ে পায়ে চলব। দরজা জুড়ে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনি দরজা থেকে মহৎ, আয়তনের ক্ষেত্রে। তাঁর ঘাড় কামানো কাঁচা-পাকা চুলের গোছ। পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে, বড় করে কাঁধ কাটা ফুল লতা পাতা দাগানো জামা, তাঁর বিশাল পৃষ্ঠ আর নিতম্ব ছাড়িয়ে, হাঁটুর একটু ওপরে থেমেছে। পায়ের গোছা আর গুলি দেখে বলতে ইচ্ছা করে, মায়ের গতরটি শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, বেশ ভয় দেখাবার মত।

এমন মানুষ ঠেলে ঢুকব, সে সাধ্য আমার নেই। তার ওপরে, এঁদের আমরা মেমসাহেব বলে জানি। যদি একবার চোখ পাকিয়ে তাকান, তা হলেই ভিরমি যাব। ধমক দিলে তো কথাই নেই।

কিন্তু হাওড়া ইস্টিশন বলে কথা। আমি ঠেক খেলে তো আর আমার পিছন ঠেক খাবে না। এক গণেশদাদা, পেটটি নাদা, মারলেন এসে ধাক্কা। 'আরে ভাই যানে দো।' তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, আগে গণেশদাদার রাস্তা করে দিলাম। দেখি, এবার আমার ঢোকা কে ঠেকায়। আমি গণেশদাদার কিছু পিছু, গায়ে গায়ে।

সত্যি, বঙ্গ-সন্তানেরা কোন কর্মের না। শোন তো কেমন হাঁক, 'আরে এ মেমসাব, দরজা সে হটিয়ে না। ঘুস্‌নে দিজীয়ে।'

মেমসাহেবের শরীর যেন একটু নড়ল। একবার পিছন ফিরে তাকালেন। মায়ের মুখে অনেক ভাঁজ পড়েছে। চোখের কোলে মাংস ঝুলন্ত। তা হোক, রঙের পালিশ মোটা। ঠোঁটের রঙ চড়া। একটু কড়া তবিয়তে বললেন, 'ঠায়রো না বাবা, গার্ডকো টিকেট দেখাতা।'

তার চেয়ে চড়া সুরে শোনা গেল, 'আরে টিকেট দেখানা হ্যায় তো অন্দর যাও বাবা। মুঝে ভি তো চড়না।'

তারপরে দেখ, কেবল কথায় না, একেবারে গায়ে গায়ে ঠ্যালা। ঠ্যালাতেই ঠ্যালা বোঝা যায়। মেমসাহেব ভিতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গণেশদাদা। ঢুকতে ঢুকতেই গণেশদাদা পিছন ফিরে হাঁক দিলেন, 'আ যাও।'

আমাকে নাকি ? তেমন তো কোন কথা ছিল না। পিছন ফিরে তাকালাম। তা-ই বল। কলাবউটি যে আমার পিছনেই। গণেশদাদার পিছনটি আমি বে-আইনী দখল নিয়েছি। নিয়ে যখন ফেলেছি, উপায় নেই। ভিতরে ঢুকে যেতেই হল। অন্যথায় কলাবউটির ঢোকবার রাস্তা বন্ধ। তবে, কলাবউ তো, কলাবউই। চোখের নজর যত সাফই থাকুক, মুখ দেখতে পাবে না। চোঁদ্দ হাত শাড়ি দিয়ে, মাথা মুখ ঢাকা। নিতান্ত ভাগ্য করেছ, তা-ই গাদা খানেক কাঁচের চুড়ি পরা, দু-খানি গোরা রঙের হাত, কনুই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ। কাঁচের চুড়ির বহর দেখে, এইটুকু মাত্র বোঝা গেল, গণেশদাদা শেঠজী লোক না। তা হলে গিন্নীর গায়ে কয়েক কে. জি সোনা চাপানো থাকত।

ভিতরে ঢুকে, একটু সরে গিয়ে, কলাবউয়ের রাস্তা করে দিলাম। মনে হল যেন, হাঁসের খোঁয়াড়ে ঢুকেছি। এপাশ ওপাশ নড়বার উপায় নেই। মালের বহর তেমন নেই বটে। মানুষেই ছয়লাপ। তার ওপরে নড়াচড়ার জায়গা দখল করেছে, তিনতলা ব্যবস্থা। এর নাম থ্রি টায়ার শিলপার। গরীবদের শুয়ে যাবার স্বপ্নটা এই রকমই হয়। কামরার যে খবরদারি করবার পাহারাদার—থুড়ি, গার্ড, এ্যাটেনডেন্ট গার্ড যার নাম, সে টিকিটের নম্বর দেখে, জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। পোর্টারের সাহায্য নিয়ে, মালের খাঁচায় মাল ভরে দিচ্ছে।

তেমন মালের বহর আমার নেই। চামড়ার পেটিকাটি তাদের হাতে দিয়ে, টিকিটের নম্বর দেখে, জায়গা খুঁজে নেবার দায়টুকু নিজেই নিলাম। নম্বর অনুযায়ী, দুই বেঞ্চির মাঝখানে ঢুকতে

গিয়ে, আবার সেই ঠেক। সেই মেমসায়েব। তিনি এখন দুই বেঞ্চির মাঝখানে, গলির মোড় আগলে দাঁড়িয়ে। যতদূর জানি, ঘুমোতে যাবার আগে, নীচের বেঞ্চিতে বসবার ঠাঁই। সে হিসাবে তো এখন সন্ধ্যারাত্রি। তা ছাড়া, এক বিষয়ে আমার পরম সৌভাগ্য, যাকে বলে দোতলা, আমার শোবার ঠাঁই জুটেছে সেখানেই। টিকিটে সেইরকম ব্যবস্থা। একতলার ভিড়ের থেকে, দোতলা ভাল। বসে থাকা যাত্রীরা শুতে না গেলে, নিজের শোবার উপায় নেই। তেতলাটা আবার একটু বেশি উঁচুতে। খাঁচা খাঁচা ভাবটা বড় বেশি। সোজা হয়ে বসতে গেলে, মাথা ঠেকতে চায়।

কিন্তু মেমসাহেব মা ঠাকরুণ কি আদপেই আমাকে এগিয়ে গিয়ে বসতে দেবেন। কোনরকমে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে, ভিতরের অবস্থা দেখে, মনটা যেন কেমন ছ্যাৎ-ছ্যাৎ করে উঠল। আরো তিন মেমসাহেব ভিতরে মুখোমুখি দুই বেঞ্চিতে ছড়িয়ে বসে আছেন। সঙ্গে একটি সাহেবও আছে। তবে তার বয়স বারোর ঊর্ধ্বে না। বাকী মেমসাহেবরা যদি ঠাকরুণের কন্যা হয়, সেটা আশ্চর্যের না। বয়স বোধ করি, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে সবাই আছেন। মনটা ছ্যাৎছোতিয়ে যাবার কারণটা সেখানেই। আমার কপালে কেন এত মেমসাহেবের ভিড়। ভিতরটা যে এখন থেকেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল। এর পরে, বোবা হয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। দুটো রাত তো কাটাতে হবে। একটু মাতৃভাষায় যে কথাবার্তা হবে, সে উপায় নেই। এক আধজন দাদা, ভায়া না থাকলে, মাতৃভাষাতেও বাজতে অসুবিধা। দিদি বউদিরাই বা কবে, পরপুরুষের সঙ্গে, হঠাৎ মাতৃভাষায় বেজে ওঠেন।

তবে ওই একটু যা, কথাবার্তা চলা ফেরায় একটু দিশী আওয়াজ আর গন্ধ পাওয়া যেতে পারত। সে গুড়েও বালি। তবে বোবা হয়ে থাকবার মত দাওয়াই অনেক ঝোলা ভরে নিয়ে এসেছি। চোখ আর মন, সেদিকে রাখলেই হবে। পাতার পরে, পাতা উল্টে যাওয়া নিয়ে কথা। তা ছাড়া, হাওয়ার গাড়ির সঙ্গে, আমার চোখ কি দৌড়বে না ? নানা দেশের নানা রূপ, চোখের সীমা ছাড়িয়ে, ভিতরের বোবাটাকে, নিঃশব্দে অনেক কথা বলিয়ে ছাড়বে। অতএব ছাড় মনের ছ্যাৎ-ছ্যাতানি। তুমি আপনার, আমি আপনার। কার কথাতে, কার কী আসে যায়।

যে-ভাষায় বললে, মেমসাহেব বুঝতে পারবেন, সেই ভাষাতেই বলি, 'দয়া করে আমাকে একটু এগিয়ে যেতে দেবেন ?'

মেমসাহেব তাঁর তখন সঙ্গের মানুষদের-পরিচালনায় ব্যস্ত। কে কোথায় শোবে, বসবে, কোন্ জিনিস কোথায় থাকবে। কথা শুনে, আমার দিকে ফিরে তাকালেন। নজর দেখলেই বোঝা যায়, তাঁকে আমি কোন মতেই খুশি করতে পারিনি। মুখের ভাবে বিরক্তি। এমন কি একটু সন্দেহও। পরিষ্কারই তাঁর নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার টিকিট কি এখানে নাকি ?'

বিনীতভাবে যা জবাব দিলাম, তার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ, টিকিটটা সেইরকম।'

বাকীদের নজরও তখন আমার দিকে। নজর ধরা মোহনরূপ নিয়ে, সংসারে জন্মাতে পারি নি, তবে নজর খোঁচানো চেহারা বটে। সকলেই নজর দিয়ে খোঁচা দিলেন। যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে চাইলেন, এমন সুখের ঘরে, এই মূর্তিমান অ-সুখটি কেমন। এমন কি বছর বারো বয়েসের সাহেবটির পর্যন্ত, আমাকে পছন্দ না। মেমসাহেবরা সবাই একবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলেন। ঠাকরুণ নিতান্ত অনিচ্ছায় একটু পাশ দিলেন। নিরুপায়, মাতৃবক্ষ ঘেঁষেই আমাকে, দুই বেঞ্চির গলিতে ঢুকতে হল।

এর পরে, একটু বসবার ব্যবস্থা। নতুন আর অচেনার ওপরে, মানুষ বড় নির্দয়। সহজে তাকে কেউ জায়গা ছাড়তে নারাজ। আমার প্রথম লক্ষ্য, বারো বছরের সাহেবের ওপরে। সে জানালা ঘেঁসে বসে আছে। তার পাশে যিনি বসে আছেন, তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। সম্ভবতঃ সাহেবের মা। মহিলাটির চোখে খুশির ছায়া মোটেই নেই। তবে, চোখের দৃষ্টি, প্রবেশ নিষেধের তির্যক ভঙ্গিতে হানা নয়। একটু লম্বাটে মুখ, ডাগর চোখ আর টিকলো নাক, ছিপছিপে নম্র শরীরটিকে জড়িয়ে, হালকা নীল জামায়, তাঁকে কেমন যেন একটু দয়ালু আর শ্রীময়ী দেখাচ্ছে। তাঁর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম, 'আমি কি এখানে বসতে পারি ?'

তিনি কোন জবাব না দিয়ে, বেঞ্চির একেবারে একটা ধারে সরে গেলেন। এক পাশে খোকাসাহেব, আর এক পাশে তিনি। মাঝখানটা পেয়েও, আমি একটু সাহেবের পাশ ঘেঁসে বসলাম।

কাঁধের ঝোলাটা এবার একটু নামাবার অবকাশ পাওয়া গেল। সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখতে গিয়ে, নিটোল দুজোড়া গোরা রঙের পা দেখতে পেলাম। হাঁটুর কাছ থেকে দেখতে পেলাম। হাঁটুর কাছ থেকে দেখতে পেলাম বললে, মিথ্যে কথা বলা হয়। তার থেকে আরও কিছু ওপরে। দিশী চোখে সব কিছু সয় না। তাই বলি, চোখের মাথা খা, নজর ফেরা। সব কিছু সইতে হবে, এমন হলপ তোমাকে কেউ করতে বলেনি। সায়া শাড়িতে পায়ের কনুই অবধি ঢাকা থাকলেই, সকলের সব কিছু ঠিক হয়ে যায় না। হয়তো মেমসাহেবদের, হালের চাল বজায় রাখতে গিয়ে, জামা একটু বেশি ছাটাই হয়েছে। যাদের যেমন চলে। ভারতবর্ষের এমন অনেক জায়গায় দেখেছি, পুরুষদের কোমরের কাছে এক চিলতে কানি। যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে, একটি অঙ্গই কোনরকমে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। পীনপয়োধরাকে দেখেছি, বুকের কাপড়ে বালাই। হাট করে খুলে কোদাল চালাচ্ছে, নয় তো চাঁদের মুখে গুঁজে দিয়েছে। এতে আর দেশী বিদেশী চোখের কি আছে। যাদের যে রকম চলে। তোমার না সইলে, চোখ ফিরিয়ে নাও।

ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, চোখ তুলে তাকালাম। একজন বাইশ তেইশ, আর একজন পঁচিশ ছাব্বিশ। অনুমান এইরকম বলে। যদিও সেই কথাটা মানতে হয়, নানী আর পানীর বিষয়ে হক করে কিছু বলতে যেও না। তবে নানীদের বয়সের বিষয়েও না। নানীর মন, আর আশমানের পানীর মর্জি নাকি জবর ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার। তেইশ যদি একহারা, পঁচিশ দোহারা। একহারা অর্থে রোগা না। ছিপছিপে ভাবের মধ্যে, স্বাস্থ্যের ঝলকে টলটলানো। চোখদুটি ডাগর বলা যাবে না, তবে টানা ভাবের। একেবারে শান্ত না, যদিও নজরের ভাব-সাবে খুবই সহবত। কিন্তু মেঘের মত কালো তারায়, কেমন যেন একটু চিকুর হানার উদ্যোগ হয়ে আছে সব সময়েই। এমন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। কখন যে হেসে বেজে, খিলখিলিয়ে উঠবে, বা ঠোঁট যাবে বেঁকে, কিছুই বলা যায় না। নাকটি একটু বোঁচাই, তবে ল্যাপচা বসিঁচ না। মুখখানি মিঠেই বলতে হবে, মেমসাহেবি ঝাঁঝ তেমন দেখি না। সে সব বরং পুরোপুরি পঁচিশেই ঝলকানো। দোহারা বলতে যা বোঝায়, তুলনায় তার থেকে, মাংসপেশির একটু যেন বাড়াবাড়ি। মোটা

না হলে, নাক-চোখের ভাব-ভঙ্গি যথেষ্ট ধারালো হত। চোখের তারা আশমানী নীল বলা যায় না, একটু মার্জারির ভাব আছে। যাকে বলে, চনমনে ভাব, সারা চোখে-মুখে, সেই ভাবটি বেশি। অঙ্গের ভাব-ভঙ্গিকেও যদি চনমনে আখ্যা দেওয়া যায়, তবে তাই। রাঙানো ঠোঁটের কোণে কিঞ্চিৎ উপেক্ষার হাসি। নিশ্চয় এই অ-সুখ অধর্মটির জন্যই। বেশ বুঝতে পারছি, বেঞ্চির এপারে ওপারে ঠোঁট টেপাটিপির খেলা চলেছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকরুণ, এখনো আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। বোঝা গেল, বাকীদের এত চোখাচোখি, ঠোঁট টেপাটিপি সেই জন্যই। চুপ করে থাকা গেল না। সেই যে ভেবেছিলাম, আমি আপনার, তুমি আপনার, অতএব চুপচাপ, তা হবার নয়। নিরীহ বিনীত সুরে বাজলাম, 'আমি আপনাদের মাঝখানে এসে পড়ে, নিশ্চয়ই অসুবিধে করে ফেললাম।'

ঠাকুরুণ সঙ্গে সঙ্গে, অসন্তুষ্ট স্বরে বেজে উঠলেন, 'তা, তোমার যখন এখানেই টিকিটের নম্বর পড়েছে, অসুবিধে হলেই বা কী করা যাবে।'

'যখন এখানেই টিকিট' মানে কী? ঠাকরুণের কি ধারণা, মিথ্যা বলেছি? নিশ্চয় টিকিট দেখিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করতে হবে না। বলতে বলতে ঠাকরুণ বসলেন। দোহারা পঁচিশকে পাশাপাশি দেখে মনে হল, এক রকম চেহারা। মা মেয়ে না হয়ে যায় না। ওদিকে আবার চোখাচোখি, ঠোঁট টেপাটিপি। কী অস্বস্তি বল দিকিনি। একজন চেনাশোনা সঙ্গী থাকলেও, অস্বস্তি একটু কম হত। যেন এখানে আমার জায়গা হয়ে, কী চোর দায়ে ধরা পড়েছি।

ঠাকরুণ ফটাস করে তাঁর হাতের ব্যাগ খুললেন। চটপট, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে, ঠোঁটে চেপে সিগারেট ধরালেন। নাক মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে, আমার দিকেই আবার তাকালেন। গালে একটা থাপ্পড় খেয়েছি, এমন ভাব আমার হয়নি। তবে নজর যে একটু থতিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে গেলাম। সেই মুহূর্তেই ভারিক্কি গলায় প্রশ্ন, 'তুমি যাবে কোথায়?'

বললাম, 'গাড়ি যেখানে শেষ থামবে।'

'বম্বে?'

'বোম্বাই।'

কথাটা শুনে যেন ঠাকরুণের নতুন করে ধন্দ লাগল আমাকে দেখে। ভ্রূকুটি করে তিনি আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপরে আমার ঝোলার দিকে, মার্জারি তারায় ইঙ্গিত হেনে বললেন, 'এত দূরের যাত্রায় এইটুকু তোমার ঝোলা?'

গলায় রীতিমত সন্দেহ। অবাক ছায়াটা এবার বাকীদের চোখেও, সেই সঙ্গে একটা রুদ্ধ হাসির ঝিলিক যেন চিকচিকিয়ে উঠছে। বললাম, 'একটা সুটকেস আছে, খাঁচায় চলে গেছে।'

ঠাকরুণ প্রায়, পুরনো রাজভাষায় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আরে সুটকেসে কী হবে? তুমি শোবে কিসে, তোমার বিছানাপত্তর কোথায়?'

তা বটে। তাঁদের বিছানাপত্রের যে রকম ছড়াছড়ি, বালিশে তোশকে চাদরে, সেই হিসেবে আমি তো রাস্তার ভিখিরি। বললাম, 'ঝোলার মধ্যে একটা চাদর আছে।'

'একটা চাদর!'

যেন এমন কথা ঠাকরুণ আর কোনদিন শোনেননি। তিনি ধূমপান করতেও ভুলে যাচ্ছেন। আর আমার মনে হল, পঁচিশের দোহারা শরীরে কেমন যেন একটু কাঁপন ধরেছে। সোনালি চেনের ঘড়ি বাঁধা হাতে, মুখে রুমাল চাপা। ঝকঝকে নীল তারা তিরিশের দিকে নিবদ্ধ। তেইশের মুখ, জানালা দিয়ে, প্রায় বাইরের দিকে। তবে রঙ পালিশ নখওয়ালা পাঁচটা আঙুল, তার ঠোঁটেও চেপে বসেছে।

এক তো, এখানে কেন রেল কোম্পানি আমাকে জায়গা দিয়েছে, সেটাই এক ঝকমারি। এখন বিছানা না থাকার কৈফিয়তও দিতে হবে। কী জ্বালা বল দিকিনি। বলতে বাধ্য হলাম, 'ব্যাগটাই মাথায় দিয়ে শোব!'

'দু' রাত্তির?'

ঠাকরুণের কথা শেষ হবার আগেই, কোনদিকে যেন, সরু গলায় খিক্ করে একটু বেজে উঠল। ঠাকরুণ তার পাশের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাণ্ডখানা দেখ।'

কাণ্ডখানা দেখবার জন্যই বোধহয়, দুজনে চকিতে একবার

আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে, একেবারে খিলখিলিয়ে বেজে উঠল। হাসিটা ঠিক আমার মধ্যে সংক্রামিত হল না।

অস্বস্তিতেই একটু আড়ষ্ট হাসি হাসতে হল। আর মনে মনে কেমন যেন অবাক লাগছিল, কালা মানুষকে নিয়ে, ধলা মহিলারা আবার এত হাসাহাসি করে নাকি! মান যায় না! অবিশ্যি, ধলা মহিলাদের কোন পরিচয়ই জানা নেই। দেখে এদের মেমসাহেব বলেই বুঝতে পারছি।

এবার আমার বেঞ্চি থেকে, শ্রীময়ী শান্ত তিরিশ, ঠাকরুণকে বললেন, 'ওর যখন কোন অসুবিধে হচ্ছে না, তখন আর বলার কী আছে।'

ঠাকরুণ এতক্ষণে আবার সিগারেট টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। রুমাল দিয়ে, বিশাল ঘাড়-গর্দানের ঘাম মুছলেন। সেই সঙ্গে অনেকখানি প্রসাধনও। বললেন, 'না, বলার আর কী থাকতে পারে। তবে এমন তাজ্জব ব্যাপার আমি কখনো দেখিনি। একটা লোক কলকাতা থেকে বম্বে যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটা চাদর ছাড়া আর কোন বিছানা নেই। একটা ভিখিরিও এর থেকে বেশি বিছানা নিয়ে চলে।'

বুড়ি মোটেই বুড়ি নয়। তার ওপরে যাকে বলে মন্দ, প্রায় তাই। মুখে ক্যাটকেটে কথা। পুরুষ হলে বোধহয়, এক মাত্র এই একটি অপরাধেই, আমাকে জোর করে নামিয়ে দিত। কিন্তু মহাশয়ার এত কথা বলবারই বা কী আছে। এ অধম ভিখিরি কিংবা রাজা আছে, তা নিয়ে ওঁর এত সমালোচনা কেন? গ্রীষ্মের দেশের মানুষ। ঘাস পেলে, ঘাসে গা এলিয়ে দিয়ে শুই। ঠাণ্ডা মেঝে পেলে, গা পেতে দিয়ে শুই। রেলগাড়ির এই গরমে, তোশক-বালিশের গরম যদি আমার ভাল না লাগে, তাতে ওঁর এত রোখা আওয়াজের দরকার কী? আমার দরকার নেই তাই, এ দেশের মানুষ তো, রাস্তার শানে শুয়েও আরামে চোখ বোজে। জঙ্গলের শুকনো পাতার ওপর শুয়ে, অঘোরে ঘুমোয়। মাঠের মানুষ, ঘরে ফিরে, লেপামোছা কাঁচা দাওয়ায় সুখে নিদ্রা যায়।

তিরিশের কী একটু দয়া হল, জবাব দিলেন, 'তা বলে কি ওঁর আর বিছানা নেই মনে করছ! নিয়ে আসোন।'

আমি প্রায় কৃতজ্ঞ হয়ে তিরিশের দিকে একবার তাকালাম। ঠাকরুণ দেখছি দমবার পাত্রী না। নিজের ভাষায় বললেন, 'সেটা আমি বিশ্বাস করছি, ওর বাড়িতে নিশ্চয় বিছানাপত্র আছে। কিন্তু তা বলে, এ ভাবে কেউ ট্রেনে চলে না।'

আমি আবার একটু না বলে পারলাম না, 'ভীষণ গরম তো, তায় আবার ট্রেনের কামরা। দরকার পড়বে না বলেই নিয়ে আসিনি।'

তারপরে তিনি যা বললেন, তাতে, আমার চেয়ে, আমার শ্রবণই অবাক বেশি। প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি থামো তো হে ছোকরা, মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করো না। ছেলেদের এরকম বাউণ্ডুলে বৃত্তি, আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

কথাগুলো বিদেশী ভিন্ ভাষায় না হলে, মনে হত, বাঙালী জাঁদরেল মহিলার ধমক। এবার তেইশ খানিকটা বিরক্ত আর অনুরোধের সুরে ডাক দিয়ে উঠল, 'মা।'

মা গলগলিয়ে নাক-মুখ দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। আর ঠিক এ সময়েই, ঘণ্টা বাজল, গার্ডসাহেবের বাঁশি বাজল। গাড়ি দুলে উঠে, চলা শুরু করল। ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে, ঘাড়ের দু'দিকে আর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। সিগারেট খাওয়া, রাঙানো ঠোঁট জোড়াও যেন একটু নড়ল। আমি যেন শুনতে পেলাম, 'দুর্গা দুর্গা!'...

ভাষাটাই আলাদা। মনে বোধহয়, সবাই এক। আমার মা যদি পাশে থাকত, তা হলে নিশ্চয় কপালে হাত ঠেকিয়ে, দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করত। ঠাকরুণের এও এক রকমের খ্রীস্টানী দুর্গা দুর্গা! তারপরে দেখলাম, বুকের জামার মধ্যে হাত গলিয়ে দিলেন! আবার বের করে নিয়ে এলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর ঈশ্বরের প্রতীক-চিহ্ন স্পর্শ করলেন। রক্ষা এই, বিছানা-প্রসঙ্গটা বোধহয় গেল। কিন্তু তাঁর কথার ঝাঁজে যেন তেমন মেমসাহেবি বাজল না। বরং বিপরীত। ভদ্রতার রীতিনীতি

মাপকাঠির ওপরে, একটু যেন গায়ে পড়া শাসন ধমকের সুর। যে-মুখ দেখে, এতক্ষণ জাঁদরেল সাহেবের ভিন্‌দেশী রোখপাকের ভয় লাগছিল, এখন আর তা মনে হচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল, বেশ-বাস রূপ আর আচার-আচরণ ভাষা বাদ দিলে, এ ঠাকরুণ একেবারে অচেনা না। এ মুখ, কোন সংসারেই বিরল না। কেবল ওপরের ছাপটাতেই যা ধন্দ।

অবিশ্যি, মনের সঙ্গে, এত মিটমাট করে ফেলাও ভাল না। অন্তত দুটো রাত্রি দুটো দিন, যতক্ষণ না ভালয় ভালয় কাটে।

যাত্রীদের কথাবার্তায়, গোটা বগী কলকলাচ্ছে। এতক্ষণে একটু অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পাওয়া গেল। তবে তাকাবার জায়গাই বা কোথায়। এ-গাড়ির ঘরের ছক আলাদা। একদিক দিয়ে যাওয়া-আসার সরু রাস্তা। বাকী সব খুপরি কাটা। মুখোমুখি তিন ধাপ তিন ধাপ, ছয় ধাপ শোবার জায়গা। এদিকের মানুষ ওদিকে দেখতে পায় না, ওদিকের মানুষ এদিকে না। একমাত্র যাওয়া-আসার সময়।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, স্বয়ং গণেশদাদা, যাওয়া-আসার রাস্তার ধারে, আমাদের সামনের জানালাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তার বেশি না নিঃসন্দেহে। মুখে যৌবনের কাঁচা ছাপ। গোঁফজোড়া যত বড়ই হোক, তেমন শক্ত মোটা বাজখাঁই করে তোলা যায়নি। কিন্তু একটি কথা মানতে হবে। দাদার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মতই প্রাগৈতিহাসিক। বয়সের গাছ-পাথর নেই। কারণ, গণেশদাদা এখন কেবল খালি গায়ে না। গরমের জ্বালায়, ধুতিটিও হাঁটুর ওপরে উঠেছে। নিশ্চয় মেমসাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য না। তাদের ওটা ছাঁটকাটের পোশাক। আর গণেশদাদার পোশাকটা এখন পোশাকি চাল ছেড়ে বিকারগ্রস্ত। ঘামও কম বজ্জাতি করেনি। হাওয়ায় শুকোবার মুখে, এখন চুলবুলিয়ে উঠেছে। তাই গণেশদাদা ভুঁড়ি মুড়ি সব, দশ আঙুলে খসখসিয়ে চলেছে।

আমি একটু ভয়ে ভয়ে, ঠাকরুণের দিকে তাকালাম। যা ভেবেছিলাম, তাই। তাঁর দু-চক্ষে বিরক্তি আর ধরছে না। রাগে নাকের পাশ কুঁচকে উঠেছে। কটকটিয়ে দেখছেন গণেশদাদাকে। তারপরে তিরিশের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখেছ ?'

সবাই একযোগে দেখল, আর একযোগেই খিলখিলিয়ে বেজে উঠল। ভেবেছিলাম, হাসির শব্দে, গণেশদাদা বুঝি একবার ফিরে তাকাবে। কিন্তু সময় নাহি রে, সময় নাহি রে। তাপ আর স্বেদ যে-জ্বালা দিয়েছে, এখন বাতাসের আরামে আর চুলকোবার সুখে, জগতের শ্রেষ্ঠ রূপসীদের মুক্তোঝরা হাসি বাজলেও, শোনবার সময় নেই। হাসিটা এবার আমার মধ্যেও সংক্রামিত হতে চাইল। কিন্তু একেবারে বেজে উঠতে লজ্জা পেলাম। ঠোঁটের টিপুনিটা ঠেকানো গেল না।

তবে ঠাকরুণ যে-ভাবে, তাকিয়ে আছেন গণেশদাদার দিকে, একটা কিছু বলে বসবেন বোধহয়। কিংবা নাকি, লোকটার না ফিরে চাওয়াতেই, ঠাকরুণের রাগটা আরো বেশি ঝলকাচ্ছে। খিলখিলিয়ে বাজা হাসিটা এখন থামবার মুখে। ঠাকরুণ একবার সকলের দিকে ভ্রুকুটি চোখে তাকালেন। ভাবখানা, গণেশদাদার মত একটি জীবকে কী বলা যায়। তারপরে গণেশদাদার দিকে ফিরে, তিনি শুধু একটি তীব্র স্বরে মন্তব্য করলেন। যার মানে, 'একটা যাচ্ছেতাই !'

ঠিক এ সময়েই গণেশদাদা ফিরে তাকাল। প্রশ্নহীন নিরীহ চোখ-মুখ, কোন বিকার নেই। সকলের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখল। হাত কিন্তু থামেনি। সে তার কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠে, তেইশের গায়ে ঢলে পড়ল, আমি তো চমকেই উঠেছিলাম। তারপরে অবাক হয়ে দেখি, স্বয়ং ঠাকরুণের বিশাল বপু থরথরিয়ে কাঁপছে। তাঁর শ্লেষ্মা জড়ানো গলায়, হাসি বাজছে খলখলিয়ে।

গণেশদাদার বোধহয়, এবার একটা কিছু মনে হল। তার নিরীহ চোখে, এবার একটু অবাক ভাব দেখা গেল। একটু বা জিজ্ঞাসা। হাসিটা চলেছে সমান তালে। গণেশদাদার বোধহয় আর আমাদের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হল। কাপড়টা তেমনি গুটিয়ে ধরে, সে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে গেল। যাঁহাতক যাওয়া, হাসিটা আরো উচ্চ রোলে ধ্বনি তুলল। সেই সঙ্গে, চোখে-মুখে রক্তের ছটা। কেবল ভাবতে পারিনি, ঠাকরুণের এই শরীরে আর এমন খাণ্ডার মুখের আড়ালে, এত রসের ধারা আছে। যেন বন্যার ঢেউয়ে বাজছেন। কোনরকমে একটু সামলে নিয়ে বললেন,

'রোজা, ঈশ্বরের দোহাই, একটু থাম্। আমি আর হাসতে পারছি না।'

রোজা, অর্থাৎ পঁচিশ রুদ্ধশ্বাস হাসির মধ্যেই বলল, 'আমি কী করব। ভাবলেই আমার হাসি পাচ্ছে। ওকে যদি আবার আমি ওভাবে দেখি, তাহলে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

রোজার কথাতেই, হাসিটা আর একবার উচ্চ রোলে বাজল। তেইশ বলে উঠল, 'কিন্তু রোজা তুই হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠেছিস, আমারই ফিক ব্যথা লেগে গেছে বুকের কাছে।'

রোজা বলল, 'কী করব বল্ লিজা। আমি নিজেকে সামলাবার জন্য, মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম। কিন্তু লোকটার মুখ দেখে, আমি আর কিছুতেই থাকতে পারলাম না।'

হাসির তোড়টা চলল সমানে। দমকটা আমার মধ্যেও প্রচণ্ড। কেবল শব্দটাকে গলার কাছে, আটকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। এখন চেষ্টা সার্থক হলে বাঁচি। এ রোগ বড় সংক্রামক। গণেশদাদার মুখটাই আমার বারে বারে মনে পড়ছে। ভাবতে ইচ্ছা করছে, এদিকে তাকিয়ে গণেশদাদা কী ভেবে চলে গেল।

কামরার অনেক মানুষের, অনেক কথার মধ্যে, মনে হচ্ছে যেন রাষ্ট্রভাষার ঝংকার বেশী। বাংলা পাঞ্জাবী কিছু কিছু সেদিকে কান দিয়ে, নিজেকে একটু অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করলাম। চোখ তুলে, ওপরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ছোট একটি চামড়ার সুটকেস। তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, মিসেস এম, গোমেজ। গোমেজ যদি পদবী হয়, তাহলে শব্দটা একেবারে অচেনা না। আগেও শুনেছি, অথবা কেতাবে পড়েছি। যতদূর জানি, এ পদবী ইংরাজের না। সঠিক করে জানি না, ডাচ না ওলন্দাজ না পর্তুগীজ। ভারতবর্ষে কেউ-ই এরা নয়া মানুষ না। অনেককালের পুরোনো। এরা নিজেদের ভারতীয় মনে করে কী না, কে জানে। কিন্তু ভারত ওদের কোনদিক থেকেই রেহাই দেয়নি, রক্তে-মাংসে ঢুকে গিয়েছে। জন্ম মৃত্যু এই মাটিতে। ভারতবর্ষের বাইরে, কোথাও এদের পা রাখবার মাটি নেই। যে-বেশে, যে ইচ্ছা নিয়েই ওরা একদা এ দেশে এসে থাকুক, ধন-রত্ন যা কিছুই নিয়ে গিয়ে থাকুক, নিজেদের ওরা সর্বাংশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ওরা আমাদের রক্তে মিশেছে। আমরা ওদের রক্তে

মিশেছি। একদা ওদের যত নির্দয় রূপই থাক, মহাকালের প্রহারটা ওদের ওপর দিয়েও কম যায়নি। প্রকৃতি নিজের হাতে অনেক প্রতিশোধ নিয়েছে। ভারতবর্ষের ধূলায় ওরা কেবল নামে ভিন্ন হয়ে আছে, কিন্তু মিশিয়ে গেছে রেণু রেণু হয়ে।

গোমেজরা যদি পর্তুগীজ হয়, তাহলে ইংরাজের থেকে তারা আমাদের পুরোনো দিনের চেনা। ফিরিঙ্গি কাকে বলে, জানি না। ফিরিঙ্গি বললে, পাশ্চাত্যের মানুষকে হেয় করা হয় কী না, তাও জানি না। কিন্তু অ্যাংটনি ফিরিঙ্গি নাম বাঙালীর কাছে, কবির নাম। কবিয়ালের নাম। নামেই একমাত্র ভিন্ন, অ্যাংটনি ফিরিঙ্গি বাঙালী কবির নাম। খ্রীষ্টান বলে বিদ্রূপ করলে, কবির জবাব ছিল 'কৃষ্টে আর খ্রীষ্টে কিছু তফাত নেই রে ভাই / শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।'

রূপে রঙে যাই হোক, গোমেজরা আমাদের মতই ভারতীয়। পর্তুগালের সঙ্গে ওদের কোন পরিচয় নেই। জীবনে সে দেশের চেহারাও দেখিনি। সেই হিসেবে, ভারতের মত এমন রূপের খেলা আর কোথায় বা আছে। এমন বর্ণবাহার কে কবে কোথায় দেখেছে। আমার দেশের সেই তো গৌরব।

আজকের ভারতবর্ষ, আগের তুলনায় আমার কাছে, দীন বলে মনে হয়। একদা তার ওপরে বিদেশীরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দখল করেছে, লুট করেছে, তারপরে যা নিয়ে গিয়েছে, দিয়েও গিয়েছে, কম না। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল, শেষ দখলদারের অনেক চাতুর্য ছিল। কিন্তু আজকের মত ভয়াবহ খেলা, ভারতবর্ষকে নিয়ে, আর কখনো হয়নি।

দেওয়া-নেওয়া মিল-মিশের যে ভারতবর্ষ, সেখানে আজ কোন দখলদারকে চোখে পড়ে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে যে সবাই দখল করে আছে, তলে তলে খাচ্ছে, তা নিষ্ঠুরতার থেকেও ভয়ংকর। সেই সব দখলদারের লুটের ধারা আলাদা। যুদ্ধের কানুন ভিন্ন। তারা ভারতবর্ষের চরিত্রের ওপরে থাবা বসিয়েছে। দাঁত বসিয়েছে ধ্যান-ধারণায়। লোভে আর ইতরতায়, তারা সব থেকে বেশী সার্থক হয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে তারা ভারতকেই লেলিয়ে দিতে পেরেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে অসুস্থ ভারতের দিকে তাকিয়ে, ওদের মুখের নোংরা হাসিকে আড়াল করে রেখেছে।

তথাপি, দায় তো আমাদেরই। এখন আত্মীয়-বিরোধের সময়। জ্ঞাতি-বিরোধের কাল। এর শেষ চেহারাটা কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, কে জানে। পেরিয়ে যাবার, একটা নয়া পরিণতির পথে যাবার দায় আমাদেরই।···

'ওহে শুনেছ?'

ঠাকরুণের গলা শুনে, ফিরে তাকালাম। আমাকেই ডাকছেন নাকি? ইতিমধ্যে হাসির তোড়টা থেমেছে। দেখলাম গোমেজ ঠাকরুণ আমার দিকেই ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে আছেন। দুই আঙুলের ফাঁকে, আর একটি সিগারেট জ্বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলছেন?'

জবাবে বললেন, 'তুমি কি কালা নাকি? তিন-চারবার করে ডাকছি।'

ধমকের সুরটা ঠিক আছে। কিন্তু মানুষ বুঝতে বোধহয় আর অসুবিধা নেই। তিন-চার বার ডেকে সাড়া পাননি, দেড় হাত ফারাকে। লজ্জা পাবার মত ব্যাপার। বললাম, 'আমি একটু—'

আমার কথা শেষ হবার আগে তিনিই বেজে উঠলেন, 'বাড়ির কথা ভাবছিলে? অনেক দিনের জন্য যাচ্ছ বুঝি? ওখানে কি চাকরি কর? নাকি বেড়াতে যাচ্ছ?'

একে বলে পুছ করা। কত জবাব দেবে দাও। কথা কোন্‌দিক থেকে আসছে, আন্দাজ পাচ্ছি না। বললাম, 'একটু বেড়াতেই যাচ্ছি।'

তারপরেই নতুন জিজ্ঞাসা এক পায়ে খাড়া, 'তুমি কি বাঙালী?'

মনে মনে বলি, গোটা চেহারা জুড়েই তো নামাবলী জড়ানো। এর পরেও আর জিজ্ঞাসা থাকে নাকি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'সে তো আমি আগেই বুঝেছি।'

তথাপি জিজ্ঞাসা। নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই বোধহয়, যদিও কারণ কী, কে জানে। রোজা, লিজা আর আমার পাশের তিরিশ এবং

খোকাসাহেব সকলেই ঠাকরুণের কথা শুনছে, আর বাঙালীটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। রোজার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় লাগছে। লিজার দিকে চেয়েও বটে। ঠাকরুণের কথা শুনতে শুনতে, আমাকে দেখতে দেখতে, নিজেদের মধ্যে ওরা চোখাচোখি করছে। ওদের ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায়, একটা ঝর্ণাধারা যেন থমকে আছে। হঠাৎ ঝরঝরিয়ে যেতে পারে। গেলে, সেই তোড়ে, আমাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না!

লিজা বলে উঠল, 'মা এত বকবক করতে পারে!'

মা বলে উঠলেন, 'বকবক আবার কী। ও যখন আমাদের মাঝখানেই রয়েছে, তখন কথা বলতে দোষ কী।'

বলে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, আমার কথায় তুমি বিরক্ত হচ্ছ?'

এর পরে জবাব দিতেই হয়, 'না তো।'

রোজা লিজা তিরিশের দিকে তাকালো। সকলের ঠোঁটেই হাসি। ঠাকরুণ বললেন, 'আমিও তো তাই বলি, বিরক্ত হবার কী আছে। আমি বাপু অত ভদ্রতা করে, চুপচাপ থাকতে পারি না। দুটো কথা বৈ তো না।'

ঠাকরুণ রাঙানো ঠোঁটের ফাঁকে, বাঁধানো দাঁতে হাসলেন। মেমসাহেব নিয়ে যে একটা দূরত্বের ভয় ছিল, সান্নিধ্যের অস্বস্তি ছিল, সেটা আমার কেটেছে। আর সত্যিই তো, দুটো কথা বৈ তো না। কথা তোমার দৌলত নেবে না, গায়ে পায়ে কষ্ট দেবে না। তবু কথাকেও যে বড় ভয়! দুটো কথা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে। কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়। পাগল করেও ছাড়তে পারে, কথার এমন গুণও আছে। কে জানে ঠাকরুণের কথার দৌড় কতখানি।

লিজা বলল, 'তবে চালিয়ে যাও।'

কথা শেষ হতে পেল না। একটু ছোটর ওপর দিয়ে, তিনজনেই খিলখিলিয়ে বাজল। ঠাকরুণ বললেন, 'মেয়েরা আমার বড্ড পেছনে লাগে, বুঝলে?'

লাগে কী না জানি না। সম্মতির রূপ দিয়ে, একটু হাসতেই হয়। কিন্তু এত সব দেখবার অবকাশ ঠাকরুণের নেই। মেমসাহেব বলে যদি ভেবে থাকো, দিশী গিন্নীর ধরন-ধারণ বাদ, তা হলে

ভুল। রোজা-লিজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এ দুটি আমার মেয়ে। রোজা আর লিজা। আর এটি আমার ছেলের বৌ মেরী। ওটি আমার নাতী বিল্।'

একে বলে পরিচয় পাড়া। যেমন তেমন ব্যাপার তো নয়। এর রীতিনীতি আছে। হাসতে গিয়েও, হাসিকে ঠেক দিয়ে, সকলেই আমার দিকে চেয়ে, মাথা ঝাঁকালো। মায়, বিল্ পর্যন্ত। সেই সঙ্গে, আমার মাথাকেও অনড় রাখা গেল না। হেসে ঝেঁকে, এবার আমাকেও প্রথানুযায়ী নিজের নামটি ঘোষণা করতে হল। ওদিক থেকে রোজা বলে উঠল, 'আর ইনি আমাদের মা, শ্রীমতী মোনালিসা গোমেজ।'

গোমেজ ঠাকরুণ বেশ বড় করে হাসলেন। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, লিওনার্দোর আঁকা, মোনালিসার মুখ। মিল খোঁজার দরকার কী। একটা নাম তো মাত্র! গোমেজ ঠাকরুণ যে যৌবনে দেখতে নেহাত খারাপ ছিলেন না, তা রোজাকে দেখলেই বোঝা যায়। মায়ের সঙ্গে ওর মিলটা প্রায়, ভাগের অংকে পঁচানব্বুই। আমাকে আবার একটু সহবতে বাজতে হল, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে খুশি হলাম।'

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'আমরাও। আর তোমাকে দেখে, ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে।'

রোজা ফিক করে হেসে ফেলল। বাকীরা নিঃশব্দে। আমার কিছু বলার নেই। ঠাকরুণ বললেন, 'না না, হাসির কথা না। এক একটা ছোকরাকে দেখলেই যেমন বাজে বলে মনে হয়, তোমাকে সে-রকম লাগছে না। এতখানি রাস্তা একসঙ্গে যাব। বাজে ছোকরা হলে, জ্বালাতন করে মারবে। আবার বোকা চুপচাপ হলেও খারাপ। তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। বোকা আর পাজী, কোনটাই আমার ভাল লাগে না।'

যাক, অন্ততঃ ওই দুটি বিশেষণ ঠাকরুণ আমাকে দিতে চান না। একে বলে সার্টিফিকেট। যদিও বোকামি করে ফেলাটা আমার হাতে নেই। পেজোমিটা কাদের কাছে কী করলে হয়, তাতেও বিস্তর মতভেদ। কিন্তু এটুকু পরিচয়েই সব শেষ না। ঠাকরুণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সিগারেট খাও?'

এতক্ষণে সেই অবকাশই মেলেনি। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত

দিয়ে বললাম, 'খাই।'

তিনি নিজের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমারটা নাও না।'

ততক্ষণে আমার প্যাকেট হাতে উঠে এসেছে। সেদিকে দেখে, ঠাকরুণ বললেন, 'তোমারটা অবিশ্যি অনেক দামী সিগারেট। তা হলেও, এখন আমার একটাই খাও।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

আমাকে দিয়ে, ঠাকরুণ পুত্রবধূ মেরীর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। মেরী জবাব দিল, 'ভাল লাগছে না।'

'আবার কি মাথা ঘুরছে নাকি?'

মেরী যেন একটু লজ্জা পেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না।'

ঠাকরুণ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার যে কত রকমের জ্বালা, সে তুমি না শুনলে বুঝতে পারবে না।'

লিজা বলে উঠল, 'মা, সে জন্য ওঁকে জ্বালাতন করে লাভ কী?'

আমি লিজার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না না, জ্বালাতনের কী আছে।'

লিজা মেরী আর রোজার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মুখ ঘুরিয়ে নিল জানালার দিকে। বাতাসে ওর কালো চুলের গোছা, মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ঠাকরুণের দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি তখন শুরু করেছেন, 'আমার স্বামী থাকেন গোয়ায়। সেখানেই আমাদের বাড়ি ঘর দোর। বেচারী বুড়ো মানুষকে একলা থাকতে হয় সেখানে। আমার তো থাকবার উপায় নেই। এক ছেলে থাকে বম্বেতে, আর এক ছেলে কলকাতায়। বোঝ তা হলে ব্যাপারটা। বছরে আমাকে অন্ততঃ একবার গোয়া বম্বে কলকাতা করতে হয়। চারটিখানি কথা তো নয়।'

ঘাড় নেড়ে আমাকে সায় দিতে হয়, 'তা তো বটেই।'

ঠাকরুণের কথা থেকে শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাঁর বড়ছেলে থাকে কলকাতায়। ছোটছেলে বম্বেতে। দুজনেই চাকরি করে। রোজাকে নিয়ে, ঠাকরুণ ছোটছেলের কাছে বম্বেতেই বেশি সময় থাকেন। লিজা প্রায় ছেলেবেলা থেকেই কলকাতাতে, দাদার কাছে থেকেছে। কলকাতাতেই লেখাপড়া করেছে। তবে

কলকাতায়, এত চেষ্টা করেও, লিজার একটা চাকরি যোগাড় হল না। বম্বেতে চলেছে চাকরির জন্য। রোজা সেখানেই চাকরি করে। মেরী যাচ্ছে বম্বেতে কয়েকদিন বেড়াতে।

যাদের যেমন। আমাদের মেয়েরা ডাগর হলে, বিয়ের ভাবনা। ওদের চাকরি। অবিশ্যি পালের বাতাসও এখন সেদিকেই বাঁক ধরেছে। তাই, সময়ের নাম দিশারী। কাল তার নিয়মে চলে। বেগটা তার অন্ধের মত বটে। পরিবর্তনটা তার অমোঘ নিয়মে বাঁধা। কিন্তু ঠাকরুণের কথাটা সেখানেই শেষ না। তারপরে, প্রায় একটা নালিশের সুরে বেজে উঠলেন, 'কিন্তু আমার লিজাটা কলকাতায় থেকে, একেবারে বাঙালী বনে গেছে।'

লিজা মুখ না ফিরিয়েই, একটা অস্বস্তিকর আওয়াজ দিল, 'উহ্!'

এবার মেরীও ঠাকরুণের সঙ্গে যোগ দিল, 'সত্যি। লিজাটা যত বাঙালী হয়েছে, আমি কোনদিন ততটা হতে পারিনি।'

লিজা এবার মুখ ফেরাল। চোখের কোণ দিয়ে, একবার আমার দিকে দেখে, মেরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেটা খুবই স্বাভাবিক। বাঙালী পাড়ায় থেকেছি, বাঙালীদের সঙ্গে মিশেছি, আমার বেশির ভাগ বন্ধুই বাঙালী ছেলেমেয়ে।'

কথার শেষে লিজা আর একবার আমার দিকে দেখল।

মেরী বলল, 'সে কথাই তো বলছি। তুমি অনায়াসে বাংলা বলতে পার, ওদের খাবারও খেতে ভালবাস।'

বলে মেরী আমার দিকে তাকাল। লিজা যেন বিরক্তিতেই, একটু হেসে ফেলল। আবার একবার আমার দিকে চাইল। চোখাচোখি হতে, একটু যেন লজ্জা পেল। বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। চোখ ফেরাতে একটু সময় লাগল আমার। লিজার দিকে তাকিয়ে, আমার নজর যেন একটু নতুন চেনার খোঁজে উৎসুক হল। নিশ্চয়ই বাঙালীদের সঙ্গে, বাংলায় কথা কয়ে আর খেয়ে, ওর চোখের তারা, চুলের গোছা কালো হয়নি? ওর শরীরের রঙেও গোরা রঙের সেই ঝলক নেই। বাকিদের যেমন আছে। জানি না, এই দেখাটা, নিজের নজরকে খুশি করে, বানিয়ে দেখা কী না। ওর গোরা বর্ণে, কোথায় যেন একটা স্নিগ্ধ ছায়া আছে। ওর ছিপছিপে শরীরে, যৌবন উদ্বেল না, উদ্ধত না। রোজার

যেমন আছে। আগেই দেখেছি, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে লিজা যেন টলটলানো। মেমসাহেব-কন্যা হলেই, আমাদের মন একটু আন ভাবে। কিন্তু লিজার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওর ওই টলটলানো শরীরের মধ্যে কোথায় একটা গভীরতা যেন আছে। মনের গভীরতা। যদি বা ওর টানা চোখের কালো তারায় একটা ঝিলিক প্রায় লেগেই আছে। কালো মেঘে কখন চিকুর হেনে যাবে, বলা যায় না যেন। তথাপি, গভীরতার ছায়াটা হারিয়ে যায় না।

এসব বাঙালীদের সঙ্গে মিশে হয়েছে, এমন কথা ভাবা একটা পাগলামি। ওর বাঙালীপনার কথাটা আমাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্য বলা হয়েছে কী না, জানি না। তবে মন গুণে ধন, দেয় কোন জন। কথাটা জেনে যে আমার একটা খুশির ঝলক লেগেছে, তার কী উপায়। মনে তো আর ইচ্ছা করে ঝলক লাগানো যায় না। এখন আমার নতুন করে চোখে পড়ছে, ওর আশমানি রঙের জামার সঙ্গে মিলিয়ে, আশমানি পাথরের মালা রয়েছে গলায়। হাতে ঘড়ি নেই। দু'হাতেই আশমানি রঙের বালা। কানে একই রঙের দুটো গোল পাথর। টকটকে লাল রঙের মোটা দাগে দাগানো ওর ঠোঁট না। অন্যদের যেমন আছে। অনেকটা স্বাভাবিক রঙের প্রলেপ দেওয়া। চোখের কাজলটাও ঘন।

কিন্তু চোখের মাথা না হয় খেয়েছি। মনের মাথাও কি খেয়েছি। এতক্ষণ ধরে চোখ ফেরাতে ভুলেছি, হঠাৎ লিজা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ভুরু গিয়েছে একটু লতিয়ে, চাউনিতে বিস্ময়। লজ্জা পাবার কথা আমারই। চোখাচোখি হতে, লজ্জার রঙটা ওর মুখেই আগে ফুটল। ঝটিতি আবার মুখ ফেরালো। ইতিমধ্যে লজ্জাটা আমার মস্তিকেও বিঁধে যায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, ঠাকরুণের কথায় কান দিই।

ঠাকরুণ তখন বলে চলেছেন, 'মেয়ের সে কি কান্নাকাটি আসবার সময়। যত পাড়ার মেয়েরা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, ও তত কাঁদে।'

লিজা যেন এবার একটু রুষ্ট হয়েই মুখ ফেরাল। বলল, 'মা, প্রসঙ্গটা বদলালে হত না?'

ঠাকরুণ তখন নিজের কথার তোড়ে। লিজার কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'তবে আমি বলে দিয়েছি, কোন বাঙালী ছেলে-টেলেকে যেন বিয়ে করতে যেও না। সে আমার ভাল লাগবে না।'

লিজা সরোষে আবার বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল। শোনা গেল, 'অসম্ভব!'

রোজা ওর নীল চোখে ঝিলিক দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। হাসিতে যেন একটু ঠাট্টার খোঁচা আছে। মেরী মাথা নামিয়ে হাসছে। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণের বাঙালীর প্রতি এমন অকরুণ মনোভাব কেন? সংস্কার নাকি? সেই একই কথা। মন গুণেই ধন। কথাটা একটু লাগল বৈকি।

সবাইকে চুপচাপ থাকতে দেখে, গোমেজ ঠাকরুণের বোধহয় হঠাৎ কিছু মনে হল। বললেন, 'তুমি আবার কিছু মনে করলে না তো?'

হেসে বললাম, 'না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'বাঙালী মানে তো হিন্দু। ঝোঁকের বশে যদি একটা কিছু করে বসে, তারপরে হয়তো দেখা যাবে, বনিবনা হল না, বুঝলে না?'

তা বুঝেছি, কিন্তু না বলে পারি না, 'বাঙালী কেবল হিন্দুই হয় না। খ্রীষ্টান মুসলমান সবই আছে।'

ঠাকরুণ একটু ঢোঁক গিললেন। বললেন, 'তা হয়তো আছে। তা হলেও, তাদের জীবনের ধরন-ধারণ তো আলাদা, সেইজন্যই বলছি।'

প্রসঙ্গটা বদলানোই ভাল। বিলু এ-সময়ে ঘোষণা করল, তার ক্ষিদে পেয়েছে। মেরী ছেলেকে খেতে দিতে উঠল। বিলু উঠে এল মেরীর কাছে। আমি গেলাম বিলের জায়গায়। ঝোলাটা টেনে নিয়ে খুলে, পত্র-পত্রিকাগুলো বের করে নিলাম। বইগুলো বের করে একবার দেখে নিলাম, ঠিক মত আনা হয়েছে কী না। তার মধ্যেই ঠাকরুণের গলা শুনতে পেলাম, 'আমরাও সবাই খেয়ে নিই, আর রাত করার কী দরকার।'

রোজার গলায় সম্মতি পাওয়া গেল, 'হ্যাঁ, খেয়ে নেওয়া যাক।'

চোখ তুলতে গিয়ে, চোখ পড়ল লিজার দিকে। দেখি, আমার পত্র-পত্রিকা বইগুলোর ওপরেই ওর চোখ বাঁধা পড়ে গিয়েছে। আমি তাকিয়েছি, এটা বুঝতে পেরেই যেন একবার চোখের পাতা তুলে, আমার দিকে দেখল। আবার চোখ নামিয়ে বইয়ের দিকে তাকাল। ঝোলার একেবারে নীচ থেকে টেনে বের করলাম চাদর।

এই সময়ে নাকে গন্ধটা যেতে, ত্বরায় একবার না তাকিয়ে পারলাম না। আলু মেশানো শুকনো মাংস বড় টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে। বর্ণে গন্ধে তো কোথাও সাহেবী ব্যাপার ধরা পড়ছে না। তার ওপরে কী না, পাঁউরুটির সঙ্গে, একেবারে বেলুন-চাকিতে গড়া রুটি!

এ-সময়টা বসে থাকা দায়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি খাবার আনিনি?'

বললাম, 'না, ও-পাট মিটিয়েই এসেছি।'

মেমসাহেবের চেহারা আর ভাষাটা ছাড়া, কেবল যে দিশী সুরে বাজেন, তা না। একেবারে মা-মাসীর বয়ানে বাজেন, 'সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে একটু খাও না!'

এমন মায়ের মেয়ে যে একটু বাঙালী-ঘেঁষা হবে না, তা আশা করা যায় কেমন করে। বললাম, 'আমার একেবারেই ক্ষিদে পায়নি। আপনারা খান, আমি আসছি।'

কথা ষোল ধারায় বয়। কোনদিক দিয়ে আবার বইবে, কে জানে। বইতে না দিয়ে, তাড়াতাড়ি সরে যাই। কামরার অনেক জায়গাতেই খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রুটি লুচি পুরি, রকমারি খাদ্যের গন্ধে বাতাস ভরা। যদিও এই রেলগাড়ির সঙ্গে, খাবার ঘর জোড়া লাগানো আছে। সেখানেও এতক্ষণ ভিড় লেগেছে নিশ্চয়ই। ভিড় বাড়াতে, কাল সকালে আমিও যাব।

গণেশদাদা তখনও খালি গায়ে। কাপড় হাঁটু ছাড়িয়ে, আরো বেশি ওপরে উঠেছে। গোছাখানেক পুরি তার সামনের রুপোলি থালায়। থালার এক পাশে কী জাতীয় তরকারী, বুঝতে পারলাম না। গণেশদাদা জোড়াসন করে বসেছে। মুখোমুখি কলাবউ। ঘোমটা দিয়ে মুখ তেমনি ঢাকা। তবে স্বামীকে খেতে দিচ্ছে, ভঙ্গিতে সেটা স্পষ্ট।

কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে, দরজা খুলে দাঁড়ালাম। ধুলোর ঝাপটায়, চোখ মেলে থাকা ভার। তবু বাতাস ছেড়ে সরে আসতে ইচ্ছা করল না। কালো আকাশ তারায় ভরা। অন্ধকারে, কোন কিছুই ভাল করে চোখে পড়ে না। তবু বোঝা যায়, চোখের ওপর দিয়ে মাঠ জঙ্গল চলে যাচ্ছে। কখনো-বা হঠাৎ চকচকিয়ে উঠছে জলাশয়। চকচকিয়ে ওঠে কেন? অন্ধকারে কি জলের কোন আলো থাকে। আসলে জল যেন আয়না। আয়না অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গ্রাম দেখা যায়। কে যেন আলো নিয়ে চলে দূরে অন্ধকারে। শুধু আলোর কণাটাই চলে যায়। আর এখন যারা এই সব গ্রামে ঘুমায়, এই গাড়ির শব্দ কি তাদের কানে বাজে। তাদের কি ঘুম ভাঙায়?

নিজের জিজ্ঞাসায়, নিজেরই হাসি পায়। এই গাড়িটার মত, মানুষ অবিরত, নানান বেগে সে আছে। সে কি কেবল এখন ঘুমায়? কেউ হয়তো এখন হিসাব নিয়ে বসেছে। রোগে শোকে দুঃখে ভুগছে কেউ। ক্রুদ্ধ ঘৃণায় ফুঁসছে কেউ। কেউ ক্ষতির ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। কেউ সুখে আত্মহারা, হয়তো বুকে নিয়ে তাকে সোহাগে ভাসছে। আর এই গাড়িতে আমরা চলেছি। মানুষ অবিরত, নিরন্তর।

চলেছি, এই শব্দের যেন নতুন করে আমার পাখায় ঝাপটা লাগল। পশরা নিয়ে চলেছি বিকোবার ডাকে। একে বলে কাজ। তথাপি, মনের কোণে সেই কথাটা, যেন একটা ছোট কণার মত পড়ে আছে। আর সবটাই ছলছলিয়ে তরতরিয়ে উঠছে চলার খুশিতে। নতুন দেশ, নতুন মানুষের কাছে। যেন মনে হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে অনেক অজানা বিস্ময়। অনেক অচেনার মুখে চেনা হাসি। বহু বিচিত্র রূপের ঝোরা, এখনিই যেন আমার কানে বাজছে।

সেই গাজীর কথা আমার মনে পড়ছে। ঝোলা কাঁধে নিয়ে সে মুরশেদের নাম নিয়ে ফিরছে। নামেই সব। মুরশেদের নামের মজুর সে। নামেতেই তার ঝোলা ভরে, মনও ভরে। মুরশেদের

নামের সে রঙিলা মজদুর। মুরশেদের সঙ্গেই তার যত হাসি কথা বাত পুছ। সেই অনেকটা রথ দেখা কলা বেচার মতই। দর্শনও হচ্ছে, ঝোলাও ভরছে। নামও হচ্ছে, মহাপ্রাণীও ঠাণ্ডা থাকছে।

আমিও কি তেমনি মুরশেদের নাম নিয়ে ফিরছি? এত বড় কথাটা বলতে সাহস হয় না। নাম নিয়ে ফেরার মজুরি করবার মুরোদ আমার নেই। তবু যে-মন ঘরের বাইরে দেশান্তরি হয়ে ফেরে, নতুনের খোঁজে যায়, তাতেই তার ঝোলাতে, মজুরিও জুটে যায়। তবু যদি মুরশেদের মত হত, একের সঙ্গে আর এক বাঁধা, তাহলে না জানি কেমন হত। নামে আর মজুরিতে ফারাক করা যায় না। রঙে রঙে মেশানো, আলাদা করে চেনা যায় না।

চলার নামেই মাতাল। কেন বুঝতে পারি না। মনে হয়, যুগ-যুগান্ত চলেছি। কার ডাকে, তাকে দেখতে পাইনি, চিনতেও পারিনি। সে কি বাইরে থেকে ডাকে, না আমার ভিতরে বসেই বাইরের ডাক দিচ্ছে, তা বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি, সেই ডাকের সঙ্গে, আমি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সন্ন্যাস নিইনি, আমি বৈরাগী না। বিবাগীও না, ঝোলার মধ্যে মজুরি ভরতে চেয়েছি। তথাপি জানি, মজুরির ঝোলায় যদি ফাঁক থেকে যায়, মনের ঝুলিটাকে শূন্য করে নিয়ে ফিরতে পারব না। চলার হিসাবের অঙ্কে, সুখের ভাগ কতখানি, তার হিসাব করিনি। দুঃখের ভাগও না। কিন্তু সুখ দুঃখ মান অপমান, অনেক আলোয় কালোয় সেই হিসাবে ভরা। যত চলা, তত দেখা। সবই নতুন করে দেখা, নতুন আবিষ্কারের মত। সেই আমার মুরশেদের নাম। আমার নামে কামে এক হোক।...

ভাবতেই বড় একটা নিঃশ্বাস পড়ে। কেন বুঝি না। কেন দুঃখকে টের পাই না। তথাপি, চলন্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে, বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে, কী একটা টানা সুরের রাগিণী যেন বেজে ওঠে। আমার চিন্তার মধ্যে কি সেই সুর বাজে? জানি না। সেই সুর শুনেই যেন নিঃশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। এতক্ষণে নিশ্চয় গোমেজ পরিবারের খাওয়া সাঙ্গ হয়েছে। বাথরুমে যাওয়া-আসার ঘন ঘন সাড়া-শব্দে মনে হচ্ছে, অনেক পরিবারেই ভোজনের পাট চুকেছে। এবার শয়নের পালা। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে ফিরে যাই।

খুপরির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। কেবল দাঁড়ানো না, একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরতে হল। সকলেরই রাতের পোশাক বদলাবার পালা চলেছে। গোমেজ গিন্নীর বিপুল শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে একেবারে কিছু নেই। কিছু পরতে ব্যস্ত, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সেই হিসাবে, আমাদের গণেশদাদাই ভাল। বদলাবদলির মধ্যে নেই। কাপড়টা না হয় টেনে, আর একটু তুলে নেবে। দেখলাম, সে বসে বিড়ি খাওয়াতে ব্যস্ত। কলাবউ উলটো দিকে ফিরে খাচ্ছে, বোঝা যায়। উলটো দিকে এক সর্দারজী, আর সম্ভবতঃ তার গৃহিণী। বাকীরা ইতিমধ্যেই, তিন তলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ খুপরির চেহারাই প্রায় একরকম। কেবল দাঁড়িয়ে থাকা আর ঘোরা আমার আর এ্যাটেনডেন্ট গার্ডের।

আমি আবার গিয়ে দাঁড়ালাম শেষ প্রান্তের দরজার কাছে। কিন্তু দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, পিছন থেকে সরু গলায়, আমার পদবী ধরে ডাকতে শুনলাম। ফিরে দেখি বিল্ সাহেব। বলল, 'ঠাক্‌মা আপনাকে যেতে বললেন।'

বললাম, 'চল যাচ্ছি।'

দেখলাম, বিল্ চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তুমি যাও, আমি দু' মিনিট বাদেই যাচ্ছি।'

বিল্ যেন একটু লজ্জা পেল। বলল, 'আমার এখানে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে।'

আমি হাত ধরে, বিল্‌কে কাছে টেনে নিলাম, যাতে ও বাইরের দিকে দেখতে পারে। বিল্ বেশি কথার ছেলে না, শান্ত চুপচাপ ছেলে। ওর বাবার ধারা জানা নেই। বোধহয় ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হল, ও কোন ইস্কুলে কোন শ্রেণীতে পড়ে। আর ওর কাছ থেকেই জানা গেল, ওর বাবা একজন বড় বিলাতী অফিসের কর্মচারী।

আমাদের কথার মাঝখানেই, রোজার আবির্ভাব হল। বিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাকতে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছ?'

একটু যেন রুষ্ট স্বর রোজার। দায় নিয়ে বললাম, 'ওকে আমিই আটকে রেখেছি। এখুনি যাচ্ছি।'

রোজা আমার চোখের দিকে এক পলক তাকাল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসল। বলল, 'ওর মা ওকে ডাকছে।'

বিল্ পিসীর দিকে তাকাল। ওর নজরে যেন কেমন একটা ধন্দ আর সন্দ। বিল, চুপচাপ শান্ত বটে। কিন্তু এবার ওর মাথা ঝাঁকানির মধ্যে, একটা অন্য ভাব দেখা গেল। বলল, 'জানি, তুমি আমাকে ভাগাতে চাইছ।'

আমি অবাক হয়ে, ভাইপো আর পিসীর দিকে তাকালাম। রোজা বিল্‌কে ভাগাতে চাইছে কেন? রোজা চকিতে একবার আমার দিকে দেখে, বিল্‌কে বলল, 'মোটেই না। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে তুমি এখন গিয়ে শোবে, যাও।'

বিল্ অবাধ্যতা করল না। আমার হাত ছাড়িয়ে, পিসীর দিকে একবার দেখে, চলে যেতে উদ্যত হল। রোজা বলে উঠল, 'ওখানে গিয়ে কোন বাজে কথা বলো না যেন।'

বিল্ কোন জবাব না দিয়ে বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে গেল। এদিকে যত ধন্দ, তখন আমার মনে আর চোখে। কী একটা ব্যাপার যেন রয়েছে। একেবারে নিরীহভাবে শুতে যাবার নির্দেশ নয় যেন।

রোজা আমার অবাক মুখের দিকে ফিরে তাকাল। একটু লজ্জিত হাসল। বলল, 'কিছু মনে না করলে, আমাকে একটা সিগারেট দিন তো। মা আমার সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, তাই আমার প্যাকেটটা নিয়ে আসা হল না।

তবু ভাল। তবে এমন ব্যাপার জীবনে দেখা ছিল না, জানাও ছিল না। ছেলে না, যুবতী মেয়ে, মাকে লুকিয়ে সিগারেট খায়, অভিজ্ঞতার বাইরে। আমি হেসে বললাম, 'এতে আর মনে করবার কী আছে।'

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দিলাম। রোজা সিগারেট ধরিয়ে, ওর মায়ের মতই, নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। টানগুলোও বেশ বড় বড়, এবং তৃপ্তির। বেচারি! বোঝা গেল, এতক্ষণ বড় কষ্ট পেয়েছে। নেশার ব্যাপার। আমি আর ঠাকরুণ এতক্ষণ ধরে সিগারেট খেয়েছি। আর রোজা ছটফটিয়ে মরেছে।

আমি ওর সিগারেট খাওয়াই দেখছিলাম। শোবার পোশাক পরে এসেছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে, ফিক করে হাসল। বলল, 'আপনার-বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না?'

মনের দরজায় ছকে ছকে দরজা রেখে, কুলুপ এঁটে না রাখলে,

অপছন্দের কী আছে। নিষেধ বলে তো কিছু নেই। চোখের দেখায়? তাতেই বা বাধছে কোথায়? এও একটা রূপ তো। একটা নতুন রূপে দেখা। বিশেষ, রোজার ধূমপানের মধ্যে, কোন লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই। একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজে ধূমপায়ী। ওর খাওয়া দেখেই বুঝতে পারি, তৃপ্তিতে ওর মহা-প্রাণীটি তর তর করছে। বললাম, 'অপছন্দ করব কেন। তাছাড়া এটা তো পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার না, নেশার ব্যাপার।'

তাও বলি, আমরা আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালীরা, এই সংস্কারটাই বা পেলাম কোথা থেকে, মেয়েদের ধূমপান নিষেধ? আমার তো ধারণা, যবে থেকে ভারতবর্ষে ধূমপান, তবে থেকে মহিলারাও তার সঙ্গে আছে। কেবল পুরুষ না। নেশার বস্তু সকলের সয় না। সকলের মন টানে না। যাকে টানে, যার সয়, সে-ই খায়। তবে ঘর-গেরস্থালির ফাঁকে গিন্নীর পক্ষে হুঁকা নিয়ে ঘোরা সম্ভব ছিল না। যার সম্ভব হয়েছে, সে হুঁকা নিয়ে বসেছে। যার হয়নি, সে তামাকপাতার রূপ ফিরিয়ে, রকম ঘুরিয়ে, মুখে দিয়ে চিবিয়েছে। দাঁত ঘষে লাগিয়ে রেখেছে। জর্দার দোস্তার তামাকে ধোঁয়া বেরোয় না বটে। নেশায় সবাই সবার জুড়ি। আমাদের মনের ছাপে, দেখতে সহবত।

আমার চোখের সামনে ভাসছে তিন কর্তা-গিন্নীর চেহারা। গ্রামীণ হিন্দু সম্পন্ন পরিবারের, কর্তার দুই গিন্নী। দুপুরের খাওয়ার শেষে, তিনটিতে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছেন। মিয়া-বিবির তো কথাই নেই। ঘরে ঘরে দেখেছি। মুশকিলটা আসলে অন্যখানে। মধ্যবিত্ত ভারতবাসী, নিজেদের পিছনটাকে চেয়ে দেখে না। পরের রুচি ধার করে ভাবে, এটাই ঠিক। তা-ই রোজাদের বেলাতেই বা দোষ কী? দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে খাওয়া, দেখতে চোখে লাগে। হুঁকার দিন যখন গিয়েছে, তখন আর একরকম হবে। সেই তো কথা, সময় বড় মহাশয়, তার নাম দিশারী।

রোজা বলল, 'মা খুব রেগে যান। অথচ মায়ের সিগারেট চুরি করে খেয়ে খেয়েই আমি নেশা করতে শিখেছি।'

ওর হাসির সঙ্গে, আমিও বাজলাম। গত্ তো বাঁধা। কথা তো সেই একই। রোজা মায়ের ব্যাগ মেরে শিখেছে। আমরা

বাবার পকেট মেরে।

রোজা আবার বলল, 'আমার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না, যান আমি আসছি।'

ঠিক এ সময়েই দেখা গেল, আড়াল থেকে বিলের হাসিমুখ উঁকি মারছে। পিসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, পিসী একটু ধমক দিল, 'এখনো যাওনি?'

সঙ্গে সঙ্গে বিলের মুখ সরে গেল। আমি হাসতে হাসতে, বিলের পিছু নিলাম। খুপরির কাছে আসতেই, ঠাকরুণ খর খর করে বেজে উঠলেন, 'অমন করে চলে যাবার কী দরকার ছিল? তুমি তো আমার ছেলের মতই।'

শোন কথা! এর পরেও, শ্রীমতী মোনালিসা গোমেজকে কে মেমসাহেব বলে ভাবতে বসবে। রূপে পোশাকে কথাতেই যা ভিন্। তা নইলে তো, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের এক বুড়ি! কিন্তু এতটা আবার আমার সইত না। না চলে গিয়ে কী উপায় ছিল। বললাম, 'ঠিক আছে।'

আমার জায়গায় বসতে বসতে দেখলাম, সকলেরই শোবার পোশাক পরা হয়ে গিয়েছে। মেরী এখন সিগারেট খাচ্ছে। আমি জায়গায় গিয়ে বসতেই, লিজা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে, একটা ইংরাজী ম্যাগাজিন আমার পাশে রেখে দিল। আমি ওর দিকে তাকালাম। লজ্জার ছটা ওর মুখে। নীচু স্বরে বলল, 'একটু দেখছিলাম।'

আমি বইটা নিয়ে, বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'দেখুন না। আমার তো আরো আছে।'

লিজা আমার দিকে একবার দেখে, বইটা নিল। বলল, 'ধন্যবাদ।' মনে মনে বলি, তার দরকার নেই। কিন্তু লিজা আবার ফিরে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'সব ম্যাগাজিন আর বইগুলো আমি দেখে নিয়েছি।'

এই সুযোগে ধন্যবাদটা ফিরিয়ে দেব কী না ভাবলাম। কিন্তু জবাব দিলাম, 'বেশ করেছেন।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকাল। বোধহয়, আমার মনো-ভাবটা বুঝতে চাইল। তারপর ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে গিয়ে, আবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিছু যেন বলতে চাইছে আরও, বলতে পারছে না। ওদিকে বিল্ তখন একটা দোতলার

টায়ারে উঠে পড়েছে শোবার জন্য। মেরী আর ঠাকরুণে কী একটা বিষয়ে কথা হচ্ছে।

লিজা বলল, 'আমি অল্প-সল্প বাংলা পড়তে পারি।'

ওর চোখে লজ্জায় মেশানো খুশির ঝিলিক। বললাম, 'তাই নাকি? আমার কাছে বাংলা বই থাকলে আপনাকে পড়তে দিতাম।'

লিজা একটু অবাক চোখে তাকাল। তারপরে ওর চোখ পড়ল আমার বইগুলোর ওপর। একটু যেন দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'একটা যেন দেখলাম।'

বিস্মরণের দায়ে, এবার আমারই অবাক হবার পালা। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও, হ্যাঁ, একটা বই আছে বটে। ওটা যে এনেছি, একেবারে মনে নেই।'

লিজা হাসল, বলল, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। লেখকের নামটা যেন কী, আমি কখনো শুনিনি!'

এবার জবাব দিতে গিয়ে, আমারই গলার কাছে ঠেক। একটু কেসে নিয়ে বললাম, 'কালকূট'।

লিজা বলল, 'হ্যাঁ, কালকূট। কখনো নাম শুনিনি তো।'

হেসে বললাম, 'সেটা কালকূটের দুর্ভাগ্য। তবে এটাই লেখকের প্রথম বই।'

লিজার মুখে একটু সংকোচের ছাপ। বলল, 'আমি আর বাংলা বইয়ের কতটুকু জানি। পড়াশোনা তো সব ইংলিশ মিডিয়ামেই হয়েছে। বন্ধুদের কাছে বাংলা শিখেছি। কালকূট মানে কী?'

আবার আমার গলায় ঠেক। ঠেক না কাঁটা। বললাম, 'তীব্র বিষ।'

'তীব্র বিষ।'

লিজার কাজল লেপা টানা চোখের কালো তারায়, অবাক ঝিলিকের সঙ্গে, ভয়ের ছায়া। জিজ্ঞেস, 'ভুতুড়ে বই নাকি?'

হায় কালকূট, কী তোমার নাম-মাহাত্ম্য! নাম শুনে গোয়ানীজ মেয়েটির ওইরকম ধারণা। এমন যার নাম, সে ভুতুড়ে বা ভয়ংকর কিছু ছাড়া লিখতে পারে না। বললাম, 'যতদূর জানি, সেরকম কিছু না।'

লিজা একটু অবাক রুষ্ট স্বরে বলল, 'এমন ছদ্মনাম আবার কেউ নেয় নাকি? বিচ্ছিরি!'

তা বটে! কালকূট আবার সুশ্রী কবে। কালকূট বলেই তো তার অমৃতের সন্ধানে যাওয়া। সে কথা এই গোয়ানীজ কন্যাকে বোঝানো যায় কেমন করে।

লিজা আবার বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে, বইটা আমি আজ রাত্রে পড়ব।'

আমি বইটা নিয়ে ওকে দিলাম। এ সময়েই, ঠাকরুণের গলা শোনা গেল, 'ও হে শুনছ, একটা কথা।'

ফিরে তাকালাম। চমৎকার দেখাচ্ছে এখন গোমেজ ঠাকরুণকে। রাত্রের পোশাক হিসাবে উনি পরেছেন, ঢলঢলে লম্বা একটা শেমিজ জাতীয় পোশাক। পোশাকের রঙটা গেরুয়া। কাঁধ-কাটা না হলে, তাঁকে গেরুয়া আলখাল্লাওয়ালী বিশালবপু সন্ন্যাসিনী বলা যেত। বললাম, 'বলুন।'

'বললেন, 'তোমার তো দেখছি, দোতলার টায়ারে শোবার জায়গা। কিন্তু তোমাকে তেতলায় উঠতে হবে বাপু।'

লিজা বলে উঠল, 'কেন মা, ওঁকে কষ্ট দেবে। আমি আর রোজা তেতলায় শুতে পারব।'

এবার আমাকেই যেচে বাত্ দিতে হল, 'না, আমি তেতলাতেই যাব, আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

ঠাকরুণ কথার খেই ধরে নিলেন, 'ওই তো দেখ না, এসব মেয়েদের ঘটে কোন বুদ্ধি থাকলে তো।'

লিজার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হয়। এতে এমন বুদ্ধির কী থাকতে পারে, সেটাই বোধহয় ওর জিজ্ঞাসা। তারপরে ঘাড়ে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে, বইয়ের পাতা ওল্টাল। এতক্ষণে আমার নিজেরই মনে হল, গোমেজ ঠাকরুণ যে আমাকে প্রথমে দেখে রুষ্ট হয়েছিলেন, তার মধ্যে অনেক যুক্তি আর ভাবনা ছিল। একটি বালক আর চারজন মহিলা, তাদের মাঝখানে একজন অচেনা পুরুষ যাত্রী, অস্বস্তি আর বিরক্তি হবারই কথা। মেমসাহেব হলেও, তারা মেয়ে। একজন অচেনা পুরুষের সামনে কত রকমের অসুবিধা থাকতে পারে। এইটুকুনি ফাঁকের মধ্যে শয়ন উপবেশন। যে-কোন মহিলা যাত্রীদের পক্ষেই, এটা একটা অস্বস্তির ব্যাপার।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। কোম্পানী তার

নিজের কাজ করেছে। লোক দেখে বেছে, কাউকে কোথাও জায়গা দেওয়া হয়নি। গোমেজ ঠাকরুণের, যে ভাবেই হোক, আমাকে একটু নিরীহ বাঙালী ছেলে মনে হয়েছে। এখন আমাকে তাঁর 'ছেলের মত' বলতেও আটকাচ্ছে না। সেইটুকুনই যা রক্ষে। অনেকখানি সহজ হওয়া গিয়েছে। কৃতিত্ব নিশ্চিত গোমেজ ঠাকরুণের। তিনি যেচে হেঁকে ডেকে কথা না বললে হত না। তেতলাতেই তো আমাকে যেতে হবে। আরো উঁচু জায়গা থাকলে, সেখানেই যেতাম। যাতে গোমেজ পরিবার, নিজেদের মধ্যে থাকতে পারত। তথাপি, মেয়েরা সবাই যাতে, একতলা দোতলায় থাকতে পারে, সেই ভেবে বললাম, 'বিল্‌কে তেতলায় দিন না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'না, ছেলেমানুষ, এতটা উঁচুতে ওঠা-নামা করতে অসুবিধে হবে। রোজা না হয় লিজা, কেউ তেতলায় উঠবে।'

ঠাকরুণের যা মর্জি। শোবার পোশাক বদলানো দরকার। লিজাকে দেখছি, পোশাকি পোশাকের থেকে ওর শোবার পোশাকের বহর বড়। ডোরাকাটা ঢলঢলে পায়জামার ওপরে, ডোরাকাটা ঢল-ঢলে লম্বা জামা। চুল টেনে আঁচড়ে নিয়েছে। এখন ঘাড়ের কাছে, গোছা করে রবার দিয়ে বেঁধে রেখেছে। গলায় আশমানি মালাটা নেই। বোধহয় শোবার অসুবিধের জন্য।

রোজা এসে ইতিমধ্যে ঢুকেছে। মেরী মগ্ন হয়ে, কী একটা ছবির বই দেখছে। মনে হয়, বিদেশী কোন অপরাধ-পত্রিকা। আমি বাথরুম থেকে ধুতির বদলে পায়জামা পরে এলাম। রাতের পোশাক এ-পর্যন্তই। মহিলারা না থাকলে, পাঞ্জাবীটাও খোলা যেত! মনের সায় নেই। ব্যাগটা তেতলায় তুলতে গিয়ে ঠেক খেলাম। আমার চাদরটা সেখানে বিছানো। এক দিকে একটা বালিশ। অন্যান্য তলায় তাকিয়ে দেখছি, সবখানেই বালিশ। তাহলে ভুল করে বা এমনি রাখা না। ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ। কিন্তু এখন আমার অস্বস্তি। আগেই ঘোষণা করেছি, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শোব। ঘোষণার মধ্যে সত্যিও ছিল।

মেরীর গলা শোনা গেল, 'কী হল?'

মেরীর দিকে ফিরে বললাম, 'বালিশটা কি আমাকে দেওয়া হয়েছে?'

মেরী তাকাল লিজার দিকে। লিজা মেরীর দিকে। গোমেজ ঠাকরুণ চোখ বুজে, বুকে হাত রেখে, চুপ করে ছিলেন। জবাব পাওয়া গেল তাঁর মুখেই, 'হ্যাঁ। আমার ডবল বালিশ থেকে, তোমাকে একটা দিয়েছি।'

তার মানে, উনি ডবল বালিশ ছাড়া শুতে পারেন না বলেই, বয়ে নিয়ে এসেছেন। এতে কেন আমি ভাগ বসাতে যাই। নিজের ব্যবস্থা তো নিজেই করে এসেছি। বললাম, 'কিন্তু, আমার বালিশের সত্যি দরকার নেই। আপনি মিছিমিছি কষ্ট করবেন না, এটা আপনি নিন।'

গোমেজ ঠাকরুণ চোখ খুললেন। দৃষ্টিতে ঈষৎ বিরক্তি মেশানো। এবার প্রায় হুকুমে বাজলেন, 'শুয়ে পড়োগে যাও। আমার কষ্ট, আমি বুঝব।'

আমি বাকী তিনজনের দিকে একবার দেখলাম। রোজা হেসে বলল, 'উঠে পড়ুন।'

গতিক সেই রকমই। বলাবলিতে আর কিছু হবে না। কিন্তু ওঠবার আর একটু বাকী আছে। চলার বেগটা এমনিই, একটা জলের পাত্র পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি। অবিশ্যি, কবেই বা তা নিয়ে বেরিয়েছি। কোনরকমে চালিয়ে নেওয়া। একটু জল তো। সময়ে অশেষ মূল্যবান। কিন্তু চাইলে পাওয়া যায়। অন্যদিকে বোঝা যত, ঝক্কি তত। আমি মেরীর দিকে ফিরে বললাম, 'আমি একটু জল খাব।'

মেরী বলল, 'নিশ্চয়।'

সে বই ছেড়ে ওঠবার আগেই, লিজা বলল, 'জলটা আমার এখানে, আমি দিচ্ছি।'

ঠিক এ সময়েই, ঠাকরুণের চোখ বোজা ঘোরটা কেটে গেল। উনি ঠিক ঘুমের ঘোরে ছিলেন না। মনে হয় জপের ঘোরে ছিলেন। প্রায় হুমকি দিয়ে উঠলেন, 'ছোকরার দেখছি কোন চালচুলো নেই। এত দূরের যাত্রা, একটা জলের পাত্র পর্যন্ত নিয়ে বেরোয়নি।'

বলবার কিছু না থাকলেও, আওয়াজ করলাম, 'না—মানে—'

'তোমার ওসব মানে রাখ। এসব আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

প্রায় ধমক দিয়েই থামিয়ে দিলেন। লিজা আমার সামনে জলের

গেলাস ধরল। কিন্তু ওদিকে আবার ঠাকরুণ, কোন ধারাতে বলেন 'শোন, 'তুমি করো কী বলতো? চাকরি-বাকরি কর, না ব্যবসা কর?'

জলের গেলাস তখন আমার হাতে। জল চলকে গেল একবার। তবেই তো বিপদ। কী করি, সে কথা গোমেজ ঠাকরুণকে কী করে বলব। সংসারে নানান কাজের মধ্যে, কাজের মানুষদের মধ্যে, নিজের কাজের কথাটা বলতে আমার ইচ্ছা করে না। সেটা সংকোচ না আর কিছু নিজেও বুঝি না! সংসারে অনেকতরো কাজের মধ্যে, আমি যেন একটা মূর্তিমান অকাজ। সংসারে লোকে যাকে কাজ বলে জেনেছে, আমার কাজটা তাদের কাছে এমন বেখাপ্পা, অকাজের ছায়াটা তখন তাদেরই চোখে। বললাম, 'বলবার মত কিছু না।'

বলে গেলাসে চুমুক দিলাম। ওদিকে চোখা জিজ্ঞাসা ঠাকরুণের গলায়, 'না বলবার মতটাই শুনি। অবিশ্যি এসব জিজ্ঞেস করতে নেই, জানি।'

জানেন, তবুও। কারণটাও নিজের মুখেই কবুল করেন, 'তা বলে তোমাকে জিজ্ঞেস করা যায়।'

লিজা বলে উঠল, 'না-ই বা জানলে মা। উনি যখন—'

লিজার দিকে আমার চোখ পড়ল। একটু যেন বিরাগের ছায়া। সেটা ওর মায়ের ওপর না আমার ওপর, বুঝতে পারলাম না। আমি এবার মরিয়া হয়েই বলে উঠলাম, 'মানে, সত্যি কিছু করি না।'

গোমেজ ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে ঝামটা দিলেন, 'ও, বাপের ঘাড়ে আছ এখনো? আর বাপের পয়সায় বেরিয়ে বেড়াচ্ছ, বেশি দামের সিগারেট ফুঁকছ?'

মিথ্যে কথার এই বদলা। নাও, কত শুনবে শোন। মেরী আর রোজা মিটমিট হাসছিল। কিন্তু লিজা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে অবিশ্বাস। চোখে চোখ পড়তে, ও আমার হাত থেকে গেলাসটা নিল। আমি একটু চমকালাম। বললাম, 'তা না, মাঝে মধ্যে, খবরের কাগজে একটু আধটু লিখি।'

ঠাকরুণের তাতে তৃপ্তি নেই। বললেন, 'তাতে আর কী হয়?'

প্রায় অপরাধীর মত বললাম, 'ওই আর কি, কোনরকমে—'

ঠাকরুণের আবার ঝটিতি ঝাপটা, 'বুঝেছি বুঝেছি, ফাঁকিবাজ ছোকরা। আমার ছেলে হলে এ্যাদ্দিনে তোমাকে চাকরির জোয়ালে জুড়ে তবে ছাড়তাম। তারপরে খবরের কাগজে আর্টিকেলই লেখ, আর যা খুশি তাই করোগে।'

ঠাকরুণের মুখ বেশ গম্ভীর। আমার কথা বাড়াতে ভয়। তেতলায় ওঠবার উদ্যোগ করতে গিয়ে, আবার লিজার সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে যায়। ওর চোখে সেই অবিশ্বাসের ছায়া। অবিশ্বাসের সঙ্গে, একটা অনুযোগও যেন ফুটে রয়েছে! সম্ভবতঃ ওর ধারণা, ঠাকরুণকে আমি ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলছি। ও চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বাংলা বইটা টেনে নিল।

ঠাকরুণের গলা আবার শোনা গেল, 'তবে ছেলেটা তুমি খারাপ নও মনে হচ্ছে। বাজে হাব ভাব বা বাজে বাজে কথা—'

লিজা হঠাৎ নীচু তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'তোমার ভাবনাটা একটু কমাও মা। আমার আর এসব ভাল লাগছে না।'

লিজার স্বরে এবং ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, যাতে ঠাকরুণকে বলতে হল, আচ্ছা, ঠিক আছে বাপু।'

তিনি বালিশ টেনে নিয়ে শোবার উদ্যোগ করলেন। রোজা আর মেরীও লিজার দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর হল। লিজা বই থেকে মুখ তুলল না। কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ স্বরটা, আমাকেই যেন কোথায় বিঁধিয়ে রাখল। অথচ, না বলতে চাওয়ার অধিকার আমার আছে। সে কথাটা লিজাকে বোঝানো যাবে না। হয়তো, মায়ের খোলাখুলি কথা আর ব্যবহার ওকে সত্যি বিরক্ত করেছে। তথাপি আমি আমার মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না।

তবে, ওহে চলচলিয়া মানুষ, মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি আদায় না করে তোমার উপায় কী? উচ্চ নীচ নানা সুরে বাজে বলেই, তাতে মীড় গমকের মূর্ছনা! নানা রঙে ঝলকায় বলেই, প্রকৃতির রূপ অরূপ হয়ে ওঠে। এক মনের সঙ্গে, আর এক মনের সুরে না বাজলেই তা অ-সুর হয়ে যায় না। সুরের সে একটা ছন্দ। অতএব, তেতলায় চল! ডানার ঝাপটায় দূরের ডাক, নতুনের হাতছানি। গাড়ির এ খুপরি, এই মানুষেরা পট বদলের আড়ালে চলে যাবে। তখন নতুন পটে আঁকা তুমি। জীবনের এইটুকু দান।

আমি তেতলায় উঠে গেলাম বইপত্র নিয়ে। নীচেও শোবার উদ্যোগ শুরু হল। গোটা কামরায় অন্ততঃ দুজনের নাক ডাকাডাকির রেষারেষি চলছে, সন্দেহ নেই। গ্রীষ্মকাল না হয়ে, শীতের দিন হলে, জানালাগুলো বন্ধ থাকত। নাক ডাকার এই গর্জনে, গোটা কামরা কাঁপত।

নীচে রোজা লিজা মেরীতে কী যেন কথাবার্তা হচ্ছে। বিল্ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকরুণ নিঃশব্দ। তেতলায় উঠে এল লিজা। রোজা ওকে কোমরে হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছিল। লিজা বলল, 'আহ, কী হচ্ছে, ঠেলতে হবে না।'

রোজা বলল, 'পড়ে যাস যদি।'

লিজা হেসে বলল, 'আমি তোর মত ধুমসি না।'

রোজার গলা শোনা গেল, 'আমাকে তো তুই ওখানে উঠতে দিলি না, দেখতিস ধুমসি হয়ে তোর থেকে ভালভাবে উঠতাম।'

মেরীর গলায় একটু হাসির শব্দ বাজল। লিজা কোন জবাব না দিয়ে, চোখের কোণে একবার আমার দিকে দেখে নিল। তরপরে চুলটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। নীচে বসে, যতটা কাছাকাছি মনে হয়নি, এখন হঠাৎ মনে হল, যেন পাশাপাশি রয়েছি। আলাদা হয়ে গিয়েছি বাকি সকলের কাছ থেকে।

হঠাৎ আমার গায়ের কাছে একটা হাত উঠে এল। শোনা গেল, 'গুডনাইট।'

উঁকি দিয়ে দেখলাম, দোতলা থেকে রোজা হাত বাড়িয়েছে। আমি প্রত্যুত্তর করলাম। মেরী একটু হেসে শুভরাত্রি জানাল। আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরালাম। একেবারে নিঝুম না হলেও, বেশি রাত্রের চেহারাটা যেন জেগে উঠতে লাগল। কথাবার্তা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। গাড়ির শব্দ, নাক ডাকার গর্জন ছাড়া, কোন শব্দ নেই।

আমি ডুবে যাই আমার বইয়ের মধ্যে। রাত্রের ট্রেনে, কোনদিনই প্রায় ভাল করে ঘুমোতে পারি না। বই আমার পরম সঙ্গী। যদি তেমন সুজন পাই, তবেই পড়া চলে। আলো যে আবার সকলের সহ্য হয় না।

হঠাৎ এক সময়ে, কাছেই নাক ডেকে উঠল। ডাকটা নীচে বাজছে। তাকাবার দরকার হল না। শব্দটাই যেন বলে দিল, স্বয়ং গোমেজ ঠাকরুণের নাসিকানাদ। কিন্তু তার জন্য যে কারোর বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে, তা মনে হল না। কারোর কোন সাড়া-শব্দ নেই। টের পেয়েছি, লিজা কয়েকবারই এপাশ ওপাশ করেছে। বইটা ওর হাত থেকে নামেনি।

এক সময়ে মনে হল লিজারও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে, ওর দিকে ফিরে তাকালাম। একেবারে চোখে চোখে দেখা। পাশ ফিরে শুয়ে ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বইটা বুকের কাছে ধরা, যেন শরীরকে আড়াল করার প্রয়াসে। ঘুম আসছে বোধহয় ওর চোখে। আমি মুখ ফেরাতে গেলাম। আর গোমেজ পরিবারের সঙ্গে যতক্ষণ আছি, তার মধ্যে এই প্রথম বাংলা কথা নীচু স্বরে শুনতে পেলাম, 'ঘুম করবেন না?'

একে বলে ভিনভাষীর বাংলা। না হতে 'ঘুমোবেন না' শোনা যেত। দেখলাম, ওর পাশ ফেরানো মুখের একদিকে ছায়া, আর একদিকে আলো। ঠোঁটে হাসি। ঘুম যে ওর টানা চোখের পাতায় ভর করেছে, টের পাওয়া যায়। বললাম, 'এখনো পায়নি। ট্রেনে ঘুমোতে পারি না। আলো নিভিয়ে দেব?'

'কেন?'

'আপনার ঘুমের অসুবিধে হবে, চোখে আলো লাগছে।'

'অসুবিধে হবে না। হলে ওপাশ ফিরে শোব।'

কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। একটু কষ্ট করেও যদি লিজা, কিছু রাত্রি অবধি পড়ার সুযোগ দেয়, বেঁচে যাই। শেষ রাত্রি অবধি জাগতে চাই না। নীচের মানুষদের চোখে তেমন আলো যাচ্ছে না। আমি এবার আর ধন্যবাদ দেবার সুযোগটা ছাড়লাম না। বাংলাতে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

বলে, বইয়ের দিকে মুখ ফেরাতে যাব, লিজা আবার ইংরেজিতে

বলল, 'রাগ করেছেন ?'

প্রথমে অবাক হলাম। পরমুহূর্তেই ওর ঝাঁঝিয়ে ওঠার কথা মনে পড়ে গেল। লিজা নিজেও সেই কথাটা মনে রেখেছে। কিন্তু একবার যখন ধরতাই পেয়েছি, লিজার সঙ্গে সহজে আর ইংরেজি বলছি না। জবাব দিলাম, 'না তো।'

লিজা হঠাৎ কিছু বলল না। যেমন করে তাকিয়েছিল, তেমনি ভাবেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার এতটুকু জবাবে, নিজেই যেন খুশি হতে পারলাম না। আবার বললাম, 'শুধু শুধু রাগ করতে যাব কেন ? তেমন কিছু তো ঘটেনি।'

লিজা ইংরাজিতেই বলল, 'সেটা আপনার মনের উদারতা।'

আমি কথা বাড়াতে চাইলাম না। তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু তাতেই কথা থেমে যায় না। লিজা বলল, 'কেউ যদি তার পেশা বা জীবিকার কথা বলতে না চায়, তার জন্য জোর করার কোন মানে হয় না। মা কত কী যা তা বলছিলেন। আপনার যথেষ্ট সহ্য।'

আমি লিজার মুখের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো শুনছিলাম। কিন্তু লিজা কথাগুলো বলল, অন্যদিকে চোখ রেখে। লিজা মেমসাহেব। এই বেশবাস ভাষা, আমাদের কাছে, চিরদিনই তা-ই। বিদেশী মহিলাদের সঙ্গে যে কখনো বাত করতে হয়নি, তা না। লিজা ভারতের মেমসাহেব। কথাগুলো এখন ইংরাজিতেই বলল। তবু মনে হল, কথাগুলো যেন তেমন মেমসাহেবোচিত হল না। ওর মা কী বলেছেন, আমার কতখানি সহ্য, সেটা কি ওর মাথায় বিঁধে আছে ? আমি যেন ওর গলার স্বরে ভিন্ন সুর শুনি। একে কি অভিমানের সুর বলে ? বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে মেশার গুণ নাকি ? কিন্তু বাঙালী মেয়েরাই কি আজকাল, এত সহজে সহজ হয় ? তাছাড়া, আমার কাজের কথায়, লিজার অবিশ্বাসটা, এত নিশ্চিন্ত কেন ?

কথার শেষে লিজা আবার ওর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এল আমার দিকে। বললাম, 'আমি আপনার মাকে প্রায় ঠিক কথাই বলেছি।'

'খবরের কাগজে আর্টিকেল লেখেন ?' আবার বাংলায় বলল লিজা।

আমি জবাব দিলাম, 'নানান রকম লিখি।'

লিজা কোন জবাব দিল না। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে,

বইটা বুকের ওপর থেকে অসংকোচে তুলে নিল। তুলে নিয়ে বালিশের তলায় রাখল। শুধু একটুখানি আড়াল সরে গেল বলেই যেন, ওর সমস্ত অবয়ব একটি নতুন রূপে জেগে উঠল। ওর শরীরের স্নিগ্ধ নম্রতার মধ্যে, কোথায় একটা শক্তিও যেন জেগে আছে। নম্রতা আর শক্তি, এই দুয়ে মিলে, ও যেন সবাইকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে। দেখলাম, বইটা রাখতে গিয়েই, ওর কপালে চুলের গোছা এসে পড়ল। চোখে ছায়া পড়ল। ও উচ্চারণ করল, 'লেখক।'

এটাই ও বুঝে নিল, কিংবা জিজ্ঞেস করল, বুঝতে পারলাম না। তাই কোন জবাব দিলাম না।

লিজার গলার স্বর আরো নীচু শোনাল, 'এ লেখক কি কোন ছদ্মনামে লেখেনা ?'

আমার পরিষ্কার জবাব, 'না।'

আবার জিজ্ঞাসা, 'লেখক কি নিজের নামে লেখেন ? সেই নামটা কি আমরা শুনেছি ?'

আমার আবার পরিষ্কার জবাব, 'হ্যাঁ।'

নিরুপায় আমি। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখবার দায়ে, এইটুকু মিথ্যার আশ্রয় আমার। লিজা একটু চুপ করে রইল। তাকিয়ে রইল। আমি মুখ ফেরালাম। একটু পরে আবার শুনতে পেলাম, 'মানুষের মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যায় ?'

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমি কোন জবাব দেবার আগেই শেষ কথাটা ও বাংলাতেই বলল, 'শুভরাত্রি।'

শুভরাত্রি জানিয়েও, লিজা চোখ মেলে রইল। তাকিয়ে রইল অন্যদিকে। আমার আর কিছু বলার রইল না। একটু পরে অন্যদিকে পাশ ফিরে শুলো। আমি আবার চোখের সামনে বইটা মেলে ধরলাম। কিন্তু মনের কাছে ফাঁকি নেই। এই মুহূর্তে, বইয়েতে আর আমার মন নেই। লিজার মুখটা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। আর সেই কথাটা, যে-কথাটা জিজ্ঞাসুর সুরে বাজলেও, জবাব পাবার কোন আশাই যেন ওর ছিল না।

কেন এমন করে বলল লিজা ? ও কি আমার মিথ্যা বলার মধ্যে, অন্য কোন বাজে সন্দেহ কিছু করছে ? ও কি আমাকে নিতান্ত একজন মিথ্যুক বা শঠ ভেবে নিল ? কী বলতে চাইল ও ?

সেই তো আবার এক কথা হে। কথা ফুল, ফোটে ঝরে। বাগানের মধ্য দিয়ে তুমি হেঁটে চলে যাও। মুগ্ধ হও, অবাক লাগে। তারপরেও অনেক ফুল, অনেক ঝরা। এক নিয়ে তোমার বসে থাকবার কী আছে। অস্পষ্ট অনামী অধরা ফুলও ঝরবে। তুমি চলে যাবে আপনার বেগে। সব কথার জবাব নেই। সব কথা সংসারে বোঝা যায় না।

আমি আবার বইয়ের দিকে চোখ ফেরাতে গেলাম। কিন্তু লিজার দিকে একবার তাকালাম। ও-পাশ ফেরা শিথিল শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। পাখার বাতাসে ওর চুল উড়ছে। রক্তিম পা দুটো জড়াজড়ি করে আছে।

ঘুম না পেলেও, এই মুহূর্তে আলো আর আমার ভাল লাগল না। হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম। গাড়ি এবারে সত্যি নিঝুম। নাসিকাধ্বনিও নেই। রাতের গাড়ি চলছে সবেগে, সগর্জনে। সে কি কারোর তাড়ায় ছুটেছে কিংবা ছোটার বেগের ঘোরে, বুঝতে পারি না। গাড়িটাকে দেখলে একটা যান্ত্রিক শকট বলে যেন এই সময়ে ভাবতে পারছি না। এ যেন এক ভিন্ন সত্তা, অন্ধকারের বুক চিরে, ছুটে চলেছে। চলেছে, আরব সাগরের কূলে।

অন্ধকারেও জেগেছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ জানি না। দু'চার-জনের জেগে ওঠা টের পেয়েছিলাম। বোধহয়, একেবারে শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি। জেগে দেখলাম, স্বয়ং গোমেজগিন্নী, মেরী আর বিল্-এর পোশাক বদলানো হয়ে গিয়েছে। লিজা আর রোজা চা খাচ্ছে, মাটির ভাঁড়ে করে। ওদের দুজনের পোশাক তখনো বদলানো হয়নি। হাতের কব্জি ঘুরিয়ে দেখি, সাতটা বেজে গিয়েছে। জেগে থাকার কিছুটা শোধ নেওয়া গিয়েছে। অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছি।

সবটাই ভাল। কিন্তু চলন্ত গাড়িতে, মাটির ভাঁড়ে গরম চা দেখে, আমার রক্ত চনমনিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই, একটু আগেই কোন ইস্টিশন ছেড়ে এল গাড়ি। তখনই আমাকে দয়া করে ডেকে দিলে হত। হতভাগ্যের কপালেও একটু চা জুটে যেত।

রোজাই প্রথমে সুপ্রভাত জানাল। সুপ্রভাতের পাট মেটবার পরে, গোমেজ ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবে নাকি ?'

কাল থেকে ঠাকরুণ অনেক সুরে বেজেছেন। কিন্তু এমন সরস সুরে আর বেজেছেন বলে মনে হল না। আমার ভিতরটা যেন তলতলিয়ে উঠল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'আছে নাকি ?'

ঠাকরুণ বললেন, একি তোমার বাউণ্ডুলে ব্যাপার ? দেখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কী না। দাও তো মেরী।'

আমি সন্তর্পণে নেমে এলাম। মেরী আমাকে প্লাস্টিকের গেলাসে চা দিল। যথেষ্ট গরম, এখানো ধূমায়িত। না থাকবার কোন কারণ নেই, ফ্লাস্কেই রাখা ছিল।

ঠাকরুণ বললেন, 'দেখি, আমি আর একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। ভুঁড়িওয়ালা ষাঁড়টাকে আমার কুচিয়ে কাটতে ইচ্ছা করছে।'

বলেই তিনি চলে গেলেন। বাকীরা সবাই হাসল। মেরী আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কালকের সেই লোকটা, যে এই জানালার কাছে খালি গায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।'

গণেশদাদার কথা নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করেছে সে ?'

তিনজনেই হাসতে লাগল। তারপরে রোজা বলল, 'লোকটা বাথরুমের দরজায় দিয়ে ধাক্কা মারছিল, মা তখন ভিতরে।'

আমার চোখে অবাক জিজ্ঞাসা দেখে, রোজার মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। অস্বস্তিভরে বলল, 'মানে বুঝতে পারলেন না ? লোকটার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল।'

মেরী আর লিজা একসঙ্গেই খিলখিলিয়ে উঠল। ব্যাপার বোঝা গেল। গণেশদাদার সেই দুর্দশাগ্রস্ত চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী দুর্গতি ! ঠাকরুণের অবস্থাও অনুমেয়। ভুঁড়ি ফাঁসাবার ইচ্ছা তারপরে জাগতে পারে। বললাম, 'আরো তো বাথরুম ছিল।'

রোজা বলল, 'সবগুলোই বন্ধ। লোকটা তো পাগলের মত দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে।'

হায় গণেশদাদা, পেটটি নাদা! গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমার মনে পড়ে গেল। কথায় বলে, এই একটি ব্যাপারে, বাঘের ভয় থাকে না। কিন্তু এদিকে দেখ, যার কাজ সে করে যাচ্ছে। আমার তিন তলার বিছানায় হাত বাড়িয়ে, রোজা অনায়াসে সিগারেটের প্যাকেট পেড়ে নিল। খুলে ধরাল। লিজা বলে উঠল, 'এ কি রোজা, ওঁর সিগারেট খাচ্ছিস কেন?'

রোজা আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের পাতা নাচিয়ে হাসল। বলল, 'কাল রাত্রি থেকেই খাচ্ছি। খাব না?'

আমার দিকে চেয়েই জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

বিল্ বলে উঠল, 'ঠাক্‌মা আসছে।'

রোজা চমকে উঠে, মুখ হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। মেরী হেসে উঠে বলল, 'কী দুষ্টু ছেলে, কোথায় ঠাক্‌মা আসছে?'

বিল্ কিন্তু হাসছে না। গম্ভীর নির্বিকার মুখে বাইরে তাকিয়ে আছে। লিজা হেসে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বিল্, তুমি রসিকতা জান বটে। একটুও না হেসে, বিলের চুপ করে থাকাটাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। লিজা বলে উঠল, 'বেশ হয়েছে।'

রোজা বলল, 'বিল্‌টা সত্যি বড় দুষ্টু হয়েছে মেরী। ওকে এবার আমি ঠ্যাঙাব।'

মেরী সেকথার কোন জবাব না দিয়ে, ছেলের দিকে স্নিগ্ধ হেসে তাকাল।

বিল্ বলল, 'তুমি আমার পাওয়ানা জিনিস এখনো দাওনি। কলকাতায় কী বলেছিলে?'

রোজা সিগারেট টানতে টানতেই, ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল। পাওয়ানার কথাটা বোধহয় মনে রাখতে পারছে না। আর আমি দেখছি, বিল্ যতটা চুপচাপ আর শান্ত, ওর ভিতরটা তত টগবগিয়ে ফুটছে। শান্ত গম্ভীর মুখেই বলল, 'মনে করে দেখ।'

রোজা চমকে বলে উঠল, 'ওহ্, সেই দূরবীন সিনেমা? কিন্তু পরশু তো তুমি কিছু বলনি?'

বিল্ বলল, 'আমি তো তোমাদের সঙ্গে বাজার করতে যাইনি।'

রোজা বলল, 'ঠিক আছে বম্বেতে গিয়ে কিনে দেব।'

বিল্ কোন জবাব দিল না। তবে বোঝা গেল, আপাততঃ এই চুক্তিটা সে মেনে নিল। সম্ভবতঃ আর রোজাপিসীর পিছনে লাগবে না।

রোজার সিগারেটও শেষ, ঠাকরুণও এলেন। এসেই তিনি নির্দেশ দিলেন, 'রোজা লিজা, তোমরা এবার সেরে নাও। পরের স্টপেজে, মেরী আর বিল্‌কে নিয়ে ডাইনিং কারে যাব ব্রেকফাস্ট করতে। তোমরা যাবে পরের স্টপেজে।'

বলেই তিনি বসবার জায়গা থেকে আয়না তুলে নিয়ে ঠোঁট-রঞ্জনী দিয়ে, হাঁ করে ঠোঁটে ঘষতে লাগলেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে সরে গেলাম। গতকাল রাত্রের অভিজ্ঞতা আছে। রোজা আর লিজার বাথরুম যাওয়া, পোশাক ছাড়া শুরু হবে এবার। নিশ্চয়ই কিছু সাজগোজও আছে। আমি ব্যাগটা হাতে করেই নিয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত আমারই তাড়া লেগে গেল। দুই বোনের প্রস্তুতি-পর্ব সারতে সারতে, আমার বেলা চলে গেল। এদিকে পরের স্টপেজ এসে যাচ্ছে। আমার একটু উপবাস-ভঙ্গের ব্যাপার আছে। এমন কি, জামা-কাপড় গুছিয়ে পরে, আমারও একটু ভদ্রস্থ হবার কথা। সব কাজগুলো ত্বরিতেই সারতে হল। মাথাটা কোনরকমে আঁচড়ে, ব্যাগ থেকে চোখের কালো ঠুলিটা বের করতেই, রোজা সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। দেখাদেখির ব্যাপার না। একেবারে চোখে আঁটাআঁটি। তারপরেই জিজ্ঞাসা, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

আমি বললাম, 'চমৎকার।'

অতএব, রোজা বলল, 'তাহলে আমিই পরি।'

লিজা ইতিমধ্যে আমার বইটা খুলে বসেছিল। প্রায় গতকাল

রাত্রেরই মতই ওদের সাজগোজ। রঙেও 'এক'। কেবল লিজার কাজলটা কম। গলায় আবার মালাটা উঠেছে। লিজা বলে উঠল, 'ওকি রোজা, ওঁরটা তুই পরবি কি? দিয়ে দে।'

রোজা বলে উঠল, 'তুই যে কাল রাত্রে ওঁর সঙ্গে অতক্ষণ গল্প করলি, আমি কিছু বলেছি?'

লিজা হঠাৎ জবাব দিতে পারল না। ওর মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। তারপরেই ভুরু কুঁচকে বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলল, 'গল্প আবার করলাম কোথায়। আমি তো দু একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

রোজা বলল, 'ওই হল। ওটাকে গল্প করা বলে।'

লিজা একটু ঝাঁঝের ভান করে বলল, 'যা খুশি বল গে।'

রোজা ওর চোখ থেকে, কালো ঠুলিটা খুলে বলল, 'পরব না?'

আমি বললাম, 'কোন আপত্তি নেই।'

তা হলেই হল। রোজা চোখের পাতা নাচিয়ে আবার হাসল। চোখে ঠুলি পরে নিয়ে, জানলায় ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকাল। বুদ্ধির দিক থেকে কতখানি জানি না, বয়সের তুলনায়, ওর ব্যবহার লিজার থেকেও ছেলেমানুষিতে ভরা। ওর মনে কোন দ্বিধা নেই, আমি কিছু মনে করতে পারি কী না। মনে করিনি, বরং রোজার এই ছেলেমানুষি চঞ্চলতায় খুশিই হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, দুই বোনের জীবনকে দেখাটা দু-রকমের।

রোজা চঞ্চল, বোধহয় একটু শিথিলও। লিজার মধ্যে যে গভীরতা আছে, ওর মধ্যে বোধহয় তা কম। তাই রোজা সব কিছুতেই কম সতর্ক'ও। এমন কি কথাবার্তাতেও। রোজা বোধহয় খুঁটিয়ে দেখার চেয়ে, লহমার দেখাতেই সিদ্ধান্ত নেয়।

গাড়ির গতি আরো মন্থর হয়ে এল। আমি লিজার কাছ থেকে একটু দূরে বসেছি। শুনতে পেলাম, ও বলল, 'আপনার নিশ্চয় এসব ভাল লাগছে না?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ সব?'

'এই সব আর কি, মানে বাড়াবাড়ি যাকে বলে, সানগ্লাস নিয়ে টানাটানি—'

এবার আমি লিজাকে কথা শেষ করতে দিলাম না, 'আপনার বোঝাটা সব সময়ে ঠিক নয় মিস গোমেজ।'

লিজা অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল। জানি না, আমার গলায় ঝাঁঝ ছিল কী না। আপত্তির সুর ছিল, সন্দেহ নেই। আমি আবার বললাম, 'প্রাণ খোলা মনকে বুঝতে আমার কষ্ট হয় না! প্রীতি বন্ধুত্ব কে না ভালবাসে।'

লিজার টানা চোখ দুটো, পলকের জন্য যেন একবার বড় হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে, ও আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। গাড়িটা দাঁড়াল। রোজা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বলল, 'দেখি, মা আসছে নাকি।'

ইস্টিশনের যাত্রী আর নানান ফেরীওয়ালাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আমাদের এ কামরার মধ্যে ওঠা-নামার ব্যস্ততা চলেছে। লিজা চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে। কোলের ওপর বইটা খোলা।

গোমেজ ঠাকরুণ ঢুকলেন। এসেই তাড়া, 'যাও যাও, তোমরা চলে যাও। রোজা চলে গেছে। দেখ গিয়ে আবার জায়গা পাও কী না।'

তাঁর পিছনে পিছনে মেরী আর বিল্‌ও এল। লিজা উঠে, আমার দিকে একবার দেখে, এগিয়ে গেল। বইটা ওর হাতেই।

ঠাকরুণ মিথ্যা কথা বলেননি। খাবার বগীতে বেজায় ভিড়; উপবাস-ভঙ্গের জন্য সবাই ব্যস্ত। একটুখানি না অপেক্ষা করলে, কোন উপায় নেই। কিন্তু রোজা কোথায় গেল? লিজা আমার কাছাকাছি একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মত আরো কয়েক-জন অপেক্ষমান, আমাদের আশেপাশেই দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে, রোজা কোথাও নেই। আমি একটু অবাক হয়ে লিজার দিকে তাকালাম। লিজা আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'রোজাকে খুঁজছেন?'

বললাম, 'সে তো আমাদের আগে আগেই এল।'

লিজা ঘাড় নেড়ে একদিকে ইশারা করে দেখাল, 'ওই তো।'

তাকিয়ে দেখি, বাঁ দিকের তিনটে টেবিল পেরিয়ে, তিনজন যুবক সর্দারের সঙ্গে ও বসে গিয়েছে। এই দু-এক মিনিটের মধ্যেই, তাদের সঙ্গে ও কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে। চোখের কালো ঠুলিটা ও খোলেনি।

এই বোধহয় রোজা। ও অনায়াসে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সুযোগের সদ্ব্যবহারের দায়ে, কারোর জন্যে অপেক্ষা করাও

ওর ধাতে নেই। এক কথায় এটাকে আমি মন্দ বলতে পারি না। কেবল যে ক্ষিদের তাড়না, তা-ই না। সময় এবং জায়গার কথাটাও ভাবতে হবে।

এই সময়েই, আমার কানের কাছে বেজে উঠল, 'ধুর স্‌লা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেরে দিলেই তো হয়।'

এবার শোন, বাত্‌ কাকে বলে। সোজাসুজি না তাকিয়ে, একটু সন্তর্পণে বাতওয়ালাকে দেখবার চেষ্টা করি। তার আগেই, আর একজনের জবাব শুনতে পাই, 'গাড়ির ঝাঁকুনিতে দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না। কিন্তু ওই অ্যাংলো ছুঁড়িটা তিন দেড়েলের সঙ্গে ভিড়ে গেল কী করে? ওকে তো আমি গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি। বলতে গেলে আমাদের পরে ঢুকেছে।'

আপনা থেকেই আমার চোখ পড়ল লিজার দিকে। লিজা আমার দিকেই তাকিয়েছিল। ভেবেছিলাম ও রেগে উঠবে, অথবা গম্ভীর হয়ে যাবে। বাংলা কথা ও ভালই বুঝতে পারে। কিন্তু দেখলাম, লিজার ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখেও ঝিলিক। এবার আমি কথকদের দিকে ফিরে তাকাই। একেবারে নিখুঁত, যেমনটি ভাবা যায়। ছুরিমুখো জুতো থেকে, মুহুরিনালী পাতলুন, সব ঠিক আছে। কেবল, মাথার চুলটাকে কেমন করে কপালের কাছে, থুপি থুপি ভাবে সাজিয়ে রেখেছে, বুঝতে পারি না। আগে শুনতাম, সিঙাড়া পাকানো চুল। এ ঠিক সিঙাড়া না। এ যেন অনেকটা ঝোপঝাড় পাকানো।

সে না হয় হল। সাজগোজের এটা একটা রকম। আমার ভয়, এদের বঙ্গভাষা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। আর একজনের জবাব শোনা গেল, 'ও তো আমাদের ঠেকে এগিয়ে গেল। দেড়েল ছোঁড়া তিনটে ওকে ডেকে নিয়েছে।

অন্যজনের মন্তব্য, 'না না আগে থেকেই প্ল্যান ছিল। দেড়েলরা এসে জায়গা রেখেছে।'

মনের মত করে কথা বসাতে পারলে, মন খুশি। আমি ভাবি, এ কি ক্ষিদের জ্বালায়, না আর কিছু।

ইতিমধ্যেই আর একজনের কথা শোনা যায়, 'বেশ আছে মাইরি। একটু মোটা হলেও, জিনিস খাসা, না?'

কানে যেন ছুঁচের খোঁচা লাগে। ভাষার এমনি গুণ। কেবল

কইতে জানলেই হয়। হয়তো এমন করে এতটা ছুঁচের মত বিঁধত না। লিজা পাশে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, খোঁচাটা বড় বেশি জ্বালা আর লজ্জা ধরানো। বিশেষ করে, ভাষাটা লিজার পুরোপুরি আয়ত্তে। আমার চোখ আবার লিজার ওপরে গিয়ে পড়ল। এখন লিজা আমার দিকে তাকিয়ে নেই। কিন্তু কোথাও ছায়া নামেনি ওর মুখে। চোখে তেমনি ঝিলিক। বরং হাসিটা চাপবার জন্য, ওর ঝকঝকে দাঁত দিয়ে, নীচের ঠোঁট চেপে ধরেছে। দিশি ভায়ারা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, তাই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ততঃ লিজাকে দেখতে পেলে, তাদের মন্তব্য থামত কী না জানি না।

প্রশ্নের পরে, অন্যজনের জবাবটা আর পুনরুচ্চারণ সম্ভব হল না। কোনরকমে একবার চোখের কোণ দিয়ে, আমি লিজাকে আবার দেখে নিলাম। এবার লিজার মুখেও হঠাৎ রঙ লেগে গিয়েছে। একটি মেয়েলি গোপন লজ্জার তীব্রতায়, ওর চিবুকটা বুকের কাছে নেমে গেল। আসলে, আমার চোখ থেকে ও মুখটা লুকোতে চাইল। কিন্তু আমি এখন রীতিমত আতঙ্কিত। রোজাকে নিয়ে দুজনের মন্তব্য অনেক দূর পৌঁছেছে। আর কতদূর যেতে পারে, কে জানে। একমাত্র উপায় হিসাবে, আমি হঠাৎ একটু গলা তুলে, বাংলায় লিজার সঙ্গে কথা বলে উঠলাম, 'মিস গোমেজ, আপনি বইটাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

ফল প্রায় হাতে হাতেই। দুজনেই দুজনের গলায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন পাশ ফিরে, আমার দিকে তাকাল। তারপর লিজার দিকে। লিজা এক মুহূর্তের জন্য অবাক হলেও, ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি করল না। জবাবটা ও বাংলাতেই দিল, 'হ্যাঁ, ডাইনিংকারের টেবিলে চা খেতে খেতে পড়ব বলে নিয়ে এসেছি।'

এবার দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। কী ভাবল জানি না। দুজনে চোখাচোখি করল, আরো ঘন হল। একজন আর একজনকে কী যেন বলল, শোনা গেল না। যাক্‌ অন্ততঃ ওদের গলার স্বরকে, না শুনতে পাওয়ার পর্দায় নামানো গিয়েছে। একজন আবার আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর দুজনেই একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবার ওদের কথা চলল প্রায় কানে কানে। লিজা আমার দিকে একবার তাকাল। ঠোঁট টিপে হাসল। কোন কথা বলল না।

ইতিমধ্যে, এক দলের উপোস-ভঙ্গ শেষ হল। নতুন করে খাবার পরিবেশিত হতে লাগল। আমরা যারা দাঁড়িয়ে আছি, তাদের জন্য সব টেবিলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সবাই উঠে দাঁড়াতে, ভিড়টা যেন বেড়ে গেল। গাড়ি এখন বেশ বেগে চলন্ত। কারোর নামবার উপায় নেই।

জায়গা খালি করে যারা দাঁড়াল, আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের জায়গায় বসলাম। আমাকে আর লিজাকে দেখে, রোজা হাতছানি দিল। তিন সর্দার যুবক উঠে দাঁড়াল। রোজা তাদের বলল, 'আপনারা যে আপনাদের টেবিলে আমাকে জায়গা দিয়েছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।'

তিন সর্দারই, ডগমগিয়ে, কলবলিয়ে উঠল। ধন্যবাদের কোন কথাই নেই। মিস যে তাদের সঙ্গে বসেছিল, তাতে তারা খুবই খুশি, ইত্যাদি। তারপরে সকলেই একবার লিজার দিকে উৎসুক সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে দেখল। কেবল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাংলা মার্কা লোকটার দিকে চেয়ে, তারা বুঝতে পারল না, এ-জীবটি এমন দুটি ললনার সঙ্গে কেন। সর্দার যুবকদের বীরত্বব্যঞ্জক চোখে, আর যোদ্ধা মুখের ভাবটা সেইরকম।

তারা সরে যেতে, রোজা আমাকে ওর পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'এখানে বসুন।'

নারীর সাধে বাদ সাধতে নেই। আমি রোজার পাশে গিয়ে বসলাম। লিজা জানালা ঘেঁষে, আমাদের মুখোমুখি বসল। রোজা প্রথমেই বলল, 'দিন, একটা সিগারেট দিন, গাড়ি থামবার আগে খেয়ে নিই।'

আমি ওকে সিগারেট দিলাম। লিজা একবার এদিক ওদিক দেখে, হেসে বাংলায় বলল, 'আপনি অনেক কায়দা জানেন।'

'কায়দা?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব সামলে দিয়েছেন।'

'ও।'

আমি হেসে, একবার রোজার দিকে তাকালাম। লিজাও রোজার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বললাম, 'এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

রোজা আমাদের দুজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে দেখছিল। বাংলা বুঝতে পারছিল না। অথচ আমাদের তাকানো থেকে, একটা

সন্দেহ ওর চোখে ফুটে উঠছিল। বলল, 'লিজা, নিশ্চয়ই তোরা আমাকে নিয়ে কোন কথা বলছিস্।'

লিজা আবার ইংরাজিতে ফিরে গেল। 'হ্যাঁ, তোর কথাই হচ্ছে।'

রোজা বলে উঠল, 'আর তা নিশ্চয়ই আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে?'

এ আবার আমার দায়। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'মোটেই নয়।'

লিজা বলল, 'দুটো বাঙালী ছেলে, দূরে থেকে তোকে খুব প্রশংসা করছিল, আমরা শুনছিলাম।'

রোজা একটু অবাক সন্দেহে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে, লিজাকে বলল, 'আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে?'

লিজা বলল, 'সত্যি।'

রোজা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

লিজার মত এত সহজে, কথাটা আমি কেমন করে বলি। আমি একবার লিজার দিকে দেখলাম। লিজা-ই আবার বলল, 'আমি বলছি সত্যি। ওটা প্রশংসাই। সকলের প্রশংসার ভাষা একরকম হয় না।'

বলে লিজা আমার দিকে তাকাল। লিজার কথা একবারে উড়িয়ে দেবার মত না। সকলের প্রশংসার ভাষা এক না। পরিবেশ মন আর রুচি, কথা তৈরি করে। কথার সুরও তৈরি করে। রোজাকে নিয়ে যারা কথা বলছিল, আসলে তারা রোজার প্রশংসাই করছিল। তারা জানত না, তাদের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে। তাদের প্রশংসার ভাষাগুলো খোলা কথা না, গোপন কথা। দুই জোয়ানে বলবে, তাও একটি মেয়েকে, সে কথা একটা অন্যরকম শোনাবে বৈকি। তবে ওই, বাংলা কী না, কানে কেমন খোঁচায়।

রোজা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তারা?'

লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় করবি নাকি?'

রোজা বলল, 'একটু দেখে তো রাখি।'

লিজা না তাকিয়ে বলল, 'ডান দিকে, তৃতীয় টেবিল।'

রোজা মুখ তুলে সেদিকে তাকাল। বলল, 'ওরা তো আমাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সিনেমা আর্টিস্টের মত সেজেছে ওরা। হাঁ করে আমার সিগারেট টানা দেখছে।

বলে, রোজা যেন লজ্জা পেয়েই হেসে উঠল। এদিকে খাওয়ার পালা শুরু। ছুরি চামচ থালায় থালায়, ঠং ঠাং ঠক ঠক ঝনাৎকার। একটি গোটা বাঙালী পরিবার দুটি টেবিল জুড়ে। বোধহয়, পিতা মাতা, তিন কন্যা দুই পুত্র। রকমারি মানুষের ভিড়। কালো পুরুষের ধলা বিবি পর্যন্ত।

খাওয়াও একটা আসর। একটা মেলার মত। মেজাজ মন যদি মানে, তবে চলন্ত গাড়িতে, এও এক রূপ। মানুষ প্রকৃতি দেখতে, জীব তাড়নার নিবৃত্তি। ইতিমধ্যেই, বাইরের রৌদ্রে বেশ ঝলক দিচ্ছে। গতকাল রাত্রের সেই প্রকৃতি আর নেই। এখন কেবল মাঠের পরে মাঠ, কিন্তু সবুজের ছায়া খুব কম। গাড়ি উত্তরপ্রদেশ দিয়ে চলেছে। মধ্যপ্রদেশের দিকে তার লক্ষ্য। মাঠ এখন ধূলা ঢ্যালায় ভরা। কোথাও কোথাও স্বল্প চাষের চিহ্ন। জলাশয় কম। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে, নজর চমকে দিয়ে চলে যায়। তারই মধ্যে কোথা থেকে সহসা জেগে ওঠে, সবুজ মাঠ, আমবাগানের নিবিড় ছায়া। ছেলেরা খেলা করে। মহিষের পালের কাছে দাঁড়িয়ে,রাখাল ছেলেটা, রোজকার মত, আজও অবাক হয়ে রেলগাড়ি দেখে। গাড়িটা চলে যায় বাগানের পাশ দিয়ে। ইঁদারা ঘিরে বস্তির ঝি-বহুড়িরা, জল তোলা ভুলে গিয়ে, গাড়ির দিকে চোখ ফেরায়। পাখী ডাকে কি ডাকে না, কে জানে। কানে যেন বাজতে থাকে। পলকেই আবার তা হারিয়ে যায়, মাঠ জেগে ওঠে। ঘুরতে ঘুরতে, আমাদের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে।

এক সময়ে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। রোজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'লিজা, আমি যাই, তোরা খেয়ে আয়।'

লিজা বলল, 'ব্রেকফাস্ট শেষ হলেও, আমি এখন উঠছি না।'

বলে ও আমার দিকে একবার তাকাল। গাড়ি দাঁড়াল। উপবাস-ভঙ্গের আমরাই শেষ দল। গাড়িটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি হাত চালাল, যাতে এই স্টপেজেই কামরায় ফিরে যেতে পারে। লিজা আমার পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, 'কামরায় ফিরে যাবার তাড়া নেই তো?'

বললাম, 'তাড়া আর কী।'

গাড়ি ছাড়বার আগে, অধিকাংশ লোকই খাবার পাট চুকিয়ে নেমে গেল। কেবল দুটি টেবিলে, দুজন একলা মানুষ বসে

রইল। গাড়ি ছাড়বার মুখেই, লিজা বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মন ভাল আছে?'

বললাম, 'মন খারাপ তো কখনো হয়নি।'

লিজা একটু হাসল। বলল, 'তখন রোজার কথা বলতে, আপনি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েছিলেন?'

বললাম, 'বিরক্ত হইনি, আপনায় কথায় আপত্তি করেছিলাম।'

লিজা এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, হাতের রুমাল দিয়ে, আলতো করে ঠোঁটে চাপল। ঠোঁটের রঙ যেন ধুয়ে না যায়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আর কোন কারণে বিরক্ত হননি তো?'

আমি জানি, লিজা কেন বারে বারে বিরক্তির কথা জিজ্ঞেস করছে। গতকাল রাত্রে, শুভরাত্রি জানাবার আগের কথাটা ও ভুলতে পারছে না। মুখ দেখে মানুষের মন বোঝা যায় কী না, সে প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না। গতকাল রাত্রে, কথাটা বলেই, হঠাৎ শুভরাত্রি জানিয়ে, আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। নিজের সেই আচরণটা ওকে এখনো বিঁধছে। কিন্তু আমার তো কোথাও বিঁধে নেই। লিজার সেই কথাকে আমি ফেলে এসেছি, কাল রাত্রের সীমায়। বললাম, 'না।'

লিজা চা খেতে খেতে, তেমন করেই ঠোঁটে রুমাল চাপল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর বাইরের দিকে চোখ ফেরাল। জানালা খোলা। বাতাসের ঝাপটায়, ওর চুল উড়ছে। ও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, মুখের ভাব দেখে মনে হয়, দৃষ্টি বা মন, কোনটাই বাইরে নেই। বাতাসের ঝাপটায়, ওর জামাটাও উতলা। যেন ওর সমস্ত শরীরে দুরন্ত ঢেউ লেগেছে।

আমি মুখ ফেরাবার আগেই, ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'কথাটা না বলে পারছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কথা?'

'কাল রাত্রের কথাটা।'

আমারও সেটাই অনুমান। আমি না চাইলেও, লিজার না চেয়ে উপায় নেই। সেই হিসেবে, লিজাকে আমার মনে হয়, ওর কোন কথাটাই হঠাৎ জন্ম নেয় না। ছিটকে আসে না। বলার

পরমুহূর্তেই তার সবটুকু শেষ হয়ে যায় না। আমি কিছু না বলে, ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

লিজা একবার ঠোঁট টিপল, টেপা হাসির ভঙ্গিতে। বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছিল, তাই কথা বাড়াবার ভয়ে আমি আর কিছু বলতে চাইনি। সে জন্য যেন আমাকে ভুল বুঝবেন না। তবে—'

লিজা থামল। অকারণেই একবার মাথা নীচু করে, হাঁটুর কাছে জামাটা একটু টানাটানি করল। আবার মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'তবে কথাটা আপনাকে কোনরকম আঘাত করবার জন্যে বলিনি।'

এর পরে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, তবে কিসের জন্য? কিন্তু আমি কিছু না বলে, ওর মুখ থেকেই শুনে যেতে চাই। যে-কথার কোন দায়ই আমার নেই, সে-কথায় কথা মেশাতে চাই না। লিজা ওর নিজের দায়ে বলুক।

কিন্তু লিজা হঠাৎ বলল, 'কথা বলছেন না যে?'

বললাম, 'আমার তো বলার কিছু নেই। আপনার কথা শুনছি।'

লিজাকে এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর আর সন্দিগ্ধ মনে হল। বলল, 'তবে, কথাটা আমার দিক থেকে আমি মিথ্যা বলিনি।'

এবার আমার ভুরুতে বাঁক, চোখে জিজ্ঞাসা। লিজা থামল না, আমার প্রশ্নের জন্যেও অপেক্ষা করল না। বলল, 'কেন আমার এরকম মনে হচ্ছে জানি না, কিন্তু নিজের সম্পর্কে আপনি সব সত্যি কথা বলেননি, এটা আমার ধারণা।'

লিজার গলার স্বরে এরকম একটা আত্মবিশ্বাস, যেটা ওর মুখেও ছায়া ফেলেছে। তথাপি ও একটু হাসবার চেষ্টা করল যেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আপনাকে তার জন্যে কিছু বলতে হবে না! সত্যি বা মিথ্যে, কিছুই না। আমার ধারণা তাতে বদলাবে না।'

আমি ওর দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

লিজা ওর বাতাসে ঝাপটা খাওয়া মাথাটা নেড়ে বলল, 'জানি না।'

বলে, ও মাথা নীচু করে রইল। রঙ-মাখানো নখ দিয়ে, টেবিলে আঁকি-বুকি কাটতে লাগল। আমি অবাক হয়ে, ওর দিকে

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। পুরোপুরি একটি মেমসাহেবকে আমার সামনে বসে থাকতে দেখেও তাকে আমার চিরদিনের চেনা মেমসাহেব বলে মানতে পারলাম না। তাছাড়া, এখন ও বাংলায় কথা বলছে। কিন্তু এমন দৃঢ় ধারণা কেমন করে এল লিজার মনে? লিজা আমাকে আগে কোনদিন দেখেনি। আমার কোন পরিচয়ই ওর জানা নেই। পরিচয় আমি গোপন রাখতে চেয়েছি। নিতান্তই নিজের মনের স্বস্তির জন্য।

লিজা মুখ তুলল, আবার। এখন ওর মুখে সহজ হাসি। সম্ভবতঃ ওর ভিতরে একটা মানসিক উত্তেজনা চলছিল। উত্তেজনাটা আর কিছু না। ওরই বিশ্বাসের কথাটা আমার মুখের ওপর কোনরকমে বলে ফেলার উত্তেজনা। সেটা ও কাটিয়ে উঠেছে, ওর মুখের স্বচ্ছন্দ হাসি দেখলেই বোঝা যায়। হেসেই বলল, 'কিন্তু এ কথাটা থাক, আর নয়। নিশ্চয়ই আপনার কোন অসুবিধে আছে বলেই, বলতে পারেননি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মিস গোমেজ—'

লিজা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আপনি আমাকে লিজা বলে ডাকুন। আমার কোন বাঙালী ছেলে বা মেয়ে বন্ধুই আমাকে মিস গোমেজ বলে ডাকত না।'

আমি বাঙালী বটে, লিজার বন্ধু এখনো হয়েছি বলে, মনে করতে পারি না। সে কথায় এখন আর যেতে চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনার অটুট ধারণাই বা হল কেন?'

লিজা বলল, 'বলেছি তো, জানি না কেন।'

বলে, এক পলক আমার চোখের ওপরে চোখ রেখে, ঠোঁটের কোণে হাসল। বইটা টেবিলের ওপর থেকে, সামনে টেনে নিল। আর আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, লিজা নিশ্চয়ই ঈশ্বরী বা অন্তর্যামী না। হয়তো যেভাবেই হোক, আমার পরিচয়টা ওর জানা আছে।

তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি কোন অপরাধ করবার জন্য মিথ্যা বলিনি। তথাপি, মনের মধ্যে কোথায় একটা অস্বস্তি খচ্ খচ্ করতে থাকে। এলোমেলো কৌতূহল, নিজেকেই বিব্রত করে তোলে। বিশেষতঃ লিজা যেন কেমন রহস্যময়ী হয়ে উঠল আমার কাছে। ওর ঠোঁটের কোণের হাসিটা যেন অক্ষয় হয়ে

রইল। বইয়ের খোলা পাতায় ওর চোখ। কিন্তু ও যে বই পড়ছে, তা আমার মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আর কোন চোখ দিয়ে ও আমাকেই দেখছে। দেখছে আর মনে মনে হাসছে।

লিজা হঠাৎ চোখ তুলল, বলল, 'আপনাকে আর একটু চা করে দেব?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

লিজার এই আচরণটাও যেন, রহস্য দিয়েই ঢাকা। বেয়ারা এল এ সময়ে দুটো আলাদা বিল নিয়ে। আমি দুটোই তার হাত থেকে নিলাম। লিজা তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগ খুলতে গেল। আমি হাত তুলে ওকে নিরস্ত করে, বেয়ারার হাতে টাকা দিলাম। বললাম, 'সবটাই নিজের হাতে নেবেন না, কিছু ছেড়ে দিন।'

লিজা হেসে উঠল। কেমন একটা খুশির ঝলক ওর হাসিতে। বলল, 'নিজের হাতে সব আব্যর কী নিতে গেলাম। আমি তো কিছু বলছি না। ছেলেরা ছেলেদের মত ব্যবহার করলে আমার ভাল লাগে।'

কথাটা নিশ্চয় টাকা দেবার প্রসঙ্গেই। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ।'

লিজা আবার বলল, 'আসলে, আমি একেবারে বাঙালী মেয়ে।'

বলতে বলতেই, ওর মুখে যেন একটা চকিত মেঘের ছায়া নেমে এল। এক মুহূর্তের জন্য ওকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাল। পরমুহূর্তেই আবার হাসল, যদিও হাসিটা তেমন খোলতাই না। বলল, 'মা শুনলে খেয়েই ফেলবে।'

কথাটা বলে, ও শব্দ করে হাসল। এবার আমি একটু কৌতূহল প্রকাশ করলাম, 'আপনি কতদিন বাংলাদেশে আছেন?'

লিজার হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল, 'অনেকদিন। আট বছর বয়সে এসেছিলাম, পঁচিশ বছরে পড়লাম।'

বয়সের হিসাবে, লিজাকে আমি তেইশ ভেবেছিলাম। কম দিন না। সতের বছর বাংলাদেশে থাকলে, সকলেই বাঙালী হয়ে যায় না। বিশেষ একজন গোয়ানীজ খ্রীস্টান কন্যার পক্ষে। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত যাকে দেখলে মেমসাহেব ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু বাঙালী হতে যাদের ইচ্ছা করে, সতের বছর তাদের কাছে অনেকখানি। যাকে বলে ভেতো বাঙালী, সেটা হবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু লিজার এমন বাঙালী হবার সাধ হয়েছিল কেন?

বাঙালী জীবনের ধারায় আর কোন অমৃত আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা বলতে বলতে, লিজা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। এখনো তাকিয়ে আছে। ও এখন সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। ও এখন রেলের কামরায় নেই, ছুটন্ত তেপান্তরের বুকেও নেই। ও আছে ওর নিজের মধ্যে, একান্ত ওর সতের বছরের জীবনের কোথাও। একটু পরে, সেদিকে মুখ রেখেই, আমাকে শুনিয়ে বলল, 'আর জীবনে কখনো এ দেশে আসা হবে কী না, কে জানে। একটা চাকরি যদি পেয়ে যেতাম।'

আবার একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে, ও আস্তে আস্তে কামরার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমার দিকে চেয়ে, একটু হেসে, আবহাওয়াটা প্রসন্ন করতে চাইল। আমি হেসে একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, 'কিন্তু বাংলাদেশে চাকরি পাওয়াটাই তো জীবনের সব নয়।'

লিজা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি তেমনি-ভাবেই বললাম, 'নিশ্চয় একজন বাঙালীকে বিয়ে করে এখানে ঘর বেঁধে বসতেন না, তা হলে আপনার—'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেজে উঠল ওর গলায়। মুখটা একবার আগুনের ছটায় ঝলকে উঠে, ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। রুমাল ধরা হাতটা ওর মুঠি পাকিয়ে গেল, আর পাকানো মুঠিটা ওর ঠোঁটের ওপর জোরে চেপে বসল। আমি অবাক হয়ে ডেকে উঠলাম, 'লিজা!'

লিজা কোন কথা বলল না। বলতে পারল না। ঠোঁটে চাপা মুঠির ওপরে আর একটা হাত চাপা দিল। যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে গলার ভিতরের কোন শব্দকে, ঠোঁটের দরজায় আটকে রাখতে চাইছে। মুখ অনেকখানি টেবিলের কাছে নেমে গিয়েছে। ভাল করে আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর গলা আর কাঁধের কাছে, পেশি আর শিরা কাঁপতে দেখে বুঝতে পারছি, ও বেন একটা তীব্র কান্নাকে চাপতে চাইছে, আর্তনাদকে দমন করতে চাইছে।

নিজেকে আমার কেমন অসহায় আর অপরাধী মনে হতে লাগল। আমার কথার মধ্যে, ওকে আমি কোনরকম আঘাত বা

অপমান করতে চাইনি। তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি আবার ডাকলাম, 'লিজা, শুনুন। আমি ঠিক কী বলেছি—'

লিজার মাথাটা নড়ে উঠল। কাঁধ এবং গলার শিরা আর পেশি স্থির হল। ওর এমনভাবে বাইরের দিকে মুখটা টেনে নিয়ে গেল, ওর মুখের প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। কেবল ওর নীচু ভেজা স্বর শুনতে পেলাম, 'এক মিনিট', তারপরেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, লিজা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। বিস্ময় আর কৌতূহল, মেঘের মত জমাট হয়ে উঠল আমার মনে। কিন্তু আমি ওর সামনে থেকে উঠে পড়লাম। তাতে হয়তো ও অনেকটা স্বস্তি বোধ করবে। কিন্তু আবার ওর গলা আমি শুনতে পেলাম, 'যাবার দরকার নেই, ঠিক হয়ে গেছে।'

বলতে বলতেই, ও আমার দিকে ফিরল। চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেও, সদ্য-কান্নার চিহ্ন দূর করা যায়নি। জলের গেলাসটা টেনে নিয়ে, একটু জল খেল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে, লজ্জা জড়ানো হাসি হাসল, বলল, 'বিচ্ছিরি, কিছু মনে করবেন না।'

মনে করবার কি আছে না আছে, তা-ই তো বুঝতে পারছি না। সহসা বাঁধ ভেঙে, এই চকিত গলনের কারণ কী, তাই বুঝতে পারলাম না।

লিজা কিন্তু হাসিটা থামাল না, আর কথাগুলোও কেমন এলোমেলো শোনাতে লাগল, 'মানে, কোন অর্থই হয় না, পাগলামি। আপনি কী ভাববেন কে জানে?'

আমি জবাব দিলাম, 'কী ভাবব, আমি তাই বুঝতে পারছি না।'

আমার মুখ দেখে আর কথা শুনে, লিজার হাসিটা প্রায় খিল-খিলিয়ে বেজে উঠল। বলল, 'সত্যিই তো, কী আবার ভাববেন। পাগলামি আর ছেলেমানুষির জন্য, ভাববার কী আছে। যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই, আমি একটা যাচ্ছেতাই।'

যাচ্ছেতাই। লিজা একটা যাচ্ছেতাই। কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার আমি কোনদিন দেখিনি। একটি মেয়ের সহসা বাঁধ ভাঙল, চোখ গলল। যেন তার বুকের থেকে শিকড় ছিঁড়ে কিছু উপড়ে আসতে চাইল। তারপরে সে লজ্জায় হাসল, খিলখিল করে হাসল,

বলল, 'আমি একটা যাচ্ছেতাই।'

কিন্তু সেই তো কথা, মন গুণে ধন। শুধু এইটুকু শুনেই, এইটুকু দেখেই, আমার মনের সমস্ত কৌতূহলকে কি নিবৃত্ত করতে হবে? বুঝতে পারছি, লিজার মূলে কোথাও হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে গিয়েছে। এখনো যে ও হাসছে, এটাকে আমি স্বাভাবিক হাসি বলে মেনে নিতে পারছি না। ওর চোখের রক্তিমতা এখনো যায়নি। যদিও, লজ্জা এখনো ওর মুখে চেপে আছে। সন্দেহ নেই, একটা কঠিন ব্যাপারকে, লিজা অত্যন্ত দ্রুত সামলে নিয়েছে। কিন্তু সেই কঠিন ব্যাপারটা কী?

লিজা আমার দিকে তাকিয়ে, নতুন করে যেন লজ্জা পেল। বলল, 'উঁহু, অমন করে তাকাবেন না, চোখ ফিরিয়ে নিন।'

আমি সত্যি সত্যি মুখ ফেরাতে গেলাম। ও আবার হেসে বেজে উঠল, 'বারে, সত্যিই আপনাকে তাকাতে বারণ করেছি নাকি!'

বললাম, 'তা জানি, সত্যি বারণ করেননি।'

লিজা বলল, 'চোখ থেকে সব মুছে ফেলুন। সব জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। বললাম, 'বেশ।'

লিজা বলল, 'ইস্, এমন করে বলছেন, যেন আপনি খুব শান্ত শিষ্ট ল্যাজ বিশিষ্ট, একটুও অবাধ্য নন, সব কিছু সহজেই মেনে নেন।'

বললাম, 'আমি তো তা-ই।'

'মিথ্যে কথা।'

লিজা কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলল। আমি হঠাৎ কোন জবাব দিলাম না। কয়েক পলক আমরা চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম। লিজা হেসে উঠল। বলল, 'আপনি আমাকে একটা বোকা গোয়ানিজ মেমসাহেব মেয়ে ভেবেছেন, না?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গোয়ানিজ মেমসাহেবরা বোকা মেয়ে হয় নাকি?'

লিজা বলল, 'আপনি নিশ্চয় তাই ভেবেছেন, তা না হলে ওভাবে বলতেন না, আপনি তো তা-ই। আপনাকে আমি খুব চিনি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'খুব চেনেন ?'

লিজা খুব সহজেই বলল, 'চিনি বৈকি।'

বলে ঠোঁট টিপে, ওর টানা চোখের কালো তারায় ঝিলিক হেনে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। এই যে সেই নানী পানীর হাল হল। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। আশমানের পানীর মর্জি আর নানীর মন বোঝা দায়। গোয়ানি গোরা মেয়েটা কী খেলা খেলছে। এখন আবার চেনাচিনির কথা বলছে। সত্যি চেনে নাকি ? তাই কি তখন অত জোর দিয়ে বলেছিল, নিজের পরিচয়ের ব্যাপারে আমি সত্যি কথা বলিনি !

চকিতে লিজার দাঁত দেখা গেল, একবার ওর নীচের ঠোঁটে আলতো দংশন করল। তারপরে ঘাড় দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী মোশাই, কী ভাবছেন ?'

এতক্ষণে চোখের জলের আতুর আবেশটা কাটিয়ে, লিজা সত্যি সত্যি ঝকঝকিয়ে উঠেছে। ওকে এই মুহূর্তে, খুশি আর ছল-ছলানো দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি সহজে মুখ খুলতে রাজী না। লিজাই বলুক, চেনাচিনিটা কেমন। ও নতুন করে আমার কাছে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। বললাম, 'ভাবছি না কিছুই। আপনার কথা শুনছি।'

লিজা বলে উঠল, 'তবে শুনুন, আপনাকে আমি খুব ভালই চিনি।'

'তাই নাকি ? শুনে খুশি হচ্ছি।'

'তা জানি না খুশি হচ্ছেন কী না, পরেও হবেন কী না। তবে জেনে রাখুন, কাল থেকে আজ এ পর্যন্ত আপনাকে যতটুকু দেখেছি, তাতেই আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি।'

যাক, অন্ততঃ একটা কথা জানা গেল, চেনাচিনিটা কাল থেকে, আজ এ সময় পর্যন্ত। আমি নিরীহ ভাবেই হেসে বললাম, 'না চেনার কী আছে বলুন ? আমি তো মুখে মুখোশ এঁটে নেই।'

'আপনি মুখে মুখোশ এঁটে নেই ?'

লিজার গলায় বিস্ময় আর কৌতুকের ঝলক বেজে উঠল। চোখের কালো কালো তারা দুটি ঝিলিক হানল। বলল, 'আপনি মুখোশ এঁটে নেই তো, পৃথিবীতে কে মুখোশ এঁটে আছে, হেই মোশাই ?'

শেষের সম্বোধনটা ঘাড় কাৎ করে, এমনভাবে ছুঁড়ে দিল, মনে হল, লিজা ছাড়া আর কারোর পক্ষে বোধহয় সম্ভব না। এই ভঙ্গি আর উচ্চারণের মধ্যে, ও যেন একেবারে অন্যরকম একটা বিশিষ্ট সত্তায় জেগে উঠল। গলার স্বরে ওর একটু বিদ্রূপও মেশানো আছে। আমার হাসিও পেল, অবাকও হলাম। এমন অভিযোগ তো কেউ করেনি। সংসারে বা সংসারের বাইরে দশজনের সঙ্গে চলতে গিয়ে, দশজনের তালে তাল দিয়ে ফিরতে চেয়েছি। তার মধ্যে মুখোশ আঁটব কেন ? বললাম, 'আপনার যা মনে হয় বলুন।'

লিজা হাত দিয়ে কপাল আর গালের কাছ থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'আপনি শান্তশিষ্ট নিরীহ অমায়িক আর—আর কী যেন বলে—অসহায়। কিন্তু আমি বলছি, আপনি কোনটাই নন।'

আমার মুখে হাসিটা লেগে রইল, চোখে জিজ্ঞাসা। কোন কথা বললাম না। লিজা টেবিলের ওপার থেকে, ওর মুখটা এগিয়ে নিয়ে এল। তারপর গোপন কথা বলার মত নীচু স্বরে বলল, 'গালাগালির অর্থে নেবেন না যেন। আপনি ধূর্ত নিষ্ঠুর, দুরন্ত। আরো বলব ?'

'বলুন।'

'তাহলে একটা কথা দিন।'

'কী ?'

'আমাকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারবেন ?'

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। লিজাও তাকাল। লিজার চোখের কালো তারায় একটি নিবিড় ঔৎসুক্য আর জিজ্ঞাসা। তার ওপারে, আরো গভীরে কি আমি আরো কিছু দেখতে পাচ্ছি লিজার চোখে ? লিজার কালো দুটি নিশ্চল তারা। সহসা যেন সেই চোখের তারায় আরো দুটি তারা দেখতে পেলাম। যে-তারা দুটিতে রুদ্ধ কান্না থমকে আছে। গভীর একটা ব্যথায় ভরে আছে। তীব্র যন্ত্রণায় অনেক খোঁচাখুঁচির দাগ লেগে আছে। কাজল টানা চোখের তারায় তা ধরা পড়ে না। এই চোখের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে যেন সামনের এই রূপে, এই বেশবাসে চেনা যায় না। চলতে ফিরতে, কথার হাসির ঝিলিকে, তার কোন পরিচয়ই ধরা পড়ে না। কারণ, সে যে কথা বলতে পারে না।

গলার কাছে রুদ্ধ স্বর নিয়ে, সে সকলের অগোচরে, অন্যখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কথা বলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

স্নেহে এবং ব্যথায়, আমার ভিতরটা যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইল। লিজাকে মাথায় হাত দিয়ে, আমার একটু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করল।

হঠাৎ লিজার চুপি চুপি স্বর শুনতে পেলাম, 'চিরকৃতজ্ঞ আমি।'

চেয়ে দেখি, ওর চোখের কোণে জল এসে পড়েছে। ঠোঁটে হাসি চিকচিক করছে। আমি ডাকলাম, 'লিজা'।

লিজা খুব তাড়াতাড়ি রুমাল চেপে, ওর চোখ মুছে নিল। কিন্তু ওর মুখে কোনরকম লজ্জার ছাপ নেই। ও হেসে আমার দিকে তাকাল। আমিও তাকালাম। একটু সময় আমরা দুজনেই কথা বলতে পারলাম না। তারপরে বললাম, 'আপনার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।'

লিজা বলল, 'তার আগে বলুন তো, আমি কী রকম পাজী।'

আমি বললাম, 'সেটা আমার আগে থেকেই সন্দেহ হয়েছিল।'

লিজা খিল খিল করে বেজে উঠল। তারপরে বলল, 'কিন্তু আপনাকে যা যা বলেছি, বলুন সব সত্যি কী না?'

'সত্যি মিথ্যে তো সব আপনার কাছে। আপনার বিশ্বাস কি কেউ টলাতে পারে?'

লিজা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, তা পারে না। আমার দশটা বিশ্বাস নেই। যা বলি তা একটা বিশ্বাস থেকেই। আপনি যখন অধিকার দিয়েছেন, তখন বলছি, আপনি আসলে অশিষ্ট দুষ্টু অবাধ্য।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে জানা গেল?'

লিজার সহজ জবাব, 'একটা মন দিয়ে।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল, সেই মনের স্বরূপ কী? দ্বিধা হল, জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বললাম, 'এতগুলো দোষ নিয়ে বেড়াচ্ছি, কোনদিন বুঝতে পারিনি তো।'

লিজা বলল, 'বুঝবেন কেমন করে? আপনার মজা তো

সেখানেই।'

'কী রকম?'

'আপনার দোষের সব বোঝা যে অন্যে ঘাড়ে বয়ে বেড়াচ্ছে।'

আমি লিজার চোখের দিকে তাকালাম। লিজাও। লিজা কি অর্থে কথাটা বলল, আমি বুঝতে পারছি। ও আমাকে আঘাত বা অপমান করার জন্য কথাটা বলেনি। ও যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই মনে মনে ভাবি, জীবনে সবাইকে সুখী করতে পেরেছি, তা কখনো দাবী করতে পারি না। জেনে বা না জেনে, দুঃখও দিয়েছি অনেককে। আসলে এই কথাটাই লিজা বলতে চাইছে। আমি আমার নিজের মত করে, আপনার মনে, জীবনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছি। সেই যাওয়ার সঙ্গে আরো যারা রয়েছে, তাদের অনেককে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু আমি কি কেবল দুঃখই দিয়েছি? লিজার দোষের বোঝাটা দুঃখের বোঝাকেই বোঝাতে চেয়েছে। আমার দেওয়া দুঃখের বোঝা অন্যে বয়ে বেড়াচ্ছে। আমি কি কেবল সুখের বোঝার বাহক?

কিন্তু এই অল্প পরিচয়ের মধ্যে, লিজা আমার সম্পর্কে, এমন করে ভাবতে আরম্ভ করল কেমন করে? আজকের রাত্রি, আর কাল দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। তারপরে আমাদের এ যাত্রা শেষ। আমাদের দেখা শেষ, পরিচয়ও হয়তো শেষ হয়ে যাবে। কোন কারণেই, আমাদের কারোর সঙ্গে কারোর আর দেখা হবে না। তারপরে মন, তোমার বা লিজার বা লিজাদের, নদীর পাড়ে যেমন পলি পড়ে, তেমনি কাল তোমার পাড়েও পলি ফেলবে। মনের সেই পলির নীচে সবাই চাপা পড়ে থাকবে। কেউ কোনদিন ঘেঁটে দেখবে না।

হয়তো আমাদের মধ্যে একটু চেনাচিনি হয়েছে। যে-চেনাচিনিটা বাইরের না। এই চেনাচিনির মাঝখানে যে একটি স্নিগ্ধ বন্ধুত্ব প্রীতির জন্ম হয়েছে, সে তো বড়জোর এই রেলের কামরা থেকে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের দরজা পর্যন্ত যাবে। কিন্তু লিজার ভাবনার মধ্যে, তার সুদূরটাকে যেন এখন থেকেই, অনেক দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি, এ সবই দুঃখের কারসাজি। সে যখন খেলায়, তখন কিছুই বুঝতে দেয় না। তারপরে সে ধরে বাঁধে, কষে মারে। তার কৌশলটাই এরকম।

আমি কথা শেষ করবার জন্য লিজাকে বললাম, 'কথাটা মনে রাখব।'

লিজা সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'এটাও আবার একটা মিথ্যা কথা। মনে রাখবার লোকও আপনি নন। কিন্তু অনেক বলেছি, আজ আর বলব না। তবে, আপনাকে যে আমি চিনেছি, সেটা মিথ্যা না, আর কেন যে চিনলাম, সেটা ভেবে আমার বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠছে।'

বলে, আমার দিকে তাকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামাল। একটু রঙ লেগে গেল ওর মুখে। আমি ওর কথার কোন জবাব দিলাম না। লিজা আবার চোখ তুলল, আবার নামাল। আবার চোখ তুলে, কিছু যেন বলতে চাইল, পারল না। হেসে ফেলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী লিজা?'

লিজা ঘাড় নেড়ে বলল, 'মানুষ তার নিজেকে কিছুই চেনে না।'

সে কথা নিজের জীবনে বহুবার বুঝেছি। এই মুহূর্তে লিজাকে দেখেও বুঝতে পারছি। মানুষ তার নিজেকে সবটুকু চেনে না শুধু না, কথাটা জেনেও সে অচেনাতেই ভেসে যায়, হারায়।

গাড়ির গতি আবার কমে এল। বেলা ক্রমে বেড়ে উঠছে। এবার আমি কামরায় ফিরে যেতে চাই। গোমেজ ঠাকরুণ কী ভাবছেন কে জানে। মনে মনে রুষ্ট হচ্ছেন হয়তো। বললাম, 'আপনি পড়ুন, আমি এবার কামরায় ফিরে যাই।'

লিজা বলল, হ্যাঁ, এবার আমি পড়ব।'

তারপরেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠল, 'ও হো শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। কালকুট নামটা ভাল না, তবে যতটা পড়েছি, বেশ ভাল লাগছে।'

আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'শেষ অবধি দেখুন।'

লিজা বলল, 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি বলছিলেন, এটা এই লেখকের প্রথম বই। আমি অবিশ্যি খুব বেশি বাংলা বই পড়িনি। তবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ছাড়াও, আরো অনেকের বই পড়েছি। কিন্তু এই লেখকের এটা প্রথম লেখা বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'এই লেখকের আর কোন বই এখনো বেরিয়েছে বলে আমি জানি না।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। গাড়িটা থামছে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। লিজা আবার আমাকে ডাকল, 'শুনুন, বইটা আমি কাল সকালের মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ করে ফেলব। তারপরে আপনাকে একটা কথা বলব।'

আমি ঘাড় কাত করে, সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা চমক জেগে রইল। কী বলবে লিজা? এটা যেমন বোঝা গেল, মেয়ে হিসেবে একদিকে ও সহজ না, আবার সহজও, অল্প জলে ছলছলিয়ে পাকা সাঁতারুর মতই ও গভীর অতলান্ত জলেও চলে যেতে পারে, এবং জীবনে কোথাও একটা বড় রকমের মার খেয়েছে, তার ব্যথা যন্ত্রণাটা ওর ভেতরে অনেক দূরে শিকড় ছড়িয়ে আছে, তেমনি ওর ভিতরে একটা রহস্যের আমেজও আছে। জানি না, বই পড়ার পরে ও কী বলবে।

কোনরকমে ঢোকবার অপেক্ষা। গোমেজ ঠাকরুণ উঠলেন, 'এই যে, এসেছেন। সেটি কোথায়?'

আমি বললাম, 'লিজার কথা বলছেন?'

'আর কার কথা বলব?'

'উনি তো খাবার কামরাতেই বসে আছেন।'

'উনি কি সারাদিন শুধু খাবেনই?'

আমি একবার মেরী আর রোজার দিকে দেখে নিলাম। ওরা দুজনেই দুটো ম্যাগাজিন নিয়ে বসেছিল। এখন মুখ টিপে টিপে হাসল। আমি ঠাকরুণকে জবাব দিলাম, 'এখন তো খাচ্ছেন না, বসে বসে বই পড়ছেন।'

এতটুকুতে ঠাকরুণ ঠাণ্ডা হবার নন। বললেন, 'সেটাও তোমাকে বলতে হল, লিজা এখন খাচ্ছে না।'

রোজার গলায় হাসির শব্দ বাজল। ঠাকরুণ রোজাকেই সাক্ষী মানলেন, 'কী রকম ছেলে বল তো!'

মেরী সেই ফাঁকে, একটু সরে গিয়ে বলল, 'বসুন না।'

বসতে তো চাই, পারছি কোথায়। ঠাকরুণ যেরকম চটপটি বাজীর মত, ফাটছেন ছিটকে যাচ্ছেন, তাতে বসাই দায়। ঠাকরুণ আবার বললেন, 'তা উনি কি এখানে এসে পড়তে পারেন না?'

মা জিজ্ঞেস করছেন মেয়ের কথা। জবাব দিতে হবে আমাকে। ভাগ্যিস্ কাল রাত্রে এঁদের সঙ্গে আমার ঠাঁই হয়েছিল। কী জবাব দেব, ভাববার আগেই, রোজা বাঁচাল। ও বলল, 'তোমাকে বললাম না, লিজা বলেছে, ওখানে বসে কিছুক্ষণ পড়বে।'

ঠাকরুণ কবজি ঘুরিয়ে, ঘড়ি দেখে বললেন, 'কিছুক্ষণ কাকে বলে রোজা? লিজা গেছে ন'টা বাজবারও আগে। এখন এগারোটা বেজে গিয়েছে।'

মেরী একটু হেসে বলল, 'আসলে বোধহয় লিজা লাঞ্চের জন্য লাইন লাগিয়ে বসে আছে। একেবারে খেয়ে ফিরবে।'

রোজা হেসে উঠল। এবার ঠাকরুণের মুখেও একটু যেন হাসি দেখা গেল। বললেন, 'তা যা বলেছ। যা ভিড়! কিন্তু গায়ে পায়ে একটু জল দিতে হবে তো। যা গরম, ঘাম ধুলো ধোঁয়া। অল্প চান না করলে হবে কেমন করে।'

রোজা বলল, 'সেটা লিজাও জানে ও চলে আসবে সময় মত।'

স্নানের কথাটা বলে, ঠাকরুণ আমাকে বাঁচালেন। আমি আর দেরি করতে চাইলাম না। এখনো ঘর খালি পাওয়া যেতে পারে। এর পরে, সবাই একসঙ্গে ছুটবে। কে জানে, জলই হয়তো থাকবে না। আমি স্নানে যাবার আয়োজনে লেগে গেলাম।

ব্যাগ থেকে তোয়ালে সাবান বের করতে দেখে, মেরী জিজ্ঞেস করল, 'বসবেন না?'

বললাম, 'না, চানটা করে আসি।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ, এর পরে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যাবে।'

ঠাকরুণ অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে, আমার ওপর খুশি হলেন, তারিফ করলেন, 'খুব ভাল। আমি মনে করি আমাদেরও তা-ই করা উচিত। আর একটুও দেরি না। বিল্, তুমি আগে যাও। মাথা ধোবে, গোটা গা-টা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলবে।'

বিল্ও তখন কমিকস্ নিয়ে বসে গিয়েছে। ও শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি এখন যাব না, পরে যাব।

ঠাকরুণ ধমক দিলেন, 'যাও বলছি।'

বিল্ তাকাল ঠাকরুণের দিকে। ঠাকরুণ সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা আমার।'

বিল্ উঠে দাঁড়াল, নির্বিকার মুখে বলল, 'ওটা তো সত্যি না।'

ঠাকরুণ বললেন, 'খুবই সত্যি। আমার বিল্ সোনা মানিক।'

বিলের জবাব, 'কিন্তু কিছুটি না দিয়ে।'

ঠাকরুণ বললেন, 'বেশ, বলা রইল, বম্বেতে গিয়ে ডবল চকোলেট।'

মেরীকেও উঠতে হল বিলের স্নানের জন্য। ঠিক এ সময়েই শোনা গেল, 'এ দাদা, ভইয়া শুনিয়ে।'

কাকে? আমাকে ছাড়া, এখানে আর কাকে এরকম সম্বোধন করা যেতে পারে? আমি সামনে ফিরে তাকালাম। গণেশদাদা! সেইরকম খালি গা। কাপড় হাঁটুর কাছে তোলা। বুক আর ভুঁড়ির মাঝখানে, বেশ কিছু ঘাম জমে আছে। ঘামে তেলতেলে মুখখানিতে হাসি হাসি ভাব। পান চিবনো হয়েছে, গোঁফের নীচে লাল দাঁতও দেখা যাচ্ছে। হাতে একটি নিভে যাওয়া বিড়ি।

মেরী রোজা বিল্ যদিও বা অবাক, ঠাকরুণ শুধু অবাক নন। বিরক্তি আর সন্দেহ তাঁর চোখে। কী ভেবে নিয়েছেন, কে জানে। একবার আমার দিকে দেখছেন, আর একবার গণেশদাদার দিকে। যদিও লোকটার নাম সত্যি কী, কে জানে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হম্ কো?'

গণেশদাদার হাসিটা বিস্ফারিত হল। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'আপকো, বাঙালী দাদালোগ উধার বোলাতা।'

বলে, একদিকে আঙুল দেখাল। আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

ঠিক এ সময়েই, গণেশদাদা ধুতিটা অনেকখানি তুলে, বুক আর ভুঁড়ির মাঝখানের ঘাম মুছল। আমার চোখ ঠাকরুণের দিকে পড়ল। ঠাকরুণের গলা দিয়ে কেবল একটি অস্পষ্ট ক্রুদ্ধ হুংকারের মত বাজল, 'হুম্ম্ম্।'

গণেশদাদা সেদিকে লক্ষ্য না করে, তেমনি বিস্ফারিত হাসিতে ঘোষণা করল, 'তাস খেলনে কে লিয়ে। হমলোগ তিন আদমি হ্যায়, ঔর এক আদমি চাহিয়ে।'

কোথায় খাপ খুলেছ দাদা। আমি কোন কথা বলবার আগেই ঠাকরুণ হাত ঝাপটা দিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'নেই নেই, ও তাস নেই খেলে গা, যাও।'

একেবারে 'যাও।' গণেশদাদা যেন একটু কেমন হয়ে গেল। ঘাবড়ে গেল কী না, ঠিক বোঝা গেল না। তবে সে খুবই অবাক হয়েছে। ভাবতে পারেনি, আমার ব্যাপারে এ বুড়ি মেমসাহেব তাকে ওরকম ধাতিয়ে উঠবে। হাসিটা তার মুখে থেকে গেল। একেবার আমাকে আবার মেমসাহেবকে দেখল।

আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতের তোয়ালে আর সাবান দেখিয়ে, হিন্দীতেই বলবার চেষ্টা করলাম, 'এই দেখুন, আমি নাইতে যাচ্ছি এখন। তাছাড়া, তাসের সব খেলা আমি জানি না। দু-একটা যা-ও জানি, তাও ভাল করে না।'

গণেশদাদা একটু বোধহয় ধাতস্থ হল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'ও, আচ্ছা।'

ঠাকরুণ ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জানলেও কি তুমি এ লোকটার সঙ্গে খেলতে যেতে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না।'

গণেশদাদা তখন মেমসাহেবের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঠাকরুণ আবার আমাকেই ধমক দিলেন, 'লোকটাকে যেতে বল এখান থেকে।'

গণেশদাদা একবার সবাইকে দেখে চলে গেল। লোকটা পিছন ফিরেছে কী না সন্দেহ, রোজা একেবারে ফেটে পড়ল হাসিতে। তার সঙ্গে মেরীও। ঠাকরুণের চোখ তখনো পাকানো। বললেন, 'একটা কী রকম বিদ্‌ঘুটে লোক বল দিকিনি, লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু নেই?'

মেরী আর রোজার হাসিটা তখন আমার মধ্যেও কলকলিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু কলকলাতে সাহস পেলাম না। ঠাকরুণ হয়তো হুমকে উঠবেন। বরং স্নানের ঘরে গিয়ে একলা একলা প্রাণভরে হাসা যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এগিয়ে যেতে গেলাম।

ঠাকরুণ পিছন থেকে ডাকলেন, 'শোন, ওহে।'

'ছোকরা' শব্দটা আর আমি যোগ করছি না। ইংরাজিতে ওঁর ডাকের ভাষাটা হল, 'হেই, হিয়ার মী বয়।' আমি ফিরে তাকালাম।

ঠাকরুণ সাবধানী গলায় বললেন, 'দেখো, ওই বদখদ লোকটা ভাব করতে চাইলে, ভাব করো না যেন।'

এর কোন জবাব নেই। ভাব আর অ-ভাব, গণেশদাদার সঙ্গে আমার ব্যাপার কী। আমি রোজার দিকে একবার তাকিয়ে, এগিয়ে গেলাম। কয়েকটা খুপরি পেরিয়ে যাবার পরে, এক জায়গায় দেখলাম, কয়েকজন বসে আছেন, তার মধ্যে গণেশদাদা। নিজের থেকেই থেমে গেলাম আমি। গণেশদাদা ছাড়া, বাকীরা বাঙালী-দাদা। কিন্তু সংখ্যায় তো দেখছি, পাঁচ জন বসে আছেন। তবে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন।

গণেশদাদাই প্রথমে ডাক দিলেন, 'আইয়ে দাদা, আইয়ে।'

এক বাঙালীদাদা হতাশ হয়ে বললেন, 'ভাবলাম দাদাকে পাব, তাহলে একটু খেলা যেত।'

বললাম, আপনাদের লোকের অভাব তো দেখছি না।'

জবাব পাওয়া গেল, 'সে তো মশাই গাড়ি-ভরতি লোক। যারা খেলা জানে না, জানে না। আর জেনেও খেলতে না চাইলে, কী করা যাবে। আমাদের মধ্যে দু'জন খেলতে জানে না। দুবেজীকে নিয়ে তিন হয়েছিল।'

গণেশদাদার নাম তাহলে দুবেজী। আমি বললাম, 'আমাকে নিয়েও আপনাদের সুবিধে হত না। আমি যেটুকু খেলতে জানি, তাকে জানা বলে না। সেই খেলা আছে, ফিশ না কী, সেটা তো তিনজনেও খেলা যায়।'

দাদার মুখখানি এবার একটু শুকনো দেখাল। বললেন, 'ও খেলাটা আবার আমরা কেউ জানি না।'

মনে মনে বলি, তবে আর খেলা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। সময় কাটাবার অন্য রাস্তা বের করলেই হয়। আর এক বাঙালীদাদা বললেন, 'ঠিক আছে, গল্পগুজব করেই কাটানো যাক না।'

জবাবে আর একজন একটু বাঁকা সুরে বাজলেন, 'হ্যাঁ, আর তুমি গল্পগুজবের নামে কাঁড়ি কাঁড়ি গুল্‌ চালিয়ে যাও।'

যাকে বলা হল, তার রুষ্ট জিজ্ঞাসা, 'কেন, গুল্‌ দেব কেন?'

জবাব, 'সে তুমিই জান বাবা, কেন। কিন্তু তোমার গুলের জ্বালায় অস্থির হতে চাই না।'

এ অবস্থায় বাইরের লোকের হাসতে মানা। সরে যাবার আগে

শুনতে পাই, 'তুই নিজেও কি কম ঘাস নাকি। আজ সকালেই তো…'

যাক, সময়টা কাটুক দাদাদের। সময় কাটাবার এও তো একটা রকম। খানিকটা এগিয়েছি, পিছনে আবার ডাক, 'এ দাদা।'

আবার কে দাদা? পিছনে দেখি গণেশদাদা। কাছে এসে বলল, 'উ মেমসাব আপকো কেয়া লাগতা?'

অর্থাৎ কে হয়। বললাম, 'কুছ নহিঁ জী।'

গণেশদাদার অভিযোগ, 'তবু, আপকো বোলায়া তো উ হমকো কাঁহে ডাঁটতা রহা?'

অভিযোগ মিথ্যা না। আমি গণেশদাদাকে বললাম, 'আরে, উসব মেমসাবকো বাত ছোড়িয়ে না। উলোগকা দিমাক কা কুছ ঠিক হ্যায়।'

গণেশদাদা ভুঁড়ি চুলকে বলল, 'হমকো বহুত গুস্সা হোতা রহা।'

আমি মোলায়েম করে বললাম, 'হোনে কা বাত হ্যায়। ছোড় দিজীয়ে।'

বলে ফিরতে গেলাম। গণেশদাদা একটু ভ্রাতৃত্বের সুরে বললেন, 'আপকো যানা কহাঁ দাদা?'

'বোমবাই।'

'হমকো ভি।'

তা বুঝলাম, কিন্তু চোখের সামনে যে স্নানের ঘরে একজন ঢুকে গেল। আর একটা আগে থেকেই বন্ধ। ফিরে আবার উল্টো দিকের শেষে যাব নাকি। গণেশদাদা বাত দিয়েই যেতে লাগলেন, 'হমরা ভাইকা কেলকাত্তা মে ব্যবসা হ্যায়। হমকো মুদীখানা হ্যায় বোমবাই মে। আপ দাদার জানতা?'

শিবরাম চক্রবর্তী মশাইয়ের অনুপ্রাস ব্যবহার আমার মনে পড়ে গেল। দাদা দাদা করে, গণেশদাদা এখন আমাকে দাদারের কথা পুছ করছে। কী বিপদ বল দিকিনি। দাদার জানব কী করে। অচিন দেশের নামে চলেছি, চোখে দেখিনি। মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

গণেশদাদা বললেন, 'দাদার মে হামারা দুকান হ্যায়। বহুত বাঙালী হমারা দুকান সে মাল খরিদতা…।'

গণেশদাদা বলে যেতে লাগলেন। আমি চোখে মনে কামরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। সব আসরই বেশ জমজমাটি। দুটি তাসের আড্ডা ভালই জমতে দেখেছি। একটি কেবল পুরুষদের। আর একটি মহিলা-পুরুষ মিশিয়ে। গল্পের আসর, তর্কবিতর্কের আসর, সবই আছে। কে যেন আবার মাউথ অর্গানে আওয়াজ দিয়ে চলেছে।

একটি স্নানের ঘরের দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে গেলাম। গণেশদাদা তখনো বলে চলেছে, 'লেড়কাঠো দো মাহিনে বাদ মর গয়া।'

আমি স্নানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসকা লেড়কা?'

গণেশদাদা বিষণ্ণ হেসে বলল, 'হমারা। আপকো বাতায়া না?'

এই মুহূর্তে হঠাৎ গণেশদাদা লোকটিকে আমার অন্যরকম মনে হল। কেবল যে সময় কাটাবার জন্যই সে কথা বলে চলেছে, তা না। একটু মন হালকা করার ব্যাপারও ছিল। আমি হঠাৎ কিছু বলতে পারলাম না। গণেশদাদা বলল, 'যাইয়ে, নাহা লিজীয়ে।'

সে ফিরে গেল। আমি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম।

দুপুরের খাবার পরে, সকলেই প্রায় খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। একমাত্র লিজাকে দেখলাম, খাবার সময়টুকু ছাড়া, একবারের জন্যও হাত থেকে বইটা নামায়নি। চোখ থেকে সরায়নি।

দিনের বেলায় আমি আর তেতলায় উঠিনি। গোমেজ ঠাকরুণের পায়ের কাছে সামান্য একটু জায়গা ছিল। উনি শোবার আগেই বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করলে ওখানে বসতে পারি। ওদিকে মেরীর পায়ের কাছে লিজা। রোজা আর বিল্ দোতলায়। আমি মাঝে মাঝে উঠে, গাড়ির দরজায় দাঁড়াচ্ছিলাম। বাইরে প্রকৃতি বদলে গিয়েছে। গাড়ি এখন মধ্যপ্রদেশের ওপর দিয়ে চলেছে। মধ্যপ্রদেশ একটু

বেশি সবুজ যেন। অরণ্যে ঘন। তথাপি, বস্তিগুলো আর অধিবাসীদের যখন দেখতে পাই, তখন মিলের ভাগটাই বেশি।

কিন্তু যতক্ষণ বসে থেকেছি, বই পড়েছি, থেকে থেকেই লিজা চোখ তুলে তাকিয়েছে। যেন বই পড়তে পড়তে, কিছু বলে উঠতে চেষ্টা করেছে। বলেনি। স্বীকার করি, আমিও থেকে থেকে লিজাকে দেখছিলাম। আমার মনে বোধহয় একটা কৌতূহল ছিল, বইটা পড়তে পড়তে ওর মুখের চেহারায় কী ভাব খেলে। দেখেছি, কখনো ভুরু কুঁচকে রয়েছে। কখনো ঠোঁটের কোণে হাসি। কখনো গম্ভীর। একবার শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'উঠে উঠে কোথায় যাচ্ছেন ?'

বলেছি, 'কোথাও না, দরজায় দাঁড়িয়ে একটু বাইরের দিকে দেখছি।'

তারপরে ঘুম থেকে উঠেও, গোমেজ ঠাকরুণ যখন দেখলেন, লিজা এক ভাবেই বইটা পড়ে যাচ্ছে, তখন যেন আর সইতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'সেই কাল রাত্রি থেকে একটা বাংলা বইয়ে মুখ দিয়ে পড়ে আছিস, ব্যাপারটা কী ?'

লিজা অবাক হল না, রাগও করল না। জবাব দিল, 'ব্যাপার কিছু না, বইটা পড়ছি। তোমরা যদি বাংলা জানতে, তবে তোমাদেরও পড়তে বলতাম।'

গোমেজ ঠাকরুণ ঘাড়ে এক ঝাপটা দিয়ে ঠোঁট বাঁকালেন। বললেন, 'আমার দরকার নেই ?'

লিজা বলল, 'সে তো বাইবেল ছাড়া, তোমাদের কোন বইয়েরই দরকার নেই।'

ঠাকরুণ বিরক্ত মুখে একটা সিগারেট ধরালেন। লিজা পড়তে লাগল। আমি উঠে আবার দরজার দিকে এগোতে গেলাম। গাড়ির গতি কমছে। চা খেতে হবে। ঠাকরুণ আওয়াজ দিলেন, 'ওহে, কোথায় যাচ্ছ ?'

বললাম, 'কোথাও না।'

'গাড়িটা থামলে, চা-ওয়ালাকে ডাক তো। ডাইনিং কারে খেতে গেলে খরচ বেশি।'

হতে পারেন মেমসাহেব, কিন্তু কথা সাদা। গিন্নীবান্নি মানুষ খরচের কথা ভাবতে হয়। আর পরের ছেলেকে হুকুম করা ? ওটা

এখন অধিকারের কথা। পরের ছেলে আবার কী ? বলেই তো দিয়েছেন, আমি ওঁর ছেলের মতই। বললাম, 'আচ্ছা।'

গাড়ি থামতে, চা-ওয়ালাকে ডেকে, চা দিতে বললাম। মেম-সাহেবরা সবই বেশ সোনামুখ করেই, মাটির ভাঁড়ে চা খেল। পেটে চা গেল বলেই, ঠাকরুণের মাথাটাও একটু ঠাণ্ডা হল যেন। আমাকে বললেন, 'তোমার সিগারেট একটা দাও তো খাই।'

আমি তাড়াতাড়ি সিগারেট বার করে দিলাম। কী ভাগ্যি, আমারও সিগারেট খেতে ইচ্ছা হয়েছে। আমি মেরীকেও দিতে গেলাম। ও ধন্যবাদ জানিয়ে, খাবে না বলল। তারপরেই রোজার সঙ্গে আমার চোখাচোখি। ওর মুখে রঙ লেগে গেল। ঠোঁট টিপে হেসে, তাড়াতাড়ি ঠাকরুণের চোখ থেকে মুখ আড়াল করল। আমি সিগারেট ধরিয়ে, প্যাকেট আর দেশলাইটা বেঞ্চের ওপরেই রাখলাম। এই সময়ে লিজার সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হল। লিজা বেঞ্চের ওপর প্যাকেটের দিকে চেয়ে, রোজার দিকে দেখল। রোজাও তাকাল। দুই বোনেই ঠোঁট টিপে হাসল।

ঠাকরুণ তাঁর ডাইনে, জানালার দিকে তাকিয়ে ধূমপান উপভোগ করছেন। রোজা উঠল, এক পা এগিয়ে এল। মেরী সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট আর দেশলাই ওর হাতে গুঁজে দিল। রোজা নিরীহ মুখে, ঠাকরুণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এমন কি বিলুও দেখতে পেল না। ও তখন বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মেরী আর লিজার সঙ্গে দৃষ্টি আর হাসি বিনিময় হল।

ঠাকরুণ আমার দিকে ফিরলেন। তারপরে শুরু হল, বাড়ির খোঁজখবর নেওয়া। বোধহয়, এতক্ষণ পরে, ঠাকরুণের মেমসাহেবি রীতিতে মনে হয়েছে, এখন ঘরের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। আমারটা শোনবার পরে, তাঁর নিজের প্রসঙ্গ উঠল। স্বামীর সঙ্গে, চাকরির জন্য ভারতবর্ষের কত জায়গায় তিনি ঘুরেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা কে কোথায় হয়েছে। শ্রীযুক্ত গোমেজ লিজার বাবা, কোন এক সময়ে অত্যন্ত পানাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে জন্য তাকে কী রকম জ্বালাতন সহ্য করতে হয়েছে, সে-কথাও বললেন। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গের সময়ই, লিজা আর মেরী নিজেদের মধ্যে চোখা-চোখি করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু বচন যাঁর মুখে, তিনি নিরস্ত নন। তারপরে তিনি যখন ঘোষণা

করলেন, তাঁর বড় ছেলে হেনরি, মেরীর বর, তাঁর সতের বছর বয়সে, পুণাতে জন্মেছিল, তখন লিজা উঠে দাঁড়াল। বইটি নিয়ে সোজা চলে গেল অন্যদিকে। বোধহয় দরজার দিকে।

ঠাকরুণ গেয়েই চলেছেন। পুরনো দিনের কথা, আসল কথা। যা কোনদিন ফিরবে না, হারিয়ে গিয়েছে. অথচ নিজেরই ভিতরে তা থরে থরে সাজানো রয়েছে. সেই সব দিনের কথা বলতে ভাল লাগে। বলতে বলতে সেইদিনে যেন ফিরে যাওয়া যায়। ছুঁয়ে আসা যায়। যদিও সেইদিনে অবিমিশ্র সুখ আর আনন্দ ছিল না। কিন্তু পিছনের দিনগুলোতে, তিনি ছিলেন মোনালিসা। তখন রক্তে যৌবন, জীবনে তীব্র বেগ। অতীতের দুঃখকেও বর্তমান সুখের আলোয় দেখায়।

অনেক কথার শেষে বললেন, 'লিজার পরেও আমার একটি মেয়ে হয়েছিল। এগারো বছর বয়সে সে গোয়াতে মারা যায়। নাম ছিল এল্‌সা। আমার এই দুই মেয়ে থেকে, সে ছিল সব থেকে দেখতে ভাল। সেই জন্য বোধহয় রইল না।'

ঠাকরুণের হঠাৎ নিশ্বাস পড়ল। দুই কাঁধে আর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। কিন্তু আর কথা বললেন না। আর এখন তাঁর গল্প শোনাবার ইচ্ছা নেই, শোনবারও ইচ্ছা নেই ; মা এখন ফিরে গিয়েছে, তাঁর কোল-পোঁছা মেয়েটির কাছে। ঠাকরুণের চোখ দেখলে বোঝা যায়, তিনি গাড়িতে নেই। আমাদের কারোর কাছেই নেই। হয়তো, গোয়ার কোন ঘরে, কিংবা হাসপাতালের প্রসবের টেবিলে, দশ মাস গর্ভের, নাড়ি-ছেঁড়া টানের ব্যথাটা, এখন অন্য-ভাবে বুকের কাছে অনুভব করছেন। এল্‌সার এগারো বছরের দিনগুলো হয়তো চোখের সামনে ভাসছে।

মেরী রোজা আর বিল্‌ চুপ আছে। কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। সকলেই নিজের নিজের মনে। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। মাঠ পেরিয়ে, দূরের বনের মাথায় আকাশ লাল। দিন শেষ হয়ে আসছে। গণেশদাদার কথাও আমার এই সময়ে মনে পড়ে গেল। দুটি সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ দু-রকম ভাবে শুনলাম। এক জনক আর এক জননীর কাছ থেকে।

যাদের হারিয়েছে, তাদের যেখানে বাজে, যেমন করে বাজে, আমার হয়তো তেমন করে বাজে না। কে এক গোয়ানিজ খ্রীস্টান

প্রৌঢ়া। কে এক দুবেজী, বম্‌বে শহরের দাদারের মুদী। তথাপি, প্রাণের লীলাটা এমনিতরো, তাদের হারানোর শোকটা, অন্য প্রাণেও কেমন করে যেন চুঁইয়ে ঢোকে।

এ সময়ে লিজা এল। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে, সকলের দিকেই একবার তাকাল। ঠাকরুণ আর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মেরী তাস বের কর তো, একটু খেলা যাক। এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

মেরী তাস বের করল। ঠাকরুণ আমাকে ডাকলেন, 'এস, খেলবে এস।'

আমি বিপদগ্রস্ত হলাম। বললাম, 'আমি যে খেলতে জানি না।'

'যা জান, ওতেই হবে।'

আমি জানি, ওতে হবে না। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণ তো নন, একেবারে মোগল। অতএব বসতেই হবে। বকা ঝকা সমালোচনা বিরক্তি তো পরে। যখন আমার গুণ টের পাবেন। ওদিকে লিজাকে দেখ, নির্বিকার। যেন ঘোরে আছে।

রাত্রের খাবার কামরায় খেতে গিয়ে বোঝা গেল, যাত্রীর ভীড় কিছু কমে গিয়েছে। খাবার শেষে, আজ আর ভুল করলাম না। সবাইকে পোশাক ছেড়ে তৈরি হবার সময় দিলাম। একলা একলা খাবার কামরাতেই সময়টা কাটিয়ে ফিরলাম। কামরায় যখন ফিরলাম তখন শোবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে গোটা কামরাতেই। আজ দেখছি, লিজা সকলের আগে ওর তেতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমোতে না, বই পড়তে। আমি এসে ঢুকতে ঢুকতেই, ঠাকরুণ ঝেঁঝে বাজলেন, 'তুমি যত নষ্টের গোড়া।'

ঠাকরুণের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবি, গোস্তাকিটা কী? নিজেই তিনি জবাব দেন, 'কোত্থেকে একটা বাংলা বই নিয়ে এসেছ, সেটা ছাড়বার নাম নেই।'

রোজা বলল, 'এতক্ষণ লিজাকে বললে, আবার একে নিয়ে পড়লে। তোমাকে তো বলা হল, আর একটুখানি বাকী আছে, কাল সকালের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে।'

লিজা ওপর থেকে বলল, 'ঠিক আছে, বাংলা রেখে আমি ইংরেজী পড়ছি। তা হলে হবে তো?'

ঠাকরুণ হাঁকড়ে উঠলেন, 'কেন, এত বই পড়ার কী আছে? গল্প করা বা কথা বলা যায় না?'

লিজার গম্ভীর জবাব, 'না।'

ঠাকরুণ বিরক্ত মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এতে আর আমার মত বাতাবার কিছু নেই। তবে একটা ব্যাপার ভাবি একটু সেকেলে মানুষ হলেই কি বেশি বই পড়ার ওপরে বিরক্ত হয়? বিশেষ করে, মেয়েরা যদি পড়ে? এ যে দেখি, মেমসাহেব আর দিশী গিন্নীদের কোন তফাত নেই।

সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে, আমি তেতলায় চলে গেলাম। শুয়ে, চোখের সামনে বই খুলতেই, টের পেলাম, লিজা আমার দিকে দেখছে। আমিও ওর দিকে একবার তাকালাম, সেই সঙ্গে একটু হাসি। এই দেখাদেখি হাসাহাসিটার কোন অর্থ নেই। এটা একটা রীতির মধ্যে পড়ে।

গতকালের মতই নাসিকা-গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাতের গাড়ি চলেছে বেগে। ইংরেজি ডাইজেস্টে আমি, প্রায় একটি ভয়াল ভয়ংকর কাহিনী পড়ছি। কতক্ষণ পড়েছি, খেয়াল নেই। একসময়ে লিজার গলা শোনা গেল, 'না, আজ আর পারছি না, চোখ টনটন করছে।'

আমি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'আজ রাত্রের মত ছেড়ে দিন। প্রায় তো শেষ করে এনেছেন।'

বইয়ের শেষের কিছু পাতা দেখিয়ে বলল, 'কাল সকালে শেষ হয়ে যাবে না?'

বললাম, 'খুব।'

'আপনি এখনো পড়ছেন কী করে? আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

হেসে বললাম, 'আমি তো আপনার মত সারাদিন চোখকে এক জায়গায় বেঁধে রাখিনি, মুক্তও ছিল।'

ভাবলাম লিজা এবার শুভরাত্রি জানিয়ে, পাশ ফিরে শোবে।

সেরকম কোন লক্ষণ দেখলাম না। ও আমার দিকেই তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আলো নিভিয়ে দেব?'

ও বলল, 'না।'

আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরাতে গেলাম। লিজা বলল, 'কী পড়ছেন?'

বললাম, 'এক খুনী গায়কের গল্প।'

'খুনী গায়ক?'

'হ্যাঁ, খুনীর গলায় আছে সুরের মায়াজাল, সেই সঙ্গে কন্দর্পের মত চেহারা। সংসারে এই দুটি জিনিস দিয়ে, সে সবাইকেই ভোলাতে পারে।'

লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত যার রূপ গুণ, সে খুন করে কেন?'

'টাকার জন্য।'

'টাকার জন্য? তার গুণ দিয়ে কি সে টাকা আয় করতে পারত না? শুনেছি রূপ দেখিয়েও পুরুষেরা অনেক টাকা রোজগার করে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম?'

লিজা ভুরু কাঁপিয়ে বলল, 'কত ফুলকুমার রূপকুমার তো আছে রুপোলী পর্দায়। শুনেছি রূপকথার রাজকুমারদের মতই তাদের টাকা।'

'তাদের শুধু রূপ না, গুণও আছে।'

'এই খুনী গায়কেরও তা আছে।'

'কিন্তু সে ভাল খুনও করতে পারে।'

লিজা কোন কথা না বলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বলল, 'আসলে লোকটা খুনী। খুনের প্রয়োজনেই সে সব কিছুকে কাজে লাগায়। টাকার জন্যই সে খুন করে?'

বললাম, 'এখানে তো তাই দেখতে পাচ্ছি। চল্লিশ হাজার পাউন্ডের জন্য, ইতিমধ্যেই সে অন্ততঃ একটি মেয়েকে খুন করেছে, যে-মেয়েটি তাকে—'

'ভালবাসত?'

'হ্যাঁ, একেবারে নিরপরাধ, মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়েই মুগ্ধ

মেয়েটি সব কিছু তার হাতে তুলে দিয়েছে।'

'আর সে তাকে একটি গুলিতে—'

আমি একটু হেসে লিজাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'না।'

লিজা একটু আবেগ-উৎসুক সুরে বলল, 'আমাকে বলুন না, কেমন করে সে মেয়েটিকে মারল?' আমি একমুহূর্ত লিজার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বিছানার একেবারে ধারে, ও মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসেছে। মনে হয়, ও প্রায় পাশেই শুয়ে রয়েছে। আমি বললাম, 'সে তখন মেয়েটির বিছানাতে ছিল। মেয়েটি তখন গভীর আবেশে ডুবে আছে। কিন্তু লোকটির বিশ্বাস চল্লিশ হাজার পাউন্ড কোথায় আছে, মেয়েটি জানে। সেই অবস্থায় মেয়েটির কাছ থেকে সে জানতে চাইল, টাকাটা কোথায় আছে। মেয়েটি অবাক। সে সত্যি জানত না, টাকাটা কোথায় আছে। লোকটি ভাবল, মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে। তার বুকে সুতোর সঙ্গে ঝোলানো ছিল একটি বড় ক্রস্। সেটা সে কখনো গলা থেকে খুলত না। ক্রসের মধ্যে আসলে লুকানো থাকত একটা ধারালো গুপ্তি। সেটা সে টেনে বের করল। তার সুন্দর মুখটা অবিকৃত রেখেই, গুপ্তির ডগা মেয়েটির গলার কাছে রেখে সে শেষবার জানতে চাইল, টাকার কথাটা ও বলবে কী না। মেয়েটি তার একটু আগের আবেশ থেকে জেগে উঠতে চাইল। তখনো তার শরীরে, লোকটির প্রেমের উত্তাপ ছড়ানো। সে বলল, সে জানে না। গুপ্তিটা মেয়েটির গলায় বিঁধে গেল, সে তখন নগ্ন···।'

আমি অস্ফুট একটা আর্তধ্বনি যেন শুনতে পেলাম। লিজার গলাতেই শব্দটা বেজেছে। দেখলাম, নিজের হাতে ওর চুল মুঠি করে ধরা। ওর মুখটা একটু ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। গলার কাছে দু-একটা শিরা দেখা যাচ্ছে। ওর নিশ্বাস পড়ছে না। মুখটা যেন ভাবলেশহীন। দৃষ্টি গাড়ির ছাদে ঠেকে আছে।

আমি ওকে ডাকব কী না ভাবছি। চুলের মুঠিটা ওর আলগা হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই লিজা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কপালের কাছ থেকে চুল সরিয়ে দিল। ওর মুখে রঙ ফিরে এল। আর আমার যেন মনে হল, গল্পের নায়িকার মতই, লিজা নিহত। ওকে সেই রকম দেখাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ভয় পেয়েছিলেন?'

লিজার ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল। বলল, 'না। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা আমাকেই মারছে। আপনি বলতে পারেন ভাল।'

বলে, লিজা শব্দ করে হাসল। বলল, 'আসলে, এই খুন করা আর খুন হওয়া, একটা প্রতীকি ব্যাপার। মেয়েটা তো মরেইছিল। গুপ্তির ডগাতে শেষ না করে, হয়তো, সারা জীবন শিকারীটি খেলিয়ে খেলিয়ে মেয়েটিকে মারত।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য, অবাক হয়ে লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পঁচিশ বছরের লিজা। জেনেছি, জীবনে ওর কোথাও একটা বড় রকমের আঘাত আছে। কিন্তু এই খুনের ঘটনাকে যে ও প্রেমের প্রতীকে টেনে নিয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি। লিজা দেখছি, মেমসাহেবের বেশে বৈষ্ণবী। না কি, কৃষ্ণ অনুরাগে মরমী রাধা। লিজা কি মরেছে? না মরলে, মরণের কথা এমন করে কেউ বলতে পারে না। এই মরণের কথা, যে-সে জানে না। এই মরণের কথা, পৃথিবীর সব দেশ জানে না। মরণ আর শ্যাম যেখানে মেশামেশি। আমি লিজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর টানা কালো চোখ দুটি যেন চিকচিক করছে। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি। বলল, 'এই মরা আর মারা তো অহোরাত্রই চলেছে। এ মরার কথা আজ থাক।'

আমি বললাম, 'সেই ভাল।'

লিজা আমার মত করেই বলল, 'সেই ভাল। যেন তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ছাড়তে পারলেই বাঁচা যায়। ভয় নেই, আমি জিজ্ঞেস করব না, আপনি কী রকম খুনী।'

'খুনী?'

আমি লিজার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। লিজা মুখে হাত চাপা দিয়ে, হাসির শব্দ আটকাল। কিন্তু ডোরা-কাটা শোবার পোশাকে ওর সমস্ত শরীর তরঙ্গায়িত হল। একটু স্থির হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মোশাই, খুনী। তবে আমি তো আগেই বলেছি, আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, জানি না। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। সে জন্যই কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

লিজার খুনীর চেহারা যে কী, তা আমি জানি। জানি না শুধু, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। লিজার শরীর যেন আবার

একটু তরঙ্গায়িত হল। বলে উঠল, 'থাক, কিছু বলবেন না যেন। আমি জানি, কেউ কেউ আছে, জানে না, সে কী মারণাস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলছি। আপনাকে বলেছিলাম, এই বইয়ের লেখকের নামটা আমার ভাল লাগেনি! কিন্তু বইটা যত শেষ হয়ে আসছে, তত মনে হচ্ছে, কালকূট নামটা লেখক ঠিকই বেছে নিয়েছেন। তীব্র বিষ, খুব ঠিক কথা।'

আমি লিজার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই একটা রহস্যের আবেষ্টনী ওকে ঘিরে আছে। কোন কথাটাই যেন ও অমনি বলে না। তার মধ্যে সব সময়েই, অন্য একটা অর্থ আছে। চর্যাপদের সান্ধ্যভাষার মত। শোনায় একরকম। তার গভীরের অর্থ আর একরকম। আমি বললাম, 'লেখকের সঙ্গে কোনদিন দেখা হলে, আপনার কথা বলব।'

লিজার ঠোঁট দুটি যেন একটু কেঁপে উঠল। বলল, 'আর আমার সঙ্গে কোনদিন লেখকের দেখা হলে জিজ্ঞেস করব, চরিত্রগুলো সবই তার চেনা নাকি?'

আমি বললাম, 'একজন লেখক যখন ছদ্মনামের আশ্রয় নেয়, তখন সে কোন কথা কাউকে জানাতে চায় না বলেই বোধহয় নেয়। শখ করে কেউ ছদ্মনাম নেয় কী না জানি না।'

লিজা বলল, 'তা ঠিক, তবে আমি আমার সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে জানতে চাইব। তার তো একটা বিচার আছে। লেখক আমাকে বলবেন।'

আমি লিজার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে, আমার বইয়ের দিকে তাকালাম। লিজার গলা শুনতে পেলাম, 'অনেক রাত হয়েছে।'

আমি আবার ওর দিকে তাকালাম। ও বলল, 'আজ থাক না, এবার ঘুমোন। আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি।

লিজার চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, ওর ইচ্ছা না, আমি আর জেগে থাকি। ও চুপ করে ঘুমোবে, আমি জেগে থাকব, সেটাই যেন আপত্তি। বললাম, 'আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি।'

'না, আমি নেভাব।'

বলে, ও সুইচে হাত দিল। আমি বই পাশে রেখে ওর দিকে তাকালাম। লিজা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে আমি ওর

নীচু স্বর শুনতে পেলাম, 'শুভরাত্রি।'

আমিও বললাম, 'শুভরাত্রি।'

অন্ধকারে আমি চোখ চেয়ে রইলাম। রাত্রি বোধহয় অনেক। গাড়ির মধ্যে প্রায় কোন শব্দই নেই। এমন কি নাসিকাধ্বনিরও না। সম্ভবতঃ প্যাসেজে টিম্ টিম্ করে একটা আলো জ্বলছে। আর নিয়তির অমোঘ কশাঘাতে যেন এ গাড়ি ছুটে চলেছে দুবার।

মনে হল লিজার একটা নিশ্বাস পড়ল, পাশ ফিরে শুলো। আর লিজার মুখটা মনে করেই আমার মনে হল, বিচিত্র তার আপন হাতে ছড়িয়ে রেখেছে কত রঙের ছবি। সে যেমন প্রকৃতির গায়ে আপন তুলি টেনে চলেছে নিরন্তর, মানুষকেও সেখান থেকে বাদ দেয়নি। এই লিজা বিচিত্রের আপন হাতে রাঙানো মানবী।

বিচিত্রকে আমি চিনি না, কিন্তু তাকে নমস্কার। গড় করি হে তোমাকে, কাজের মানুষকে। তোমার দান কতখানি, কে জানে। অকাজের চোখ আর মনকে বাঁচিয়ে রেখেছ তুমি।

সকালবেলাটা বাঁধা-ছাঁদার পালা বটে। তবে তাড়াহুড়ো নেই। সকলেই দু রাত্রি যাত্রার পরে, আলিস্যির সঙ্গে গোছগাছ করছে। কামরার ভিড় কমে গিয়েছে। উপবাস-ভঙ্গের ভিড়ও অনেক কম। আজ আর সারি দেবার দরকার হয় নি। এ যাত্রায়, খাবার কামরার দায়িত্ব এখানেই শেষ। দুপুরে আর খাবার দেওয়া হবে না। তার আগেই গাড়ি গন্তব্যে পেঁছবে।

আমার বাঁধা-ছাঁদার তেমন দরকার নেই। ব্যাগটা গুছিয়ে নেওয়া নিয়ে ব্যাপার। চামড়ার সুটকেসটা তো আছে খাঁচাতেই। কিন্তু উপবাস-ভঙ্গের আসরে বসে, গোমেজ ঠাকরুণ অন্য সুরে বাজতে আরম্ভ করলেন। আজ তিনি টেবিল ছেড়ে ওঠবার নাম করেন না। মেরী রোজা বিল্ আগেই খেয়ে চলে গিয়েছে। লিজা আমাদের পাশের টেবিলে বসে আছে। চুপচাপ বসে, বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপরে বইটা মোড়া। দেখলেই

মনে হয়, পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে। ওটার দিকে এখন ওর মন নেই।

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'কী হে, আমাদের দেখাশোনাটা কি এখানেই শেষ হবে নাকি ?'

আমি বলি, 'তা কেন ?'

'যোগাযোগ রাখবে তো ? তোমাকে বাপু, সত্যিই বলছি, আমার একটু ভালই লেগে গেছে।'

আমি বললাম, 'যোগাযোগ রাখব না কেন ?'

পাশের টেবিল থেকে লিজা ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। ঠোঁট টিপে হেসে, আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'কলকাতায় হেনরির সঙ্গে তো যে-কোন সময়েই যোগাযোগ করতে পার। মেরীর সঙ্গেও তোমার আলাপ হয়ে গেল। মেরী আমার খুব ভাল পুত্রবধূ।'

আমি বললাম, 'আপনার ছেলের ঠিকানাটা আমাকে দেবেন।'

ঠাকরুণ বললেন, 'চল, কামরায় গিয়ে দেব। বম্‌বেতে কতদিন থাকবে ?'

'ঠিক কিছু বলতে পারছি না। দিন পনের ধরতে পারেন।'

'খুব ভাল। তাহলে তুমি একদিন আমার ছোটছেলে, জোশেফের বাড়িতে এসো না। ও কোলাবায় থাকে। আসবে একদিন সময় করে ?'

এমন করে বললে, না বলা যায় না। বললাম, 'যাব একদিন।'

লিজা আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। এবার ওর ঠোঁটের কোণে হাসি নেই, একটু যেন গম্ভীর। আমার দিকে দেখে, আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। গোমেজ ঠাকরুণ বললেন, 'সব থেকে ভাল হবে, ছুটির দিন এলে। জোশেফ বাড়িতে থাকবে। ও খুব ভাল গীটার বাজাতে পারে, তোমাকে শোনাবে।'

বলে তিনি লিজার দিকে ফিরে বললেন, 'লিজা, খাবার বিলের পিছনে, জোশেফের ফ্ল্যাটের ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা লিখে দে তো একে।'

লিজা ফিরে তাকাল। ওর ঠোঁটে হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। চোখেও একটু ঝিলিক। বলল, 'আপনি জোশেফের ফ্ল্যাটে আসছেন বুঝি ? খুবই খুশি হলাম শুনে।'

ওর ভঙ্গিতে অবিশ্বাস আর বিদ্রূপটা স্পষ্ট। এতটা অবিশ্বাসের কারণ কী, জানি না। যেতেও তো পারি। তবে, মনের কোণে জিজ্ঞাসাটা আছে। পথের দেখাকে আর দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে কী হবে। এই তো বেশ। কোথা থেকে কেমন করে, দুটো রাত্রি একত্রে কেটে গেল। কিছু জানাজানি হল। এবার চল, যে যার আপন খেলায় ভাসি।

লিজা বেয়ারার কাছ থেকে পেন্সিল নিয়ে, বিলের পিছনে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল। তারপর ওর মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'মা, উনি বম্‌বেতে কোথায় থাকবেন, সেটাও জেনে নিলে হত না ?'

ঠাকরুণ বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাও জেনে নিলে হয়।'

আমি লিজার দিকে তাকালাম। লিজার ঠোঁটে তেমনি হাসি। জোশেফের ঠিকানা লেখা কাগজটা অর্ধেক ছিঁড়ে, পেন্সিল সহ, আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, 'ফোন নম্বর থাকলে, সেটা সুদ্ধুই দেবেন !'

বললাম, 'ফোন আছে কী না জানি না।'

'আচ্ছা, তাহলে নাম-ঠিকানাটাই লিখে দিন।'

নাম-ঠিকানাটা লিখে দিতেই, লিজা যেন চমকে উঠল। বলল, 'কী আশ্চর্য, ইনি তো বম্‌বের বিখ্যাত লোক ! ইনি আপনার কে হন ?'

'বন্ধু।'

আমার দিকে চেয়ে থাকা লিজার চোখের পাতা একটু যেন কুঁকড়ে এল। তারপরে নিজের মনেই দুবার ঘাড় নাড়ল। এ সময়ে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। গোমেজ ঠাকরুণ উঠলেন। বললেন, 'আমি এ স্টপেজেই নেমে যাই। আর তো বেশি দেরি নেই। জিনিসপত্র দেখে শুনে নিই গিয়ে।'

বলতে বলতে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি একবার লিজার দিকে তাকালাম। ও তখন আমার বন্ধুর ঠিকানাটাই দেখছে। দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি ওর ওঠবার ইচ্ছা নেই, আরো কিছুক্ষণ থাকবে। গাড়ি থামছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লিজাকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।' তার আগেই লিজা ডেকে উঠল, 'শুনুন কালকুট।'

আমি প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লিজার দিকে ফিরে তাকালাম। লিজার চোখ আমার চোখের ওপরে। এক মুহূর্ত, আমরা দুজনে কোন কথা বললাম না। লিজার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু তা বিদ্রূপে বাঁকা না। চোখের ইশারায়, ওর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল, 'একটু বসুন না।'

একটা চমক আমার বুকে, প্রায় স্থির বিদ্যুতের মত দেগে রইল। জানি না, মুখে সেটা কতখানি ছায়া ফেলল। কিন্তু লিজার কথাটা কী ভাবে নেব, বুঝতে পারছি না। সব জেনে-শুনে, এ কি কেবলই একটা রহস্যের খেলা ?

যা-ই হোক, আমি অন্ততঃ সেই খেলাটা ওর সঙ্গে আর খেলব না। লিজা সম্পর্কে, এটুকু আমি বুঝেছি, ওর কাছে গোপনীয়তাটাই এখন আমার অস্বস্তির কারণ। মেলে দেওয়াটাই স্বস্তি। আমি ওর পাশে বসলাম। তথাপি, আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগে রইল। পাশে বসে, আমি ওর দিকে তাকালাম।

লিজার টানা চোখের কালো তারা দুটি যেন বড় বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর সমস্ত মুখটা যেন ঝকঝক করছে। টেবিলের ওপরে আমি হাত রেখেছিলাম। ও হঠাৎ আমার হাতের ওপর ওর একটি হাত রাখল। ওর চোখেও এখন একটা তীব্র উৎসুক জিজ্ঞাসা। আমি একটু হেসে, সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'জানতেন যখন, বলেন নি কেন ?'

লিজার গলার স্বর প্রায় চুপি চুপি শোনাল। ওর মনে এখন একটা উত্তেজনাও আছে। বলল, 'আগে থেকে কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমার মন বলে দিল, এই সেই।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন বলে দিল ?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার মন বলে দিয়েছে। আমার মন এরকম এক এক সময় বলে দেয়। এক এক জনকে কেমন করে যেন চিনিয়ে দেয়।'

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। লিজা আমার চোখ থেকে, চোখ নামাল। আমার হাতের ওপর, ওর রাঙানো নখ জোড়া হাতটার দিকে তাকাল। আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিল। কিন্তু মুখ নামিয়ে, আস্তে আস্তে বলল, 'জীবনে আপনাকে আমি কোনদিন চোখে দেখি নি। কিন্তু কেমন একরকম করে যেন আপনাকে চিনলাম। আমি বুঝি, আপনি নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ। আপনি সবাইকে চিনবেন, আপনাকে কেউ চিনবে না। চেনা ধরার বাইরে থাকতে চান।'

আমি ওর নত মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। ও মুখ তুলে, আমার দিকে তাকাল। বলল, 'তার জন্য আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু আমার কথাটা তো আমাকে জানতে হবে। লেখকের নাম জানাটা বড় কথা না। বইটা পড়তে আরম্ভ করে, যেন আমার বারে বারেই মনে হয়েছিল, এই তো সেই মানুষ, তীব্র বিষ, আমারই সামনে বসে। তার জন্যে আপনাকে অনেক কথা বলেছিলাম, কত কী। কিন্তু যখন বন্ধুত্ব চাইলাম, আর এই চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পেলাম, আমি যেন সবটুকু ধরা পড়ে গেছি, তখন আমারও সবটুকু চেনা হয়ে গেল। আমি মানুষটাকে চিনতে পারলাম।'

আমি জানি, লিজা মিথ্যা কথা বলেনি। গতকাল, এখানে সেই সময়ে ওর চোখে জল এসে পড়েছিল। এখন এই মুহূর্তেও, লিজার সেই মূর্তিটাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। চোখের কালো তারার ওপারে যে লিজা আছে। সুখ মানুষকে ছলনা করে। দুঃখ তাকে চিনতে শেখায়। দুঃখের ধনটা লিজার আছে, তা জানি। বেশে বাসে, যে আমার অচেনা ছিল সে আমারও চেনা। লিজা যে আমাকে এমন করে চিনেছে, তার জন্য ওর কাছেও আমি শুধু কৃতজ্ঞ না। শপথ করতে ইচ্ছা করে, পথের দেখা এমন বন্ধুকে, জীবনে কখনো ভুলব না।

কিন্তু হায় মন, নিরন্তরের অকৃতজ্ঞ, এ শপথের কোন মূল্য নেই। পথের দিশাটা এমনই, বাঁকে বাঁকে সে নানা রূপে সেজে বসে আছে। এই মুহূর্তের পথ চলাতে, যাকে চির পটে আঁকা বলে মনে হচ্ছে, বাঁকে ফিরে সে হারিয়ে যায়। তখন চির পটের ছলনায় আর কিছু আঁকা। গতকাল রাত্রে না সেই জন্যই বিচিত্রকে গড় করেছিলাম।

লিজা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন না ?'

আমি হেসে বললাম, 'কী বলব বলুন। এমন মেমসাহেব জীবনে দেখিনি।'

লিজা হাসতে গিয়েই যেন, একটা আর্তনাদ করে উঠল, 'উহ্!

কত ছলনা জানেন।'

বললাম, 'ছলনা না। পথের দেখায়, এমন একজনের সঙ্গে চেনা হবে, ভাবিনি।'

'চেনা হয়েছে সত্যি?'

'সত্যি। সে আমাকে যত চিনেছে, হয়তো ততটা চিনি নি। কিন্তু বন্ধুকে চিনতে পেরেছি।'

লিজা বলল, 'তবু তো একবার হাত ধরে সেকথা বললেন না?'

'তার হাত ধরার থেকেও বেশি করে ধরেছি।'

লিজা হঠাৎ আমার হাতের কামিজ চেপে ধরল। কথা বলতে যেন ওর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, এমনি ভাবে বলল, 'ওহ্, গতকাল একটা গালাগাল বুঝি দিইনি? আপনি মিথ্যুক, একটা প্রকাণ্ড বড় মিথ্যুক। এটাও আপনাকে আমার একটা চেনা। তবু সত্যি বলছি, শুনতে বড় ভাল লাগছে।'

আমি বললাম, 'আপনি যে এমন করে বলতে পারেন, তার কারণ, কষ্টই আপনাকে সহজ করেছে।'

লিজা বলল, 'শুনতে চাই না।'

'বেশ তাহলে বলি, জীবনের জানাটা এমন হয়েছে, এখন আর অকপট হতে আপনার আটকায় না। 'শুনুন লিজা—'

'শুনব না। আমাকে কি এখন 'তুমি' বলা যায় না?'

'এখন না হলেও পরে বলা যাবে, সময় তার নিজের দান নিজে নেয়, নিজেই দেয়। কারোর ওপর কিছুই সে ছেড়ে দেয় না।'

লিজা আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বলল, 'বেশ। কী বলছিলেন, বলুন।'

বললাম, 'বলছিলাম, আপনার এই চেনাটাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

লিজা তখনো আমার কামিজ চেপে ধরে রেখেছিল। সেখানে আর একবার টান পড়ল। বলল, 'আবার, আবার আমি কি এসব কথা শুনতে চেয়েছি নাকি? কথার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। একটা কথা চাই।'

'কী কথা?'

'তার আগে, কয়েকটা কথা বলে নিই। জানি, যে আমার কাছে বসে, তাকে কিছু বোঝাবার নেই। তবু সে ভাবে, সংসারের কিছু

নিয়মের ব্যাপারে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি।'

বলে, ও এক মুহূর্ত থেমে, আমাকে দেখে নিল। তারপরে বলল, 'জীবনে অনেকের সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা হয়। সেটা এমন কিছু না। কলকাতার গঙ্গায়, মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে, নৌকায় বেড়াতে গিয়েছি। এক একটা জায়গায় জলের টানা স্রোতের মধ্যে হঠাৎ থমকানো দেখেছি। সেখানে জলটা যেন একটা বড় থালার মত স্থির। তার পাশ ঘেঁষেই আবার পাক খেয়ে, স্রোত চলে যাচ্ছে। মাঝি বলেছে, একে বলে ঘূর্ণী। মানুষ বা ছোটখাটো কিছু হলে, এখানে আটকা পড়ে যাবে।'

কথাগুলো একটানা বলতে যেন ও একটু হাঁপিয়ে পড়ল। থামল, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে, কামিজটা ও চেপে চেপে কোঁচকানোটা সোজা করে দিতে লাগল। তারপরে বলল, 'জীবনে, অনেকের সঙ্গে টানা স্রোতে যেতে যেতে, কখনো কখনো ঘূর্ণীতে পড়তে হয়। তখন আর নিজের ইচ্ছায় চলে যাওয়া যায় না। আমি জানি না, আপনি ঈশ্বর নিয়তি ভাগ্য, কিছু মানেন কী না। আমি মানি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার ভাগ্য, আমার নিয়তি।'

এই মুহূর্তে, আমি একটু অস্থির বোধ করলাম। আমার পথ চলার বেগে যেন, কোথায় একটা হঠাৎ ছায়ার বিস্তার। পথের রেখায় অস্পষ্টতা। আমার পাথার ঝাপটায় ভার। আমার আনন্দ বিড়ম্বিত। বললাম, 'কিন্তু আমি তো এমন করে ভাবিনি।'

লিজা বলল, 'আপনি কেন ভাববেন। আপনি তো কারোর জন্য ভেবে, চিরদিন পাকে পাকে ঘুরে চলছেন না। তাই একটা কথা চেয়েছি। নিয়তিকে মেনেছি, আমার মাকে মিথ্যা বলেন নি তো? যোগাযোগ থাকবে তো?'

কী বলব লিজাকে। আমি জানি, ওর মা নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে আমাকে কিছু বলেন নি। তার মধ্যে আন্তরিকতাও ছিল। কিন্তু গোমেজ ঠাকরুণের আর লিজার কথার মূল আলাদা। চরিত্র আলাদা। যোগাযোগের কথা বলছে, সেটাকে বজায় রেখে, জীবনে যে আনন্দটাকে বজায় রাখা যাবে, তা আমার মনে হয় না। কিন্তু সে কথাটা এখন ওকে বোঝানো দায়। কারণ, সব কিছুর দায় যে লিজা ওর নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছে।

লিজা বলল, 'ভয় নেই, দুঃখ বা অস্বস্তির কিছু ঘটবে না

তাতে।'

বললাম, 'ভয় আমি পাই না।'

'তাও আমি জানি। কারণ সে এত চতুর নিষ্ঠুর, কোন কিছুকেই তার ভয় নেই।'

বলতে বলতেই, লিজার একটা নিশ্বাস পড়ল। আমি বললাম, 'যতখানি সম্ভব, যোগাযোগ আমি রাখব।'

লিজা চুপ করে চেয়ে রইল, খানিকক্ষণ কোন কথা বলল না। বোধহয়, ও বুঝতে চাইল, আমার কথার মধ্যে, ফাঁকির আওয়াজ কতখানি। তারপরে চোখ নামিয়ে নিল। ওকে যেন কেমন সহায়হীন একলা একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে বলে মনে হল। আমি ডাকলাম, 'লিজা।'

লিজা না তাকিয়েই বলল, 'বলুন।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে তো বলেছি, ভাগ্য আর নিয়তিকে আমি মেনে নিয়েছি। আমি তো কোন কষ্ট দেবার কথা ভাবি না। কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।'

বললাম, 'আমি শুনব।'

লিজা চেয়ে রইল, কিন্তু ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। ক্রমেই প্রকৃতির চেহারা আবার বদলে যাচ্ছে। মানুষের চেহারাও। গ্রামীণ মানুষ ক্রমেই শহুরে হয়ে দেখা দিচ্ছে। বস্তিগুলোর বদলে পাকা বাড়ি, কল-কারখানার চিমনি। যাত্রা শেষ হয়ে এল প্রায়। তারপরে আর এক নতুন যাত্রা।

'কী মোশাই?'

লিজা হাসির ঝলকে বাজল। দেখলাম, ওর চোখেও হাসির ঝিলিক।

ও বলল, 'ভাবছেন, কী পাগলের পাল্লায় পড়লাম।'

হেসে বললাম, 'পাগল তো বটেই।'

'ইস্।'

'একে মেমসাহেব, তায় বাংলা বলে…'

'ডাঁটা-চচ্চড়ি আর টক খেতে ভালবাসে।'

'এর থেকে আর বড় পাগল আছে নাকি!'

লিজা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল,

'হে ঈশ্বর, একটা কথা যে জিজ্ঞেস করা হয়নি। মেয়ে হয়ে, কথাটা ভুলে ছিলাম কেমন করে?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি কথা?'

লিজা হঠাৎ আমার আর একটু কাছে এসে, প্রায় যেন চুপিচুপি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মেমসাহেবকে কেমন লাগল?'

সাতকাণ্ড রামায়ণের পরে, সীতা কার বাপ! এ যে সেই গোত্র হল। লিজাকে কি কিছু বলার আর বাকী আছে? তবু, ও বলেছে, মেয়ে হয়ে এ কথাটা না জেনে পারবে না।

লিজা ভুরু কাঁপিয়ে বলল, 'কী?'

একবার ভাবলাম, বলি, 'দুঃখিনী মেমসাহেবটিকে ভালই লাগল।' কিন্তু সে কথাটা বলতে ইচ্ছা করল না। কেবল বললাম, 'সুন্দর।'

লিজার রুদ্ধ হাসিটা খিলখিলিয়ে বেজে উঠল! আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ওর কালো তারার চোখে, তখন ঢল নেমে এসেছে।

পাবলিক স্থাপিত-১৮৯৭

রেলের যাত্রা শেষ। গন্তব্য আরব সাগরের কূল। এবার ছুটোছুটি, নামানামি। ঠাকরুণ আগে নেমে, কুলিকে ডাকাডাকি। তারপরে রোজাকে আর মেরীকে ভিতরে রেখে, নিজে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন কুলিকে যাতে সামলাতে পারেন। কুলি এসে ওর সামনে মাল নামাতে লাগল। আমার মালপত্র বেশি নেই। একটি ব্যাগ, একটি সুটকেস। লিজা আর বিল্ ঠাকরুণের কাছেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি সেটা দেখছিলাম না। আমি দেখছিলাম, গণেশদাদা, কলাবউ ঠাকরুণের হাতটি ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল গোমেজ ঠাকরুণের সামনে। গোমেজ ঠাকরুণ চোখ পাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু যার দিকে দেখলেন, তার ঘোমটার মধ্যেই সব। গণেশদাদা কুলি দিয়ে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত। এবং প্রথম কিস্তি মালপত্র এনেই, ফেলল একেবারে ঠাকরুণের পায়ের কাছে।

ঠাকরুণ যা বললেন, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'এ বদ লোকটা

আমার পেছনে লেগেছে, না কী ?'

লিজা আমি চোখাচোখি করে হাসলাম। আমার এবার যাওয়া দরকার। কিন্তু ঠাকরুণের কাছ থেকে এ অবস্থায় বিদায় নেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, রোজা আর মেরী এখনো গাড়ির মধ্যে। ওদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, আর একটা বড় সাধ। রোজাকে একটা সিগারেট খাইয়ে যাই। আজ সকাল থেকে সে সুযোগ পাওয়া যায় নি। আর যাবে কী ?

আমি লিজার কাছেই দাঁড়িয়ে। আমার সুটকেস ব্যাগও আমার কাছেই। লিজা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছেন ?'

বললাম, 'রোজাকে বোধহয় আর সিগারেট খাওয়াবার সুযোগ পেলাম না।'

লিজা বলল, 'কোলাবায় তো আসবেন একদিন, সেদিন খাওয়াবেন।'

যে যার নিজের তালে বাজে। লিজা আবার বলল, 'রোজাকে এ কথা বলব, ও খুব খুশি হবে।'

দূর থেকে দেখলাম, রোজা আর মেরী নেমে আসছে। ঠিক এ সময়েই আমার কাঁধের ওপর হাত পড়ল। ফিরে তাকিয়ে, অবাক হয়ে দেখলাম বম্বে-প্রবাসী বন্ধু। বিখ্যাত সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি সুরঞ্জন। ভারতবর্ষে একডাকে তাকে সবাই চেনে। ভাগ্যে না থাকলে, এমন বন্ধু সকলের হয় না। লিজা তখন কাগজে লেখা নামটা পড়ে তা-ই অমন করে বলে উঠেছিল। বললাম, 'তুমি নিজেই চলে এসেছ ?'

সুরঞ্জন গম্ভীর গলায় খুশির আমেজ মিশিয়ে বলল, 'তা না এসে কী করব। বম্বে শহর বলে কথা, তুমি যা হাঁদা, কোথায় যেতে কোথায় যাবে, কে জানে।'

লিজা ফিক করে বেজে উঠেই, থেমে গেল। কিন্তু শরীরের তরঙ্গকে সহসা থামাতে পারল না। আমি আপত্তির সুরে বললাম, 'হাঁদা মানে, কলকাতা ঘাঁটা লোক আমি।'

সুরঞ্জনের পরিষ্কার জবাব, 'তোমার ঘাঁটাঘাঁটি রাখো। আসলে তো মফস্বলের লোক, দুদিন কলকাতা দেখছ।'

'আর তুমি ? তুমি তো সেদিনও এঁদো পাড়াগাঁয়ে ছিলে।'

সুরঞ্জন ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, 'ছিলাম, কিন্তু তুমি লোককে

গিয়ে বল, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

বলে, ও বুকটান করে দাঁড়াল। লিজা আবার আওয়াজ দিল। সুরঞ্জন একবার লিজার দিকে দেখল। তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল, 'চল এবার, তোমার জিনিসপত্র সব কোথায় ?'

'এখানেই আছে, কুলিও ধরা আছে।'

বলেই আমি গোমেজ ঠাকরুণকে দেখিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' বলে, সকলের নামে নামে পরিচয় করিয়ে দিলাম। 'কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে এলাম, খুব আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। সকলেই খুব ভাল। আর এ আমার বন্ধু সুরঞ্জন।'

সুরঞ্জন সকলের দিকেই তাকিয়ে, ঘাড় নাড়ল। কিন্তু কেমন যেন শুকনো নির্বিকার ভাব। তারপর আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সকলেই একদিন কোলাবায় যাবার জন্য বারে বারে বলল, লিজা ছাড়া। কুলির হাতে মাল দিয়ে, আমি বন্ধুর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। লিজা একবারও আমার দিক থেকে চোখ ফেরাল না। রোজা আর মেরী একবার লিজা, আর একবার আমার দিকে দেখতে লাগল। গোমেজ ঠাকরুণ তখন কুলির মাথায় মাল চাপাতে ব্যস্ত।

সুরঞ্জন আমার কাঁধে হাত দিয়ে, সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। বলল, 'আলাপটা একটু বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেশ ঘরোয়া ভাবেই।'

সুরঞ্জন বলল, 'সে তো দেখতেই পেলাম। দেখো, একেবারে ঘর পেতে বসো না যেন।' আমি ঠাট্টার সুরে হাসলাম। সুরঞ্জন বলল, 'তবে এরা ঘর বাঁধবারও লোক না। এদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী রকম ?'

সুরঞ্জন বলল, 'শুনি তো এরা একটু দোহনের তালে থাকে। ফ্যামিলি লাইফ টাইফ বলে কিছু নেই তো। তোমাকে কোনরকম দোহন করে নি তো ?'

বললাম, 'সেই জন্যই তোমার কথাটা একেবারেই মেনে নিতে পারলাম না।'

সুরঞ্জন বলল, 'মানামানির কিছু নেই। একটু আধটু যা

দেখেছি আর শুনেছি, তাতেই বললাম। কোলাবা টোলাবা যেন সত্যি যেও না।'

মনে হল, এ সময়ে, এসব তর্ক নিরর্থক। বললাম, 'যাকগে ওসব কথা। এতদিন বাদে দেখা হল, কেমন আছ বল ?'

সুরঞ্জন বলল, 'চলছে। এক কথায় ভাল বলতে পার।'

বলতে বলতে, আমরা ইন্স্টিশনের বাইরে চলে এলাম। যেখানে গাড়িগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সুরঞ্জন একটা বড় গাড়ির সামনে দাঁড়াল। পিছনের ক্যারিয়ার চাবি দিয়ে খুলে দিল। কুলি তাতে মাল ওঠাল। আমি তাকে পয়সা দিলাম। সুরঞ্জন ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে, কাঁচ নামাতে আরম্ভ করেছে। আমাকে ডেকে বলল, 'এদিকে এস।'

আমি গিয়ে দরজা খুলে ওর পাশে বসতে, ও বলল, 'আমরা একেবারে শহরের বুকে থাকি না, একটু বাইরে থাকি।'

শোধ নিতে কসুর করলাম না, 'মফস্বলে থাক তুমি ?'

সুরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল, 'আজ্ঞে না স্যার, রীতিমত অভিজাত নিরিবিলি পল্লীতে। আমি কি ব্যবসা করি, যে শহরের ওপরে থাকব ?'

আমি হাসলাম। সুরঞ্জনকে দেখছি, আর ভাবছি। চেহারাটা ওর আগের থেকে সুন্দর হয়েছে। দেখতে ও বরাবরই সুন্দর। তবে দারিদ্র্যের একটা ছাপ আছে তো। জীবন-ধারণেরও একটা ছাপ থাকে। আগের সেই ছাপটা উঠে গিয়ে, ও এখন ঝকঝকিয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যটা আগের থেকে ভাল হয়েছে। এখন বাড়ি-গাড়ির মালিক। বউটি অত্যন্ত সরল আর ভাল মেয়ে। কলকাতায় থাকতেই বিয়ে করেছিল।

এই সুরঞ্জন জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। সভা-সমিতিতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। নিজে গান বেঁধেছে। নিজে সুর দিয়েছে। পরখ করার দরকার হয় নি, সবাই তারিফ করেছে। স্নেহও যে করে নি, তা না। সেই স্নেহের মূল্যে, জীবন-ধারণটা ছিল মিটমিটে আলোর মত। সব থেকে বড় কথা, মিটমিটে আলোটা ওকে দমাতে পারে নি। সৃষ্টিটাকে দমিয়ে রাখা যায় নি।

তারপর বম্বের নাম-করা চিত্র-পরিচালক জীবনকৃষ্ণ ওকে ডেকে নিয়ে এলেন। সুরঞ্জনকে ছবির সুরকার করলেন। প্রথম ছবিই

পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি পেয়েছিল। সুরঞ্জন এখন খ্যাতিমান সুরকার।

সহসা আমার বাঁ দিকে, একটা দূর বিস্তৃতি যেন ঢেউ দিয়ে উঠল। আমি দেখলাম, নীল জল, ফেনিলোচ্ছল, রুপোলী কণায় ছিটকে উঠছে। সুরঞ্জনের গলা শোনা গেল, 'আরব সাগর।'

আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, এক কূল থেকে এলাম আর এক কূলে। অচিন কূলে। নতুন কূলকে দেখব দু-চোখ ভরে। নতুন কূলের নানারূপের বিচিত্রকে। কেবল কি কূলকেই দেখব ? কূলের কুলায় যাব, নানান কুলায় কুলায়। আরব সাগরের কূল যেখানে, নানা বর্ণে বর্ণালী হয়ে আছে।

একটু পরেই সমুদ্রকে চোখের আড়াল করে, ইমারত দাঁড়িয়ে গেল। সুরঞ্জন গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, 'জিজ্ঞেস করছিলে, তখন, কেমন আছি। খারাপ আছি, বলা যাবে না! তবে তারে বাজছে না, বুঝলে তো ?'

সহসা কথাটার কী অর্থ ধরে নেব, বুঝলাম না। তবে কোথায় যেন একটু বেসুর বাজছে। সুরঞ্জন একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। আবার বলল, 'কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারলে ভাল। নীলা আর খোকাকে নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় কাটাই। তারপর যেন সব কেমন খাঁ খাঁ করতে থাকে। এখানে নিজেকে যন্ত্রের মত করে ফেলতে না পারলে রক্ষা নেই। এখানকার সঙ্গে কলকাতার এটাই তফাত।'

বুঝতে পারলাম, সুরঞ্জন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, ঝকমকে হয়েছে। কিন্তু কলকাতার সেই টলটলিয়ে ছলছলিয়ে বেগে বয়ে বেড়ানোটা নেই। জীবনের আসল ছন্দটাই ঠিকমত বাজছে না। সেটা বেতালে আড়ি দিচ্ছে।

সুরঞ্জন আবার নিজেই বলল, 'এসব কথাও পরে অনেক হতে পারবে। জীবনকৃষ্ণদার সঙ্গে তুমি তোমার কাজকর্মের কথাগুলো বলে নাও। তবে আমার বাড়িতে এক কাণ্ড হয়েছে। তোমার বন্ধু-পত্নী খুবই বিপদে পড়েছে, অবিশ্যি আমিও।'

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বিপদ ?'

সুরঞ্জন হাতের ইশারা করে বললে, 'এত ভাববার কিছুই নেই। এরকম কাণ্ড কারখানা আমাদের হামেশাই দেখতে হয়, ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হয়। গেলেই সব দেখতে পাবে। বিপদ বলে বলছি

বটে, মজাও পেতে পার।'

সুরঞ্জনও দেখছি, রহস্যের ছায়ায় ঘেরা। সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝতে পারছি, উদ্বিগ্ন হবার মত বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটে নি। তবে একটা কিছু ঘটেছে।

প্রচণ্ড আর নিরেট শহরটা যেন ক্রমে একটু নিশ্বাস ফেলছে। একটু ফাঁকা, নতুন নতুন বাড়ি। কিছু গাছপালা, একটু বাগানের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। সব থেকে ভাল লাগছে, নারকেল গাছ দেখে। বাংলাদেশের ছেলে, এমন কাজল মাখানো নারকেল পাতার ঝিলি-মিলি না দেখলে যেন নজরকে কেমন উপোসী মনে হয়। নোনা কূলের এইটুকু কেরামতি। সে নারকেলে আর তালে, সমান তাল দেয়। কিন্তু হাওড়া ইস্টিশন থেকে, এক টানে তোমাকে, রাঢ়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিক। দেখবে, সমান তাল আর নেই। তালপাতার বাউরি ঝাপটায়, অন্য তাল শুনবে।

সুরঞ্জন আবার বলল, 'আমার বাড়িতে গিয়ে, তুমি তোমার চেনা দু তিন জনকে দেখতে পাবে।'

রুপোলী পর্দায়, মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকে, নানা কারিগর, এমন চেনা-পরিচিত বন্ধু এদেশে কিছু আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে কে?'

সুরঞ্জন বলল, 'কেশব, বিধান আর রণোকে দেখে এসেছি। তারাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

আমি প্রথমেই বলে উঠলাম, 'রণোও এসেছে?'

'হ্যাঁ, শ্রীমান রণদেব। বলবার কিছু নেই, দিনে দিনে সবই দেখতে পাবে। কেশব-বিধানও তো তোমার পরিচিত।'

'পরিচিত। রণো বন্ধু।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা বটে। তবে রণোর বন্দেবতে থাকার কোন মানে হচ্ছে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওর ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিছু টাকা পাচ্ছে বটে, হয়তো অঙ্কটাও একেবারে খারাপ না। কিন্তু শুনলে অবাক হবে, তার জন্য ওকে কিছু করতে হয় না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে আবার কী রকম? টাকা পাচ্ছে, অথচ কিছুই করতে হচ্ছে না?

কিছুটি না। যাকে বলে তৃণকুটাটি ভেঙে দু-টুকরো করতে

হচ্ছে না।'

'তবে ও করে কী সারাদিন?'

'যদি নিজের মনে কোন কাজ করতে ইচ্ছা করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে, সেইটুকু করে। তা না হলে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

একটু আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'যাই হোক, তবু দরজা বন্ধ করে নিজের কাজকর্ম কিছু করে।'

সুরঞ্জন বলল, 'বলে তো তা-ই, আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে, কেমন একটা অস্থির ভাব, আর সব সময়েই রেগে আছে। সবাইকে গালাগাল দিচ্ছে। আমাকে তো সব সময়ে গালাগাল দিচ্ছে, আমার বাড়িতে বসেই। নীলা এক এক-সময় একটু গম্ভীর হয়ে যায়। আমি বুঝিয়ে বলি। গিয়ে দেখবে, যেমন জামাকাপড়ের চেহারা, তেমনি চেহারাটা। দেখ, তোমাকেই বা কী বলে।'

সুরঞ্জন যেন রণোর পুরোপুরি চেহারা আর চরিত্রটা আমার চোখের সামনে এঁকে দিল। রণো বরাবরই একটু উচ্চ গলার মানুষ। মিহি বা মোলায়েম ভাষাটা কোনদিনই ওর আসে না। লক্ষ্য ওর চিত্র-জগৎ, রুপোলী পর্দা। কিন্তু ওর চিন্তার মধ্যে কোথাও রুপোলী শব্দটা নেই। রণো হল উজানের মানুষ। ছবির জগতে, ওর চিন্তা-ভাবনাটা আলাদা। ফলে, মেলে না প্রায় কারোর সঙ্গেই। অথচ, ওরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কেউ কেউ ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। যাদের ও অন্তর থেকে তারিফ করতে পারল না। সেটা কতখানি ওর নিজস্ব শিল্পী-ভাবনা থেকে, কতটা অন্ধ বিদ্বেষে, জানি না। কেন না, এরকম ক্ষেত্রে, বিদ্বেষটা আশ্চর্যের ব্যাপার না। তার ওপরে, নিতান্ত জীবন-ধারণের জন্য, কলকাতা থেকে এখানে এসে, ওকে এইরকম একটা চাকরি করতে হচ্ছে। যে চাকরিটা আসলে ওকে করুণা করার জন্যই।

কিন্তু রণো আর যাই হোক, করুণা করবার পাত্র না। ও হয়তো এখনো ওর প্রতিভার পূর্ণ চেহারাটা দেখাতে পারে নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই, নাটকে বা ছবির চিন্তায়, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই অনেকে ওর দিকে অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে। ওর ওই রোগা লম্বা শক্ত হাড় রুঢ় চেহারার দিকে তাকিয়ে, করুণা করবার সাহস অন্ততঃ কারোর হবে না। ও যখন বিড়ি কামড়ে ধরে,

আজানুলম্বিত বাহু তুলে কথা বলে, তখন ও নিজের মর্যাদায় ঝকঝক করে।

একটা খোলা গেট দিয়ে সুরঞ্জন গাড়ি ঢুকিয়ে দিল পাঁচিল ঘেরা ছোট উঠোনে। দরজা খুলে, নামতে নামতে বলল, 'এস ওপরে যাই। চাকরটা এসে ক্যারিয়ার থেকে মালপত্র নিয়ে যাবে।'

ঝকঝকে বাড়ি, ছোটখাটো বাগান। বারান্দার পাশ দিয়ে, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ওপরে। সুরঞ্জনের পিছে পিছে যাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বারান্দার ডান দিকেই, সাজানো বসবার ঘর। রণোই আমাকে প্রথম ওর নিজের ভাষায় অভ্যর্থনা করল, 'এই যে শালা লেখক। এস। এবার বম্বেতে বিকোতে এসেছ?'

সুরঞ্জন বলল, 'বাবা, কিছু না হোক, দু-বছর বাদে তো দেখা। পাঁচ মিনিট একটু শ-কার ব-কার ছেড়ে, অন্য কিছু বল, তারপরে তো আছেই।'

রণোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক যেমনটি সুরঞ্জন বলেছিল। ও একটা বড় সোফায় গা এলিয়ে, কোঁচাটা মেঝেয় লুটিয়ে দিয়ে বসেছিল। তেমনি ভাবে বসেই আবার আমার দিকে চেয়ে বলল, এতখানি ট্রেনজার্নি করে এল, তবু শালাকে দেখ। যেন কেষ্ট ঠাকুরটির মত চুক চুক করছে। বম্বের নামেতেই এই?'

একে বলে রণোর ভাষা। আমার যেন, বুকের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশছে। এই না হলে অভ্যর্থনা! তাও আবার রণোর মত বন্ধুর। আমি চকচকে চোখ নিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম।

রণো আবার বলল, 'কী রে শালা, কথা বলছিস না যে?'

বললাম, 'তোকে দেখছি।'

রণো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমাকে দেখে লবডঙ্কা হবে।'

দেখলাম, কেশব আর বিধানও বসে রয়েছে। এক কোণের একটি সোফায়, কালো মত একটি মেয়ে চুপচাপ বসা। ঘরে ঢোকার পর, মাত্র একবার তার সঙ্গে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। তারপরে, সে আর মেঝে থেকে চোখ তোলে নি। কেশব আর বিধানের সঙ্গে দু একটি কথা হল। সুরঞ্জন বলে উঠল আমাকে, 'ওরা সবাই থাকবে, তুমি এস দিকি নি। চান করে, আগে খেয়ে নাও, তারপরে

যত খুশি আড্ডা মেরো।'

যুক্তিযুক্ত কথা। আমি সুরঞ্জনের সঙ্গে, ভিতর-বাড়িতে গেলাম। সুরঞ্জন ডাকল, 'কই, কোথায় গেলে?'

নীলা এসে ঘরে ঢুকল। আমার চেনা মেয়ে, অতএব পরিচয় করাবার কিছু নেই। নীলা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হয়েছে তো?'

বললাম, 'কষ্ট মনে করলে। ভালই তো এলাম।'

সুরঞ্জন বলল, 'আমি ওর সুটকেস ব্যাগ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওর স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা দেখ।'

সুরঞ্জন চলে যেতে উদ্যত হয়ে ফিরল, 'হ্যাঁ, ওদিকে কতদূর?'

নীলা রাগতঃ ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কোন দূরেই না। সেই এক বুলি ধরে বসে আছে, আমি যাব না। এই বেলা তোমাকে বলে রাখছি, ভালয় ভালয় যদি বিদেয় না হয়, তাহলে ওকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।'

একে বলে মোক্ষম কথা। তবু তো বলে নি, খেংরে বিদায় করব। এ এমন জিনিস, বাঙালী মেয়ের হাতে উঠলে, অ্যাটমের থেকে বড় অস্ত্র। নীলার সুন্দর মুখখানি রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সুরঞ্জন হাত তুলে, নীলাকে থামিয়ে বলল, 'আরে দাঁড়াও না, হচ্ছে। বিদেয় করা তো হবেই। এখন তুমি লেখককে খাওয়াও তো। তারপর ওকেও কাজে লাগাতে হবে। দেখা যাক কিছু বের করা যায় কী না।

বলে সুরঞ্জন বেরিয়ে গেল। অনুমান করলাম, পথে আসতে সুরঞ্জন যে-বিপদের কথা বলেছিল, তারই বিষয়ে কথা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী?'

নীলা বলল, 'দেখলেন না, বসবার ঘরে একটা মেয়ে বসে আছে?'

'দেখলাম তো।'

'রূপের কী ঘটা মায়ের আমার, তাও দেখেছেন। উনি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছেন, জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনে ছবিতে নামবেন। বাঁদরিটা নিজের চেহারাটা কোনদিন আয়নায় দেখেনি?'

রূপসী নীলা সে কথা বলবার যোগ্যা। ঘটনাও আক্কেল গুড়ুম হবার মত বটে। রূপ না থাক, মেয়েটিকে সোমত্থ বলেই মনে হল। আমি বললাম, 'এত বড় মেয়ে, কলকাতা থেকে পালিয়ে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই নীলা একটু ঝেঁঝে বেজে উঠল, 'এদের আবার বড় ছোট! বাদ দিন। ওসব ভয়-ডর এরা খেয়ে বসে আছে। রোজই শুনবেন, এরকম ছেলে-মেয়েরা পালিয়ে আসছে। আর জীবনকৃষ্ণদাও সেইরকম। যেই দেখলেন, কোন মেয়ে পালিয়ে এসেছে ও'র কাছে, উনি অমনি হয় আমাদের এখানে না হয় কেশববাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। নাও, এখন তোমরা ভোগান্তি পোহাও।'

কল তো মন্দ না। জীবনকৃষ্ণবাবু ঘাড় পরিষ্কার করলেন। বোঝা আর এক জনের ঘাড়ে। অবিশ্যি নিয়মই তাই। এক জনের বোঝা, আর একজনকে বইতেই হয়। একমাত্র ভাগ্যবান হলে, তার বোঝা ভগবানে বয়। সাত পাঁচ না ভেবে, আমি একটা সোজা কথা বললাম, 'তা বোঝা মনে করবার কারণ কী আছে? পথ দেখিয়ে দিলেই হয়।'

নীলা বলল, 'সেই তো হয়েছে মুশকিল, মেয়ে কী না! কোথায় কী করে বসবে, একটা কিছু ঘটিয়ে বসলেই হল। কোথা থেকে হয়তো দেখা গেল, জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের নাম করে বসল। তখন এদের নিয়েও টানাটানি। এরকম ঘটনাও ঘটে গেছে। তারপর ধরুন একটা বাঙালী মেয়ে, একেবারে ছেড়ে দিতেও খারাপ লাগে। যে ভাবেই হোক, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনরকমে ঘরের মেয়ে ঘরে পাঠাতে পারলেই হয়। এখন সেই চেষ্টাই চলছে।'

এই সময়ে আমার ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে, বিশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে ঢুকল। তাকে চাকর বলে ভাবতে, নজর আপত্তি দেয়। পাতলুন-জামার বহর একেবারে চোস্ত। তার ওপরে, চুলের বাহার, সেই যাকে বলে, কপালের কাছে ঝোপছাড় করা। নীলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'এই যে দেখছেন শ্রীমানকে। বাপ দুধ বেচে ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা করছিল। ছেলে ফিল্মের হিরো হবার জন্য, বাপের বাকসো ভেঙে, বেলঘরিয়া থেকে একেবারে বম্বে।'

কৃষ্ণকালো বেঁটে সেঁটে ছেলেটি লজ্জিত। ঝকঝকে দাঁতে এক ঝলক হেসে বলল, 'বউদি, এখনই কেন বলছেন। দু একদিন পুরনো হোক, তারপরে বলুন।'

নীলা ভুরু তুলে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'কেন গুরুচরণবাবু,

আপনার লজ্জা করছে?'

গুরুচরণ এক পলক আমাকে দেখে বলল, 'একটু একটু।'

নীলা হাত তুলে বলল, 'মারবো এক থাপ্পড়।'

থাপ্পড় পড়বার আগেই, গুরুচরণ একদৌড়ে অন্য ঘরে। নীলার মুখে দেখি, স্নেহের হাসি। বলল, 'এই সব উন্মাদকে নিয়ে কী করবেন। এখন বলে, আর বাড়ি ফিরতে পারব না, বাবার কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারব না। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই, হাত পাততে থাকে। এমন কতজনকে আপনি বাড়িতে এনে রাখতে পারেন?'

রীতিমত সমস্যা। সমস্যা যদি মনে করা যায়। না মনে করলেও, শেষ অবধি, মনের দায় ঘোচে না। এ যে ব্যাধির তুল্য। এ রোগ সারানোর ওষুধ কী, কে জানে। এমনিতে না হয়, পোশাকে-আশাকে বেশ-বাসে, হাজার গণ্ডা ছেলেকে রূপকুমার ফুলকুমার সেজে বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু তারা যদি রূপকুমার ফুলকুমার হবার বায়না ধরে, আর কলকাতা থেকে সিন্দুক ভেঙে এনতার আরব সাগরের কূলে পাড়ি দিতে থাকে, তা হলে ব্যাপার গুরুতর! তার সঙ্গে আবার মেয়েরাও। কী সর্বনাশ!

নীলা আমাকে তাড়া দিল, 'নিন, এখন আর ওসব ভাববেন না। অনেক কিছু দেখবেন শুনবেন। চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।'

নীলার সঙ্গে যেতে যেতে, আমি একটু ঘুরিয়ে বাত দিলাম, 'জীবনকৃষ্ণবাবুর বোঝা আমিও শেষটায় সুরঞ্জনের ঘাড়েই চাপলাম?'

নীলা ঘুরে আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'ছি! আপনি হলেন আমাদের বন্ধু। জীবনকৃষ্ণদা অবিশ্যি তাঁর বাড়িতেই আপনাকে তুলতে চেয়েছিলেন, অথবা আপনার ইচ্ছে হলে, শহরের কোন হোটেলে। আমরাই বলেছি, তা হয় না।'

এইটুকুই ভাগ্য, অন্ততঃ বন্ধু এবং একটি পরিবারের সাহচর্যে থাকা যাবে। নীলা ঠোঁটের কোণে হেসে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'অবিশ্যি, জীবনকৃষ্ণদার ওখানে আরো ভালো থাকতে পারতেন। সেখানে সবই বিরাট ব্যাপার, অনেক আরাম। আমরাই বাদ সেধেছি।'

আমি বললাম, 'সেজন্য সুরঞ্জন আর নীলা ঠাকরুণকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

নীলার মুখে খুশির হাসি ঝিলিক দিল। শ্রীমান গুরুচরণ আমার ঘরেই দাঁড়িয়েছিল। নীলা তাকে বলল, 'দাদাবাবুকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে। আমি গিয়ে খাবারটা গরম করি।'

নীলা চলে গেল। শ্রীমান গুরুচরণ আমার দিকে চেয়ে, একখানি হাসি দিল। উদ্দেশ্য, সবই তো শুনলেন আমার সম্পর্কে। একটু লজ্জা পাচ্ছি। তা বটে। কোথায় রুপোলী পর্দায় ঝলকাবে। গাড়ি চেপে ড্যাং-ড্যাং করে বেড়াবে। পকেটে ঝনঝনাবে লক্ষ টাকা। তার বদলে, সুরঞ্জনের বাড়ির ভৃত্য! কিন্তু তা যেন হল, তথাপি, গুরুচরণ এই হাসিটি বজায় রেখেছে কেমন করে? তাকে দেখে তো আমার একটুও মনে হচ্ছে না, তার মনে কোন ক্ষোভ বা আপসোস আছে। বেশ ঝলমলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে।

হবে হয়তো, পকেটের টাকা যেদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল, চোখের সামনে অসহায় ক্ষুধা আর খোলা আকাশের নীচে রাস্তা ছাড়া কিছু দেখতে পায় নি, সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে, সুরঞ্জনের আশ্রয়টা হয়তো ওকে, নতুন ঝলক দিয়েছে। সুরঞ্জনের আশ্রয়টা নিতান্তই বোধহয়, ভৃত্যের আশ্রয় না। তার থেকে কিছু বেশি। নীলার চোখে একটু স্নেহের আলোই সে কথা বলে দেয়। হয়তো, সুরঞ্জনের মত একজন বিখ্যাত লোকের স্নেহ ও আশ্রয়, ওকে অনেক বেশি খুশি ও গর্বিত করেছে।

তথাপি এই গুরুচরণদের জন্য মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কী এক অলীক কল্পনার পিছনে, জীবনের মূলটাকে উপড়ে তুলে, ছুট দিয়েছে। আলোর পিছনে বাদলা পোকার মত। কোন্ গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছবে, কে জানে। বাড়িতে হয়তো মা বাবা ভাই বোনেরা আছে। আর যারই মনে না থাক, মায়ের তো দিনান্তে একবার মনে হবে, গুনতিতে তার একটি সন্তানের জায়গা, সংসারে সব সময়েই শূন্য।

সে-ঋণ শোধ করবার নয়, আমরা সন্তানেরা শুধু সেই ঋণটার কথাই জীবনে ভাবি না। মা গো, তাইতো তুমি মা। তুমি ঋণের কথা জান না। তুমি দাত্রী, তুমিই ধাত্রী, তুমি গর্ভধারিণী জননী। ঋণের কথা তোমার জানা নেই।

খেয়ে দেয়ে পোশাক বদলে ফিটফাট। শোবার উপায় নেই! সুরঞ্জনের সকাতর প্রার্থনা, ওরা সকলেই হার মেনেছে সেই মেয়েটির কাছে। এবার আমাকে কেরামতী দেখাতে হবে। কিন্তু আমি তো কেরামত মিঁয়া না, কেরামতী দেখাব কেমন করে। সুরঞ্জন যেখানে হার মেনেছে, এবং স্বয়ং রণো বাহাদুরেও নাকি পর্যুদস্ত, সেখানে আমি কোন্ মাতব্বর।

সমস্যা কী? না, মেয়েটিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো। কোনরকমে একবার হাওড়াগামী গাড়ীতে, টিকিট কেটে তুলে দিতে পারলে হয়। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমি বাইরের ঘরে গেলাম। দেখি মা-লক্ষ্মীকে যদি একটু পায়ে ধরে বোঝাতে পারি।

রণো আবার হাঁক দিল, 'খ্যাটন হল?'

কথায় কোথাও ত্রুটি পাবে না। বললাম, 'হল। তারপর, খবর কী বল?'

'খবর আর কী। আপাততঃ এই যে শ্রীমতী বসে আছেন। আমি বলছি বাবা, থানায় পুলিশের হাতে হ্যান্ডওভার করে দাও। সব ল্যাঠা চুকে যাক।'

মেয়েটির দিকে আমি দেখলাম। নীলা মিথ্যা বলে নি। রূপের একেবারে বালাই। কালো রঙের মেয়েও অনেক দেখেছি, যাদের কালো রূপসী বলা যায়। মেয়েটির চোখ মুখ নাকও খাঁদি পাঁচির দিকেই। বেঁটের ওপরে স্বাস্থ্যটা একটু যা হোক আছে। তাও তার মধ্যে লাবণ্য বলে কিছুই নেই। নাম কী? না, রানী। বোঝ এখন। এর নাম যদি রানী হয়, বাকী মেয়েরা যায় কোথায়। চাকরানী বলতে আমার সংকোচ হয়।

বিধান বলল, 'আমি তো বলছি, তুমি বম্বের যেখানেই যাবে, যে-কোন স্টুডিওতে, কোথাও কেউ তোমাকে নেবে না। শুধু শুধু কোথায় ঘুরবে? জীবনকৃষ্ণদা তোমার ভালর জন্যই বলছেন, কলকাতার বাড়িতে চলে যাও।'

কী গেরো বল দিকিনি! জীবনে কোনদিন এমন ঘটনা দেখতে হবে, বা ঘটনায় থাকতে হবে, জানতাম না। মেয়েটি বিধানের কথায় কোন জবাব ছিল না। সুরঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। অর্থাৎ তুমি কিছু বাত ছাড়! কিন্তু কী বাত ছাড়ব এ মহারানীকে, তা তো বুঝতে পারছি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম সুরঞ্জনকেই, 'এ কলকাতার কোথা থেকে আসছে?'

সুরঞ্জন বলল, বলছে তো, বাগবাজার থেকে আসছে।'

কেশব কম কথার লোক। কালো রঙ, ড্যাবডেবে দুটো চোখ, কোঁকড়ানো চুল, রোগা মানুষ। কলকাতায় একটি ছবি করেছিল। সুবিধে করতে পারে নি। তাই এখন আরব সাগরের কূলে। যদি এখানে রূপোলী মাছটাকে গাঁথা যায়। এখানে সে এখন জীবনকৃষ্ণদার কাছে কাজ করছে। সে বলল, 'বলছে বাগবাজার থেকে এসেছে। পরে হয়তো শোনা যাবে বাগজোলা থেকে এসেছে।'

সকলের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সবাই বিরক্ত। বিরক্ত আমিও হচ্ছি। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না, এরা তবু ভালভাবে ওকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে—অন্য কারোর কাছে গেলে, এটুকু করুণাও ওর ভাগ্যে জুটবে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাগবাজারের কোন ঠিকানা আছে?'

সুরঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, একটা ঠিকানা আছে।'

রণো বলে উঠল, ব্যাস্, মিটে গেল। কলকাতা পুলিশকে ঠিকানাটা জানিয়ে দাও, এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দাও। তারপরে যা করবার পুলিশেই করবে। কী, তাই করা হবে তো?'

রানী রণোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরে মুখ নামিয়ে, ঘাড় কাত করে বলল, 'তাই দিন।;

ও বাবা, এ যে বাজে মন্দ না। বলে, তাই দিন। সুরঞ্জন বলল, 'পুলিশের হাতে যাবে, তবু ভদ্র সদ্র ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে না?'

রানী কোন জবাব দিল না। কিন্তু বোঝা গেল, তাতেই সে রাজী। আমি সুরঞ্জনের পাশেই বসেছিলাম। সে আমাকে নীচু স্বরে বলল, 'বুঝতে পারছ তো পুলিশে দিতে গেলে কে দেবে? আমরা কেউ দিতে গেলে, তা হলে, ঘটনাটার মধ্যে আমাদের নাম থাকছে। কিংবা জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের নাম থাকছে। সেটা কেউ-ই চাইছে না।'

স্বভাবিক, নাম নিয়ে কথা। একটা পালিয়ে-আসা মেয়ের ব্যাপারে, কে পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে চায়? বিশেষ জীবনকৃষ্ণের এখানে যথেষ্ট নাম এবং সম্মান। আমি রানীর দিকে তাকালাম। ও তেমনি মাথা নীচু করে বসে আছে। মেয়েটার রূপ না থাক, সমস্ত চেহারাটা জুড়ে কোথায় যেন একটা দুর্ভাগ্যের ছাপ ফুটে রয়েছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এটুকু বুদ্ধি কি সত্যিই ওর নেই, রূপোলী পর্দায়ও কোনদিনই ঝলকাতে পারবে না? ওর নাক মুখ যতই খারাপ হোক, ও যে বোকা না, সেটা ওর চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া যে-মেয়ে এমন করে ঘর ছেড়ে চলে আসে, মনে হয়, তার পিছনে দুর্ভাগ্যের তাড়নাটা গভীর। সে কখনো একটা সুস্থ ভাল পরিবার থেকে আসতে পারে না। একটা মেয়ে, রানীর মত একটা বাঙালী মেয়ে, সহজে ঘর ছাড়বার পাত্রী না। তবু একটা কথা আমার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। শ্রীমতী কোন শ্রীমানের সঙ্গে পালিয়ে আসে নি তো? চল, দুহুঁ দোহাঁ যাই। ঘর থেকে তুমোও কিছু নাও, আমুও কিছু নিই। তারপর বম্বেতে একবার পৌঁছতে পারলে, নায়ক-নায়িকা ঠেকায় কে?

আমি সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতা থেকে কবে এসেছে ও?'

সুরঞ্জন বলল, 'বলছে তো পরশু এসেছে।'

আমি রানীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি কি সত্যি পরশু এখানে এসেছ?'

রানী আমার দিকে তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'একলা এসেছ, না সঙ্গে আর কেউ এসেছে?'

আমার প্রশ্নটা শুনে, সবাই রানীর দিকে তাকাল। রানী মাথা নীচু রেখেই বলল, 'না, একলাই এসেছি।'

আমি বললাম, 'তুমি মুখ নীচু করে রাখছ কেন? মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বল না।'

রানী মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু আবার নামিয়ে নিল। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি বুঝি নির্লজ্জ বেহায়া। কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর মুখ নামানো দেখেই বুঝতে পারলাম, ওর লজ্জা আর সঙ্কোচ রয়েছে। তথাপি ও এত অনড় কেন? আমি বললাম, 'আমি এই জন্য বলছি, হয়তো তোমাকে কোন ছেলে ভালবাসে, সেটা খুবই

স্বাভাবিক। সে হয়তো তোমাকে কোন আশা দিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারপর বেগতিক দেখে, তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।'

রানী ওর অতি সাধারণ, প্রায় ময়লা শাড়ীটার আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিল। কোন জবাব দিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছ ?'

রানী মুখ থেকে আঁচলটা সরাল। ওর মুখে হাসি, হাসিতে একটু লজ্জাও আছে। বলল, 'না, যা ভাবছেন, তা না। আমি একলাই এসেছি।'

রানীর ভঙ্গিটাই বলে দিল, ও মিথ্যা বলছে না। বিশেষ করে ওর হাসিটা। রণো হেঁকে উঠল, 'আবার হাসি হচ্ছে! কাল থেকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, আবার হাসি হচ্ছে!'

আমারও হাসতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু রণোর ভয়েই পারছি না। কেন না রণোর কথাতেই আমার হাসি পাচ্ছে। আমি হাত তুলে রণোকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাকে হে। মুনি দুর্বাসা সব সময়ে রুদ্র হয়েই আছেন। আমাকেই হুমকে উঠল, 'হাত তুলে কী বোঝাতে চাইছিস আমাকে? তোর ওই ম্যান-ম্যানানিতে কিছু হবে না।'

আমি বললাম, 'না হতে পারে, রানীর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখা যাক না।'

রণো দাঁতে একটা বিড়ি কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। হাত নাড়িয়ে বলল, 'তুমি শালা প্রেমিক মানুষ, দেখ এখন যদি প্রেম করে ভোলাতে পার। তবে ভবী ভোলবায় নয়, বলে দিলুম। আমি চললাম।'

কোঁচাটা লুটিয়ে, দরজার দিকে খানিকটা গিয়ে, ফিরে দাঁড়াল। আমাকে বলল, 'আমার বাসায় যদি আসতে ইচ্ছে করে, আসিস। এদের কাছে ঠিকানা আছে।'

রণো সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কারোকে কিছু বলল না। এতে অবিশ্যি অবাক হবার কিছু নেই। ওকে যারা জানে, তারা অবাক হবে না। রানীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর কালো খ্যাঁদা মুখে, শুধু কৌতুকের ছাপ না। একটু হাসিও লেগে আছে। নিশ্চয়ই রণোর ভাব সাব দেখে।

বিধানও উঠল। জীবনকৃষ্ণ প্রোডাকশনের ও হল এডিটর।

ছবিকে ঠিক জায়গায় কেটে কেটে জোড়া যার কাজ। ইতিমধ্যেই, বিধানের যথেষ্ট নাম হয়েছে। বম্বের অন্যান্য প্রযোজকেরাও ওকে ডাকাডাকি করে। বলল, 'আমিও যাই, কাজ রয়েছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'তাহলে তুমি ঠিক জায়গায় খবরটা দিয়ে দিও।'

কেশব বলল, 'আমিই বা কী করব, কেটে পড়ি।'

সুরঞ্জন বলল, 'যাও। সব ঝক্কি তো এখন আমার।'

বিধান আমাকে দেখিয়ে বলল, 'কেন, আর একজন তো রইল।'

পরে আবার দেখা হবে জানিয়ে, বিধান আর কেশব চলে গেল। আমি রানীর দিকে ফিরে তাকালাম। রানী দরজার দিকে তাকিয়ে-ছিল। আমি বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার কথা অবিশ্বাস করিনি রাণী।' তবু আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকাল তো এসব ঘটনা আখচার ঘটছে। তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

রাণী এবার মুখ তুলল, কিন্তু আমার দিকে তাকাল না। ওকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। বলল, 'কাকা আর কাকীমা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ব্যাস, আর কেউ না? বাবা মা ভাই বোন?'

রানী আবার মুখটা নীচু করল, বলল, 'এক দাদা আছে। সে অনেক কাল থেকে আলাদা থাকে, আসামে চাকরি করে।'

'দাদা তোমার কোন খোঁজখবর করে না?'

'না।'

'দাদা বোনের কোন খোঁজখবর করে না কেন?'

রানী কোন জবাব দিল না। এই মুহূর্তে, রানীর গোটা অবয়বটিকে যেন আমার কেমন করুণ আর অসহায় মনে হল। দাদা খোঁজ করে না। কাকার কাছে থাকত। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন জট-পাকানো। আমি বললাম, 'তা, তুমি যে চলে এলে, তোমার কাকা জানেন?'

রানী প্রথমটা জবাব দিতে যেন, কেমন দ্বিধা করল। একবার আমার দিকে দেখল। তারপরে বলল, 'এক রকম জানেন।'

'এক রকম জানেন? জেনে শুনে, তিনি তোমাকে আসতে দিলেন? এই দূর বম্বেতে?'

রানীর মাথাটা যেন আরো নত হয়ে গেল। এই সময়ে সুরঞ্জন উঠে, বাড়ির মধ্যে চলে গেল। আমি ডাকলাম, 'রানী।'

রানী কোন জবাব দিল না। হঠাৎ দেখলাম, ও দুহাতে মুখ ঢাকল। শরীরটা কাঁপছে থর থর করে। রানী কাঁদছে। আমি উঠে ওর কাছে গেলাম। ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, 'কী হয়েছে রানী, কাঁদছ কেন? আমাকে তুমি সব কথা বলতে পার।'

রানীর কান্নাটা যেন আরো দুরন্ত হয়ে উঠল। সম্ভবতঃ এই কান্নাটা ওর দরকার ছিল। বিদেশে এইরকম একটি অসহায় মেয়ে। ওর কান্নাটা আমারও কোথায় যেন টনটনিয়ে দিল। নানান দুর্ভাগ্যের আবর্তে, এই কুরূপা যুবতী রানী, আমার বোন হতে পারত। আমার প্রেমিকাও হতে পারত। আমার যে-কোন রকমের আত্মীয়া হতে পারত। প্রথমে যাই ভেবে থাকি, ওকে এভাবে কাঁদতে দেখে এ কথাই আমার মনে হচ্ছে। আমি অসংকোচে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে, রানী একটু শান্ত হল। আমি ওর পাশের চেয়ারে বসলাম। বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার মনে একটা কিছু আছে। তোমার কাকা কী করে সব জেনে-শুনে তোমাকে এখানে আসতে দিলেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বলতে তোমার আপত্তি আছে?'

রানী ভেজা স্বরে বলল, 'বলতে লজ্জা করে।'

আমি ওর দিকে একটু ঝুঁকে বললাম, তবু বল রানী। আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। বরং আমি যদি পারি, তোমার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করব।'

রানী মুখ তুলে মেঝের দিকে অপলক চোখে, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপরে এক মর্মন্তুদ বৃত্তান্ত ও আমাকে শোনাল। প্রশ্ন করে করে জবাব নিয়ে নিয়ে, যে কথা শুনেছি, আমার জবানীতে এই কথা বলি।

পদবীতে ওরা ভট্টাচার্য। ওরা দুই ভাই বোন। অল্পবয়সে বাবা-মা মারা যায়। কাকাই তখন ওদের অভিভাবক। কাকার বয়স তেমন বেশি না। কলকাতায় কোন একটা প্রেসে চাকরি করে। কাকা দাদাকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু দাদা কোথায় যাবে? ও তখন ক্লাস টেনে পড়ত। কাকা ওর পড়ার খরচ দিতে রাজী হয় নি। ফলে ওর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপরে, রানীর মাত্র তোরো বছর বয়সে, ওর কাকা একদিন

ওকে বলাৎকার করে। সেই সঙ্গে শাসিয়ে রাখে, যদি রানী সে কথা কারোকে প্রকাশ করে, তবে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে। বয়েসের অনভিজ্ঞতা, ভয়, অসহায়তা, সব মিলিয়ে, রানী একটি ভীরু পশুর মত বোবা হয়ে ছিল। দাদাকেও বলতে ভরসা পায় নি। দাদার বয়সও তখন এমন না। তাছাড়া নিজের কাকাকে চিরদিন দেখে এসেছে অন্য চোখে। জানত, সংসারে কেউ না থাক, কাকা আছে। সেই কাকাই যখন রানীর এমন সর্বনাশ করতে পারল, তখন অন্য কারো কাছে মুখ খোলবার সাহস ওর হয় নি।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কদর্যতার এখানে শেষ না, শুরু। রাণীর তেরো বছর বয়সের একদিনের ব্যাপারটাকে, কাকা নিয়মিত দাঁড় করালে। কাকার পক্ষ থেকে সে সময় রানীকে নানাভাবে বোঝানো হয়েছে। আসলে বেঁচে থাকার, বাইরের চোখে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের আর কোন উপায় ছিল না। কাকা সেই সুযোগ নিয়ে, রানীকে প্রত্যহের শয্যা-সঙ্গিনী করে তুলেছিল। রানী আমার কাছে অস্বীকার করে নি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ও নিজে ক্রমাগত একটি অভ্যাসের দাসী হয়ে উঠেছিল। ওকে এ পর্যন্ত তিনবার নার্সিং-হোমে যেতে হয়েছে।

এই ঘটনার শুরু থেকেই, রানীর দাদা সব কিছু টের পায় নি। ক্রমশ ব্যাপারটা তারও চোখে ঠেকতে আরম্ভ করে। দাদা প্রথমে নিজের চোখে কিছু দেখেনি, সন্দেহ করেছিল মাত্র। তারপরে সে একদিন নিজের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা চাক্ষুষ করল। আর তার যত রাগ আর ঘৃণা, সব এসে পড়ল রানীর ওপরেই। কাকাকে সে কিছু বলল না, বোধহয় সাহস পায় নি। একদিন কাকার অনুপস্থিতিতে, রানীকে মারতে মারতে, মৃতপ্রায় করে রেখে, চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। লোকমুখে শোনা যায়, সে আসামে কোথাও চাকরি করছে।

এখন রানীর তেইশ বছর বয়স। পাড়ায় সন্দেহ, লোকের চোখে ঘৃণা, সব সত্ত্বেও, রানী এক রকম ভাবে, এই অসহায় জীবনকেই মেনে নিয়েছিল। কোন ছেলে তার সঙ্গে প্রেম করতে আসে নি। তাকে মুক্ত করার কেউ ছিল না। যদি বা কেউ এসে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে কাকার মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কাকা রানীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, এভাবে

চলতে পারে না। রানীর নাকি সে একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে।

এই দশ বছরের মধ্যে রানী অনেক সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে। লোকে যেমন জানত, রানীর রূপ নেই, রানী তেমনি করে সে কথাটা জানত না। এটা তো সংসারের নিয়ম। শুধু রানীর বেলা কেন, আমরা যারা চোখ মেলে চলাফেরা করি, কত খোঁড়াকেই তো সোজা হয়ে হাঁটবার শখ করতে দেখি। স্বাস্থ্যহীন কুরূপা যখন ঠোঁটে রঙ লেপে, বিচিত্র পোশাকে সেজে রাস্তায় বেরোয়, তখন সেই কথাই মনে হয়। তাকিয়ে দেখলে তো মনে হয়, এমন খোঁড়াদের সোজা হয়ে হাঁটবার মিছিল চলেছে চোখের ওপর দিয়ে। রানীরও শখ হত। কাকা ওকে এ বিষয়ে প্রথম প্রথম প্রশ্রয়ই দিত। রাণী সাজগোজ করত, ঢঙ্-ঢাঙ করত। অল্পবয়সের চপলতায় যা হয়। তা ছাড়া, অন্য দিকেও, মনের দিকটা ছিল ওর শূন্য।

কাকার পরিবর্তনের কারণটা জানতে দেরি হল না। রানীকে সে বিয়ে দিতে পারল না। কিন্তু নিজে একটা বিয়ে করে বসল। এই শেষ আঘাতের সামনে, রানী যখন দিশেহারা, সেই সময় ওর নববিবাহিতা কাকী বাড়িতে ঢুকেই ঘোষণা করল, কালামুখী রানী যদি এ বাড়ি ছেড়ে না যায়, তাহলে সে জলগ্রহণও করবে না।

রানী এবং আরো দু-একটি মেয়ে-বন্ধু, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, সুযোগ পেলে, ওরাও ছবিতে অভিনয় করতে পারে। কাকা সেই কথাটা জানত। সেই সুযোগটাই সে নিল। রানী যে আমাকে প্রথমে বলেছিল, 'কাকা এক রকম ভাবে জানে' সেটা সত্যি। কাকাই আসলে ওকে টিকিট কেটে, সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে দিয়ে, হাওড়া থেকে তুলে দিয়েছে। যেমন করে গৃহহেরা, অনাহূত কুকুর-বেড়ালের বাচ্চাকে অচিন জায়গায় বিদায় করে দিয়ে আসে। কাকার মতলব বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে ভেবেছিল, রানীর পক্ষে একবার বম্বে গেলে, আর কোনদিনই ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

রানী জানত, জীবনকৃষ্ণ বাঙালী। বম্বের মস্তবড় প্রযোজক পরিচালক। ইস্টিশনে নেমে, তার নাম করে, স্টুডিওতে চলে আসতে ওর অসুবিধা হয় নি।

সমস্ত ঘটনা শোনবার পরে, অনেকক্ষণ অবশ হয়ে বসেছিলাম।

রানীর দিকে তাকাতে পারি নি। আগে থেকে অনুমান করেছিলাম, মেয়েটার জীবনে কোথাও একটা দুর্ভাগ্যের তাড়না আছে। কিন্তু তা যে এত নিষ্ঠুর, অপমানজনক, ভয়ঙ্কর, তা বুঝতে পারি নি। সমাজ সংসার মানুষ, সকলই নিরন্তর। চলছে ফিরছে হাসছে খেলছে। কখনো অট্টহাস্যে উত্তাল, কখনো সমালোচনায় মুখর, কখনো রাগে দ্বেষে মুহ্যমান। কিন্তু এই রূপের গভীরে গভীরে, বিবরের সাপের মত, আদিমতাকে সে বহন করে নিয়ে চলেছে। সুযোগ পেলেই সে তার ফণা তুলে ছোবল মারছে। তার বহু শিকার ছড়িয়ে রয়েছে। আমার সামনে, আর একটা নিষ্ঠুর শিকার।

সম্ভবতঃ এটা নিয়ে মানুষের সংগ্রাম করার কথা। এটা নিতান্তই ব্যক্তির সংগ্রাম। সমাজ তাকে শিক্ষা দিতে পারে। আয়ত্তে আনবার জন্য, শক্তির চর্চা মানুষের নিজের। কিন্তু সেটা অনেক দূরের কথা, এক ধরনের উন্মাদ আর শয়তানের ধারণা, তারা সেই সরীসৃপটিকে নিহত করে, আজকের এই সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। এদের উন্মাদ আর শয়তান বলতে ইচ্ছা করে, কারণ, একদল হয় না-জেনে বলে, আর একদল, নিতান্ত কার্যসিদ্ধির জন্য বলে। এই দ্বিতীয় দল, শান্ত, কৌশলী, বক্তৃতাবাজ, কথায় চালাক, এবং সমালোচনায় মুখর।

শিষ্যদের কাছে বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মৃত্তিকার ওপরে যা দেখছ, একমাত্র এই বাস্তব রূপের মতই ব্রহ্মচর্য না। মনে রাখতে হবে, অলিগর্দি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ এই মৃত্তিকার নীচে রয়েছে। ব্রহ্মচর্য যে অবলম্বন করবে, তাকে সেই আলিগর্দিকে নিহত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি না, বৌদ্ধরা সেই অলিগর্দিকে নিহত করতে পেরেছিল কী না। কিন্তু আমার ক্রোধ বা ক্ষোভ, কোন কিছু দিয়েই রানীর জীবনে কোন উপকার হবে না। জীবনে এমন দুর্ভাগা অসহায় মেয়ে আমি আর কোনদিন দেখি নি। যদি না দেখতাম, ভাল হত। যদি না শুনতাম, ভাল হত। সংসারে কত কী নিরন্তর ঘটছে। চোখ ফিরিয়ে আছি বলেই, নিজের কাছে স্বস্তিতে আছি। কানে তুলো দিয়ে থাকি বলেই সকলের সঙ্গে বেশ সমাজ সামাজিকতা করে কেটে

যায়।

কিন্তু শুনলেই, দায় আসে। দেখলেই, দর্শক ছেড়ে তখন অন্য ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার বন্ধুদের দায় শুধু, কেমন মেয়েটাকে এখান থেকে সরানো যায়। তারই দায় নিতে গিয়ে, এখন আর আমার মুখে কথা আসে না। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথাটা বলা সব থেকে সহজ। কিন্তু রানীর জীবনের এমন একটা রুদ্ধ দরজা কড়া নেড়ে খুলে ফেলেছি, যার পরে, সেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আমি চলে যেতে পারি না।

অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরে, সুরঞ্জন আর নীলা ঘরে এল। কোথায়, প্রবাসে অনেক দিন পরে বন্ধু-বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দেখা। আলস্যে বিলাসে নানান গল্প করব, পুরনো দিনের জাবর কাটব। কোথা থেকে এক রাণী এসে; সেই সুখের মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে দিল।

সুরঞ্জন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, কিছু বুঝতে চাইল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলবে?'

আমি বললাম, 'কী যে বলব, বুঝতে পারছি না। তবে কিছু বলতে হবে।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা হলে আমি আর নীলা একটু আসছি।'

আমি বললাম, 'এস।'

নীলা বলল, 'গুরুচরণ খোকাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। ফিরে এসে আপনাকে চা দেবে।'

আমি হেসে বললাম, 'তথাস্তু।'

ওরা বেরিয়ে যাবার পরেই আমি রানীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খেয়েছ?'

রানী বলল, 'খেয়েছি।'

যাক, কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। যদিও সুরঞ্জন নীলাকে সেরকম ভাবাই যায় না। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'তুমি যা বললে রানী, এর পরে কী বলা যায়, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার সব কথা এরা জানে না, তোমার অবস্থাটাও এরা বুঝতে পারবে না। সেজন্য এদের আমি দোষ দিই না।'

একটু চুপ করে থেকে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। সমস্ত ঘটনা বলবার সময় রানী অঝোরে কেঁদেছে। এখনো ওর চোখ আরক্ত, ভেজা ভেজা। মানুষের কোন আশা না থাকলে, তার মুখ থেকে যেমন সব ভাব হারিয়ে যায়, রানীকেও সেই রকম দেখাচ্ছে। কেবল দুচোখ মেলে, ও মেঝের দিকে চেয়ে আছে।

আমি আবার বললাম, 'আমি জানি, তুমি এদের কেন বলেছ, তুমি এখান থেকে যেতে চাও না।'

রানী আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি বললাম, 'খারাপ কিছু ভাবি নি। তোমার হয়েছে এখন, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কোথাও তোমার যাবার জায়গা নেই বলেই, তুমি একথা বলেছ, তাই না?'

রানী নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি তো জীবনে আমার থেকে কম দেখনি। এরা তোমাকে আপদ মনে করছে। করবেই। সব দেখে শুনে, তুমি কি বিশ্বাস কর, তুমি ফিল্মে নামতে পারবে?'

এই মুহূর্তে রানী একটু চুপ করে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বিশ্বাস কর?'

রানী জবাব দিল, 'আগে বুঝতে পারি নি।'

'সেটা আমি জানি। বুঝতে পারলে, তুমি অন্ততঃ এদের কাছে আসতে না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পার, এটা হল রূপের হাট। গুণেরও অনেক প্রয়োজন। বড় বড় কথা যে যাই বলুক, সবাই জানে, এখানে রূপ না হলে চলে না।'

রানী ঘাড় কাত করে অন্যদিকে তাকাল। আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠল। ওকে কষ্ট দিলাম কী না, কে জানে। রূপের কথা বললাম বলেই বোধহয়, মুখখানি ঘুরিয়ে নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাগ করলে রানী?'

রানী জবাব দিল, 'না।'

'আমি তোমাকে যা বললাম, তুমি কি তা মানতে পারছ?'

'পারছি।'

'তাহলে, আমি বলছি, তুমি কলকাতায় ফিরে যাও।'

রানী আমার দিকে ফিরে তাকাল। চোখে অন্ধকারের অসহায়তা। আমি ওর কাঁধের কাছে একটা হাত রেখে বললাম,

'না, আমি তোমাকে কলকাতায়, তোমার কাকার কাছে যেতে বলব না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পার, তা হলে, আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, এক জায়গায় যাবে। তার আগে, আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই। তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?'

রানী বলল, 'কিছু না, প্রাইমারি পর্যন্ত।'

বললাম, 'আমি চাই, তুমি নিজে ভদ্রভাবে রোজগার কর, নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাক।'

রানী বলল, 'কী কাজ করব বলুন। আমি তো লেখাপড়া—'

হাত তুলে, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'সে সব ভেবেই আমি বলছি। আমার এক বন্ধু তার নিজের বাড়িতে, একদিকে হোসিয়ারি কারখানা চালায়, আর একদিকে নিজের সংসার নিয়ে থাকে। সেখানে শুধুমাত্র মেয়েরাই কাজ করে। প্রায় পঞ্চাশটি মেয়ে আছে। ঠিক মত কাজ করলে, তোমার এখন চলে যাবার মত হবে। পরে আরো মাইনে বাড়বে।'

রানী এবার বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। আমিও ওকে ভাবতে বাধা দিলাম না। এক সময়ে ওর গলা শোনা গেল, 'কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমি কোথায় উঠব?'

একটু যেন স্বস্তি পেলাম। বললাম, 'সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার যে-বন্ধুর কারখানা, তাঁর স্ত্রী-ই তোমার থাকবার খাবার ব্যবস্থা করবেন। এখন আর তুমি টাকা কোথায় পাবে যে বাড়ি-ভাড়া দিয়ে খেয়ে পরে থাকবে। সেটা আমি বুঝতে পারি। তা ছাড়া ওখানে আরো মেয়েরা কাজ করে। তাদের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেলে, তুমিই হয়তো তখন অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।'

রানী এবার আর সময় না নিয়েই বলল, 'তা হলে, আমাকে সেই ব্যবস্থাই করে দিন।'

রাণীর এই রাজী হওয়াতে যেন, আমার বুকটা আরো বেশি টনটনিয়ে উঠল। গলার কাছে কথা এসে ঠেকে রইল। তথাপি মনটা যেন হালকাও হল। কয়েক মুহূর্ত পরে, আমি হাত দিয়ে ওর কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে বললাম, 'খুব খুশি হলাম রানী। তুমি খালি এটুকু বিশ্বাস করো, জীবনে এমন অনেক দিন গেছে, দিনে একবারও খাবার জোটেনি। খেয়ে শোধ দিতে দেরি হয়েছে বলে অপমানিত হয়েছি। কাউকে কাউকে একটু বেশি কষ্ট করেই

দাঁড়াতে হয়।'

রানীর মুখের ভাব খেলল। ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এই সময়েই গুরুচরণ চা নিয়ে এল। কিন্তু এক কাপ। আমি বললাম, 'রানীর জন্য আর এক কাপ চা নিয়ে এস।'

গুরুচরণ একবার রানীর দিকে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল। রানী আবার মাথা নীচু করে বসল। রানীকে সামনে রেখে আমাদের সমাজ সংসারের চেহারাটা যেন ওর মতই নিঃস্ব দেখাতে লাগল।

সুরঞ্জন আসার পরেই আমি হাওড়া যাবার গাড়ির সময় জিজ্ঞেস করলাম। তখনো মোটামুটি ভাল সময়ই হাতে আছে। আমি জানতে চাইলাম, আজই রাত্রে টিকিট কেটে রানীকে গাড়িতে তুলে দেওয়া যাবে কী না। সুরঞ্জন আর নীলা যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই পারছিল না। ওরা জানাল, সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে দেওয়া যাবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে বললাম। আর নীলাকে বললাম, সে যেন রানীকে কিছু খাইয়ে দেয়। আমি নিজে বাড়ির ভিতরে গেলাম, কলকাতার হোসিয়ারি কারখানার বন্ধুকে চিঠি লিখতে।

সুরঞ্জন আর নীলা ছুটে আমার ঘরে এল। সুরঞ্জন আমার ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা হলে রণের কথাই ঠিক? প্রেম করেই সব ম্যানেজ করতে হল?'

ওদের এই ব্যাকুল উচ্ছ্বাসটা স্বাভাবিক। বললাম, 'তা একরকম বলতে পার।'

নীলা ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কী ধরনের প্রেম করলেন মশাই? তার জন্যে আবার ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো?'

হেসে বললাম, 'প্রেম করলে তো ফ্যাসাদে একটু পড়তেই হয়।

সেই ব্যবস্থাই তো করছি এখন।'

সুরঞ্জন আর নীলা দুজনে চোখাচোখি করল। ওদের বিস্ময় আর ঘুচতে চায় না। সুরঞ্জন এবার ভিন্ন মূর্তি ধরল। বলল, 'তোমাকে ব্যাটা ছাড়া হবে না। আগে বল, কী করে ওকে রাজী করালে?'

আমি বললাম, 'রানীর বুদ্ধি-সুদ্ধির অভাব নেই। আসলে ওর ব্যাপারটা বোঝা যায় নি। মেয়েটা বড় দুর্ভাগা। সমস্ত ঘটনা আমি তোমাদের রাত্রে বলব। এখন আমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। রানী চিঠিটা নিয়ে কলকাতায় যাবে। আপাতত সেখানেই ওর আশ্রয় এবং কাজ।'

সুরঞ্জন বলল, 'যাক, আগে আমি জীবনকৃষ্ণকে খবরটা টেলিফোন করে জানাই। একটু শান্তি পাবেন।'

বলেই ও চলে গেল। নীলা বলল, 'দেখবেন, চিঠিপত্র লিখছেন, তারপরে এর জন্য আবার কোনরকম বিপদে পড়তে হবে না তো?'

'কী বিপদে পড়তে হবে?'

'এ সব যা ভয়ঙ্কর মেয়ে, কিছু বলা যায়? হয়তো চিঠিটা দেখিয়ে আপনার নামেই কলকাতায় গিয়ে যা তা বলে বেড়াবে।'

আমি হেসে বললাম, 'তা যদি ওর ইচ্ছা হয়, বলে বেড়াতে পারে। হয়তো বিশ্বাস করবারও লোকের অভাব হবে না। তবু একটা আমাকে লিখতেই হবে, এবং রানীকে আমি বিশ্বাস করি।'

নীলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপরে বলল, 'কী জানি বাপু, যা ভাল বোঝেন করুন। তবে হ্যাঁ, আপনি পারেনও বটে! কী দিয়ে যে ওই মেয়েকে তুক করলেন, কে জানে।'

আমি ভুরু কাঁপিয়ে হেসে বললাম, 'সে সব সবাই কি জানে?'

নীলা হেসে চলে গেল। আমি চিঠি লিখতে শুরু করলাম। বন্ধুকে কিছুই গোপন করলাম না। সব কথা জানিয়ে, ওকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম।

চিঠি লেখা শেষ হতেই, ওদিকে রানীও তৈরি। সুরঞ্জন টিকিট টাকা, সব ব্যবস্থাই ইতিমধ্যে করেছে। আমি রানীর হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম, 'আমি দু'দিন গাড়িতে এসেছি, বড় ক্লান্ত। তা না হলে তোমার সঙ্গে ইস্টিশনে যেতাম।'

রানী বলল, 'না, আপনি বাড়িতেই থাকুন।'

গলা শুনে বুঝতে পারছি, ওর গলায় দলা আটকে যাচ্ছে। যেমন একটা সবুজ পাড় মিলের শাড়ি পরা দেখেছিলাম, এখনো তাই আছে। ক'দিন স্নান করে নি, কে জানে। চুলগুলো রুক্ষ, কবেকার একটা বিনুনি, সেটা এখন শিথিল। কপালের কাছে উড়ু উড়ু চুল। পায়ে একজোড়া সস্তা দামের স্যান্ডেল। সারা শরীরে সোনা বলতে দূরে থাক, এক টুকরো কাঁচের অলঙ্কারও নেই।

আমি বললাম, 'হাওড়া স্টেশন থেকে নেমে, চিঠির ওপরে যে ঠিকানা লেখা আছে, সোজা সেখানে চলে যেও। আমি তো এখন কিছুদিন আছি এখানে। কী হল না হল, এখানকার ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে জানিও।'

রানী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপরেই ও সুরঞ্জনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সুরঞ্জন বাধা দেবার সুযোগ পেল না। রানী তারপরে নীলাকে প্রণাম করল। নীলা সেরকম বাধা দেবার চেষ্টা করল না। ওর মুখখানিও এখন যেন গম্ভীর। রাণীর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছে। রুদ্ধস্বরে বলল, 'আমার ওপর রাগ করবেন না যেন।'

নীলা বলল, 'না না, রাগ করব কেন।'

নীলার মুখ এখন সত্যি ভার। তারপরে রানী আমাকে প্রণাম করতে এল। আমি ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম। বললাম, 'প্রণাম করতে হবে না রানী। তোমাকে আমি এমনি আশীর্বাদ করছি। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

কিন্তু! কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি? কে-ই বা শুনছে। রানী ওর কান্নাটা রোধ করতে পারল না। একেবারে ঝরঝরিয়ে দিল। গোটা শরীরটা থরথরিয়ে উঠল। নীলা হঠাৎ বাড়ির ভিতরে চলে গেল। জানি নীলা, কেন অমন করে তুমি ভিতরে চলে গেলে। তুমি না এই আপদ মেয়েটার জন্য কয়েক ঘণ্টা আগেও বড় বিরক্ত হচ্ছিলে, আর রাগ করেছিলে? এখন তাকে বিদায় দিতে গিয়ে তোমাকেও চোখের জল চাপবার জন্য আড়ালে চলে যেতে হয়।

মানুষের কোন পরিচয়-ই তার তাৎক্ষণিক আচরণ দিয়ে প্রমাণ হয় না। সুরঞ্জনের মুখের অবস্থাও সুবিধার না। নীলা যে কেন হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল, তা ও বুঝতে

পেরেছে। এখন হয়তো ওরও যেতে পারলে ভাল হত।

আমি রানীর হাত দুটো ধরে ওর মাথায় আর একটি হাত রাখলাম। বললাম, 'কেঁদো না রানী। একটু শান্ত হও, চোখ মোছ। তোমার গাড়ির আর বেশি দেরি নেই।'

সব কাজ তো আর তোমার কথায় হয় না। একটু কাঁদতে দাও। অন্ততঃ তোমার কাছে। জীবনে হয়তো এই প্রথম তোমার কাছেই মেয়েটি তার সমস্ত অন্ধকারকে তোমার সামনে হা হা করে খুলে দিয়েছে। এ কান্নাটা এখানে কারোকে ছেড়ে যাবার জন্য না। এ কান্নাটা ওর নিজের জন্য।

আমি সুরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রানী ইস্টিশনে যাবে কী ভাবে?'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার গাড়িতেই যাবে। ড্রাইভার ওকে পৌঁছে দেবে।'

সুরঞ্জনের ড্রাইভার আছে জানতাম না। আমি রানীকে বললাম, 'চল। গুরুচরণ, রানীর জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দাও।'

গুরুচরণ এগিয়ে এল। রানী বলে উঠল, 'না থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

গুরুচরণ থেমে একটু দ্বিধাভরে আমার দিকে তাকাল। সুরঞ্জন ধমকের সুরে বলে উঠল, 'আবার দাঁড়ালি কেন? নিয়ে যা।'

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি রানীর জিনিসগুলো তুলে দিল। জিনিস পত্র আর কী। সতরঞ্চির মধ্যে দড়ি দিয়ে বিছানা বাঁধা। আর একটা ক্যামবিসের ব্যাগ। যা সম্বল করে একটি তেইশ বছরের মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রানীর সঙ্গে আমি আর সুরঞ্জনও নীচে গেলাম। রানী গাড়িতে ওঠবার আগে রানীর হাতে টিকিট আর টাকা গুঁজে দিল সুরঞ্জন। নিজেই গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল, 'কিছু মনে করো না রানী।'

রানীর গলা শোনা গেল, 'কেন মনে করব দাদা।'

ও গিয়ে গাড়িতে বসল। সুরঞ্জন দরজা বন্ধ করে দিল। গাড়ি ছাড়বার আগে, রানী আমার দিকে তাকাল। গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমার চোখের সামনে রানীর মুখখানি ভাসতে লাগল। আর এই মুহূর্তে, রানীর চোখের জলে ভেজা মুখখানি মনে করে,

ওকে যেন কেমন, কালো করুণ শ্রীময়ী বলে মনে হল।

সুরঞ্জন ডাকল, 'চল, ঘরে যাই।'

আমরা দুজনে ওপরে উঠে এসে, বাইরের ঘরে বসলাম। সুরঞ্জন বলল, 'আশ্চর্য দেখ, সমস্ত ঘটনার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। এখন কী মনে হচ্ছে জান? রানীকে না হয় সিনেমায় নামানো যেত না। কলকাতা থেকে কত লোক তো আমার বাড়িতে আসে, থাকে, কিছুদিন বেড়িয়ে আনন্দ করে চলে যায়। রানীকেও যদি সেভাবে থাকতে বলতাম, ভাল হত।'

এখন সেই কথা মনে হচ্ছে সুরঞ্জনের। কিন্তু সেটাও ভুল মনে হচ্ছে ওর। আমি বললাম, 'সেটা বোধহয় ঠিক হত না। তা ছাড়া আসল ব্যাপার, তোমার আতিথ্যকে ও ঠিকমত নিতে পারত না। ওর সেই মন মেজাজই নেই। বাইরের থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।'

এই সময়ে নীলা বাইরের ঘরে এল। আমি হেসে বললাম, 'কী' চোখ ধুয়ে আসা হল?'

নীলা চমকে বলল, 'বা রে, চোখ ধোব কেন?'

'ও, তবে মুছে আসা হল?'

নীল মুখ ব্যাজার করে বলল, 'যান, ফাজলামি করবেন না।'

সুরঞ্জন ডাকল, 'এস নীলা, বস। লেখকের মুখ থেকে, রানীর ব্যাপারটা সব শোনা যাক। মেয়েটা যাবার সময় এমন মন খারাপ করে দিয়ে গেল।'

নীলা বসতে বসতে বলল, 'সত্যি। প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা ন্যাঁটা পাজী মেয়ে। যাবার সময় এমন কাঁদতে লাগল!'

নীলা আমার দিকে ফিরে বলল, 'কী হয়েছে ওর বলুন তো?'

আমি বললাম, 'ওর এখানে চলে আসাটা একটা দৈবাৎ ব্যাপার। ও যে যেতে চাইছিল না, তার কারণ ওর যাবার কোন জায়গাই নেই। ও হচ্ছে একটি বিতাড়িত মেয়ে। তোমাদের কাছে যেমন মনে হচ্ছিল অহেতুক বোঝা, আর একজনও সেইরকম বোঝা হিসাবেই ওকে ভাগিয়েছে। তবে সেটা আরো ভয়ঙ্কর আর বীভৎস। তোমাদের বোঝা মনে করা তো খুবই স্বাভাবিক।'

বলতে বলতে, রানীর সমস্ত ঘটনাটা আমি ওদের দুজনকে বললাম। শোনার পরে ওরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপরে নীলা বলল, 'মানুষ এমন কাজও করতে পারে?'

আমি বললাম, 'মানুষই পারে। মানুষ মহৎ নিকৃষ্ট, দুই-ই হতে পারে।'

সুরঞ্জন বলল, 'সত্যি। সাহিত্যিক, তুমি কি রানীর কথা কোনদিন লিখবে?'

আমি বললাম, 'তা কী করে জানব।'

সুরঞ্জন অন্যদিকে চোখ রেখে বলল, 'লিখো। লিখবে, আমি জানি কিন্তু লেখা পড়ে লোকে বুঝবে না, বাস্তব জীবন সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের থেকে কত বেশি বিস্ময়কর।'

আমি হেসে বললাম, 'সেই জন্যই তার উল্টো কথাটাই তোমাকে আমি বলতে চাই, পাঠক আবার অনেক সময় বই পড়ে একথাও বলে, জীবনে কি এরকম ঘটে? তারা অবাক হয়। মানুষ আসলে নিজেকেই চেনে কম। নিজেরই জীবন সম্পর্কে যখন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে সেটা গল্পে-উপন্যাসে স্থান পেতে পারে বলে সে ভাবতে পারে না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, শ্রীমান রণো এলেন। এসেই আমার দিকে চেয়ে বলল, 'নাহ্, কোথাও মন টিকল না। অনেক-দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। ভাবলাম, যাই কলকাতার গপ্পো শুনি গে।'

রণো ধপাস করে সোফার ওপরে বসল। নীলা উঠে চলে গেল। রণো বসেই ভুরু তুলে বাত দিল, 'তারপর, সেটি গেলেন কোথায়?'

সুরঞ্জনই জবাব দিল, 'রাণীর কথা বলছিস?'

রণোর জবাব, 'কে জানে কী নাম, ওসব মনে রাখতে পারি না।'

সুরঞ্জন বলল, 'এতক্ষণে বোধ হয় ওর ট্রেন ছাড়ল।'

'তার মানে?'

রণোর ভ্রূকুটি চোখে রীতিমত অবিশ্বাস আর বিস্ময়। আবার বলল, 'তার মানে আমাকে গুল মারা হচ্ছে?'

সুরঞ্জন বলল, শুধু শুধু গুল মারব কেন। সত্যি চলে গেছে, ওর গাড়ি ছাড়বার সময় পার হয়ে গিয়েছে।'

রণো একবার আমার দিকে তাকাল। আবার সুরঞ্জনের দিকে। আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী তুক্ করলি রে শালা, পীরিত?'

আমি হেসে বললাম, 'পীরিতি।'

রণো আবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, ব্যাপারটার সত্যা-সত্য বুঝতে চাইল। তারপরে একটা বিড়ি দাঁতে কামড়ে ধরে বলল, 'জানি, শালা ও ব্যাপারে তুমি সিদ্ধহস্ত। প্রেমিক নাগর আমার। চেহারাটা করেছে দেখ দিকিনি। কেষ্ট ঠাকুরের মত ভালগার, মেয়েরা দেখলেই পটে। তা, কী ধরনের পীরিত করলি?'

রণোর আবির্ভাবে, আর কথাবার্তায়, বিষণ্ণ আবহাওয়াটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। আমি জানি, রণো মুখে যা-ই বলুক, মনে ওর কৌতূহল। আর এও জানি, রানীর সামনে ও যত চোট-পাটই করে থাক, পুলিশের কথা বলুক, আসলে রানীর প্রতি সেটা কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ না। ওর এতদিন ধরে লেখা বা পরিচালিত যত নাটক, সবই রানীদের মত অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষদের নিয়েই। কিন্তু রানীদের মত মানুষেরা যখন এইসব জায়গায় ছুটে আসে বা এই ধরনের ভুল বা অন্যায় করে, তখন ওর রাগ হয়। আমি বললাম, 'এ ক্ষেত্রে যে ধরনের পীরিত দরকার, সেই রকমই করলাম।'

রণো বলল, 'তবু শুনি। গল্প শুনিয়ে, গুলবাজী করে ভোলালি, না কি বোন বললি, না মা বললি, না কি একেবারে ফাঁসিয়ে ছাড়লি? কী রে সুরঞ্জন, তুই বল্ না।'

সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে হাসি। হাসিটার ভঙ্গি ভাল না। বলল, আমরা কেউ-ই ছিলাম না ভাই, বলতে পারব না। তুমিও চলে গেলে, কেশব-বিধানও চলে গেল। তারপরে আমি আর নীলাও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় মনে হল রানী বোধহয় কাঁদছে, লেখক কী যেন বলছে।'

একে বলে পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলা। রণো ঠোঁট টিপে, ভুরু তুলে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ, এতখানি? তা কী দিয়ে খুঁড়লি বাবা যে, জল বেরিয়ে পড়ল? একটু বল্ না শুনি।'

আমি হেসে বললাম, 'কী আবার? রাণীর জীবনবৃত্তান্তটা জানা গেল। দুর্ভাগ্যের তাড়নায়, অন্ধের মত ছুটে এসেছে।'

রণো গম্ভীর মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'তা না হলে আর একটা বাঙালী মেয়ে, বম্বেতে ছুটে আসে ফিল্ম-এ নামবে

বলে! তাও আবার ওই চেহারা নিয়ে? কিন্তু তোর বাবা ধৈর্য আছে। কতক্ষণ ধরে কথা বললি?'

'তা ঘণ্টা দুয়েক নিশ্চয়।'

'উহ্, আমাকে যদি ওর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলতে হত, তাহলে ওর কপালে মার ছিল। আমার বাবা এত ধৈর্য নেই। ওই জন্য জীবনে কোনদিন শালা পীরিত করা হল না।'

কিন্তু রণো জানতে চাইল না, রানীর জীবনে কী ঘটেছিল। জীবনকে ও ভালই জানে। রানীর মত একটি মেয়ের জীবনের ঘটনা বা গল্প শোনার ওর দরকার নেই। ও সুরঞ্জনের দিকে ফিরে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তা, তোদের সেই ডিরেক্টর, মনিব, পরমগুরু জীবনকৃষ্ণ দাদাকে খবর দিয়েছিস?'

সুরঞ্জন বলল, 'দেব না? কীরকম দুশ্চিন্তায় ছিলেন।'

'তা ক্লেডিটটা নিজেই নিলি, নাকি আমাদের লেখকের কথা বললি?'

'লেখকের কথাই বলেছি।'

রণো আমার দিকে ফিরে বলল, 'তা হলে কিছু বেশি টাকা আদায় করে নিস। আসলে কী হয়েছে জানিস তো? কয়েকদিন আগে, ওদের স্টুডিওতে একটা মেয়েকে, ধর্ষণের পরে, অজ্ঞান অবস্থায় একটা শেডের পেছনে পাওয়া যায়।'

সুরঞ্জনের নিজের খেলায় হার। পাগলকে সে সাঁকো নাড়া দেওয়াতে চেয়েছিল। সাঁকো নাড়া লেগেছে, কিন্তু সেটা সুরঞ্জনের ডাঙায়, আমার না। রণোর কথা শুনে আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম।

সুরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বলল, 'স্টুডিওতে খালি তো আমরাই কাজ করি না। আরও অনেক পার্টি করে।'

রণোও ততোধিক গম্ভীর হয়ে বাজল, 'তা-জানি। আমি কি আর এ কথা বলেছি, তুই বা বিধান একটা অচেনা মেয়েকে রেপ্ করেছিস? ঘটনাটা তোদের স্টুডিওতে ঘটেছিল, সেটাই বললাম। সেই নিয়ে অনেক পুলিশি হুজ্জোত হয়ে গেল। তাই সামান্য রানীকে নিয়ে, জীবনকৃষ্ণদার মাথা খারাপ হবার যোগাড়।'

সুরঞ্জন আমার দিকে ফিরে বলল, 'মেয়েটা বাঙালী না। আশে-পাশেরই কোন গ্রাম থেকে বোধহয় এসেছিল। ঘটনাটা আমরা

জানলাম, যখন স্টুডিওতে পুলিশ এল। দেখলাম, মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্যও ভাল। কেউ স্বীকার করল না, মেয়েটি প্রথমে কার কাছে এসেছিল। কারোর কাছে নিশ্চয় এসেছিল। হাসপাতালে মেয়েটি সুস্থ হবার পরে, তাকে আবার স্টুডিওতে পুলিশ নিয়ে এসেছিল। স্টুডিওতে যে-সব প্রোডাকশনের অফিস আছে, অফিসের কর্মচারী আছে, টেকনিসিয়ানস্‌রা আছে, তাদের সবাইকে ডেকে ডেকে তাকে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা বলতে পারল না, কে তার সঙ্গে কথা বলেছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু স্টুডিওতে সে এসেছিল কেন?'

রণো নিভে যাওয়া বিড়িটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে, আমাকে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালা আবার ন্যাকা। সাতকাণ্ড রামায়ণের পরে সীতা কার বাপ! তোমার রানী গেছল কেন স্টুডিওতে?'

অন্যায় হয়েছে আমার। মনে ছিল না, রণদেব এখানে আছেন। যিনি রণ দিয়েই আছেন। রণে ভঙ্গ দিতে উনি কোনদিন শেখেন নি। কিন্তু হেথাকার মহারাষ্ট্রের গ্রামের কোন মেয়ে যে স্টুডিওতে আসতে পারে, রুপোলী পর্দায় ছায়াচারিণী হবে বলে, রণভীত এ অধম তা বুঝতে পারে নি। আমি বললাম, 'গ্রামের মেয়ে শুনলাম কী না। গ্রামের মেয়েও যে বায়স্কোপে নামবে বলে আসতে পারে, এটা বুঝতে পারি নি। যাই হোক, তারপরে শুনি।'

সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন বলল, 'মেয়েটির নিজের জবানীতে যা জানা গেছে, তা হল, ও ভয়ে ভয়ে স্টুডিওতে ঢুকে চারদিকে দেখছিল। কেউ কেউ ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা বলছিল না। জীবনে কোনদিন ও স্টুডিও দেখে নি, ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিল না, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে। বাগান, ঘর, গাড়ির যাতায়াত, এই সব দেখছিল। এ সময়ে, একজন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, সে কী চায়। তার খুব লজ্জা করলেও, সেই লোকটিকে সে তার মনের কথাটা বলে। তখন লোকটি তাকে স্টুডিও-চত্বরের নানান পথে ঘুরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে বসায়। সেখানে আরো একজন লোক নাকি ছিল। মেয়েটির কথা থেকে বোঝা যায়, আর একজন যে ছিল, সে দেখতে বেশ ভাল, সুপুরুষ যুবক, সিনেমার হিরোর মত দেখাচ্ছিল। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে, মেয়েটিকে কিছু খেতে দেওয়া হয়, তাকে আশ্বাসও দেওয়া হয়,

সিনেমায় নামানো হবে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। সারা দিনের কাজ শেষ। রাত্রের দিকে একটা ফ্লোরে কাজ ছিল, আমাদের না। টুকিটাকি কাজ, সেরকম ভিড় বা ব্যস্ততাও ছিল না। মেয়েটির জবানী হচ্ছে, তারপরে ওকে আরো কিছু খাবার দেওয়া হয়, সঙ্গে পানীয়। তারপরে লোক দুটি তাদের দাবী পরিষ্কার জানায়, এও বলে, এ দাবী না মেটালে তাকে সিনেমায় নামানো যাবে না।'

রণো বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট করেক্ট।'

সুরঞ্জন রণোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে কী?'

রণো দাঁতে আবার বিড়ি কামড়ে ধরল, গলায় তার রণো-রণো সুর, 'তার মানে শালা তোমাদের স্যো কল্ড ফিল্‌ম লাইনের ওটাই আদত।'

সুরঞ্জনকে এবার একটু গম্ভীর আর বিরক্ত মনে হল। বলল, 'তুই তা হলে কোন্ লাইনের লোক? তুইও তো ফিল্‌ম লাইনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস।'

রণোকে তাতে বাগে আনা যায় না, এক স্বরে, এক সুরে বচন দিল, 'সে কি শালা তোদের মত আপস করে ছবি করব বলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, না কি আমি তোদের স্যো কল্ড লাইনের লোক! তার চেয়ে বাবা স্বীকার কর না, তোদের যারা মহারথী, তারা এই লাইনটাকে পচিয়ে মারছে।'

সুরঞ্জনও এবার আপসে নেই, সে-ও জেদে বাত দিল, 'মানতে পারি না। খারাপ লোক সব লাইনেই আছে। তার জন্য লাইনের দোষ নেই, আর খারাপ লোকদের জন্য কাজও পড়ে থাকবে না। তা ছাড়া, জে. কে. প্রোডাকশনের নামে আজ অবধি কেউ একটা বাজে কথা বলতে পেরেছে?'

রণো বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মাথা খারাপ, জে. কে. হল প্রগ্রেসিভ প্রোডাকশন, বম্বেতে বাঙালীর ইজ্জত, নতুন থিয়োরি নিয়ে ভাবে —।'

সুরঞ্জন বলে উঠল, 'নতুন থিয়োরির কথা আমরা ভাবি না, ওসব হল তোর ব্যাপার।'

রণোর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। হাসিটা সব সময়েই যে রণ দেবার হাসি, তা না। নজর করে দেখ, রণো ভিতরে ভিতরে

মজাখোর আছে। সুরঞ্জনকে চটাতে পেরে রণবীরের এখন মেজাজ ধরেছে। সত্যি, ছোঁড়া পাজী আছে। আসলে আমি বাইরের লোক, ওদের বিবাদের তলায় তলায় যে-স্রোত বহে, সেটা আমাকে ধরতে দিতে চায় না। কানে যা শুনি, আসল বাত তা না। বাক্ তাল অন্য দিকে। এসব হচ্ছে, ফিল্ম জগতে, মতামতের লড়াই। নিজেদের ভিতরের ব্যাপার। তার মধ্যে যাকে বলে প্রতিষ্ঠা, সেটা এখনো রণোর জীবনে আসে নি। সুখের মুখ দেখেনি। সুখের মুখ দেখতে চায় বলে মনেও হয় না। কেন না কাজে আর মতে ও রণংদেহি। তা যেন হল, আমাকে গল্পটা শুনতে দিতে, রণোর রণবাজী কেন। বললাম, 'আচ্ছা হয়েছে বাবা, তোমাদের কথা-কাটাকাটি রাখ, ঘটনাটা আমি শুনি।'

রণো সঙ্গে সঙ্গে খাপ খুলে তৈয়ার। আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে, মুখ ভেংচে বলল, 'শালা মাছি পেয়েছে গুড়ের সন্ধান। রগরগে মাল ছাড়বে সাহিত্যের পাতায়। খবরদার, ঘরে বলছি, আলাদা কথা। আমাদের লাইনের যদি কুচ্ছো কর, বেড়ন দেব।'

আমার সঙ্গে সুরঞ্জনও এবার হাসে। এও আবার রণোর কথা। আমাদের কথা আমাদের, হাতাহাতি মারামারি, নিজেদের মধ্যে, তুমি কে হে।

কেউ না। রণো নিজেও জানে, তার বন্ধু কুচ্ছো গাইবার লোক না। আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন ধর্ষিতা মারাঠিনীর কিস্যায় ফিরে গেল। বলল, 'তারপরে আর কী, মেয়েটি তখন বুঝতে পারে, সে কাদের পাল্লায় পড়েছে। সে রাজী হতে পারে নি। তারপরই গোলমাল, জোর-জবরদস্তি। মেয়েটির ধারণা, সে ওদের সঙ্গে লড়তে পারত, কিন্তু আগে থাকতেই তার মাথা ঘুরছিল, গা-হাত পা ঝিমঝিম করছিল, পানীয়তে কোন গোলমাল ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কোন কেস্ হয় নি। মেয়েটির দেহাতের বাড়িতে খবর দিয়ে, ওর বাবাকে ডেকে এনে, তার হাতে মেয়েকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাপের সঙ্গে বাড়ি চলে গেছে।'

বলে, সুরঞ্জন গলার স্বর বদলে আবার বলল, 'আমার অবাক লাগে অন্য কারণে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে, বাপটাকে কান্নাকাটি করতে দেখে বুঝলাম, মেয়েটা যথেষ্ট আদরের। তবু সব ছেড়ে

দিয়ে, এমন ভাবে ছুটে চলে আসে কেমন করে ?'

রণোর মুখে বিকার, চোখ পাকিয়ে হাঁক দিল, 'বাপটা শালা কাঁদছিল ? আমি হলে, ওর ওপরে, মেয়েকে ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে নিয়ে যেতাম।'

আর সে ঠ্যাঙানিটা যে কি, তাও জানা আছে। অমন করে হারানিধি পেলে কেউ মারে, কেউ কাঁদে। আসলে প্রাণের তারটা বাজে এক জায়গাতেই। আমি ভাবি, সুরঞ্জনের কথা। যাদের রক্তের বীজে জন্মালে, ঘরে বাড়লে, তাদের সবাইকে ফেলে, রুপোলী ছায়া এমন করে টেনে আনে কেমন করে ? বুঝি, পরামর্শ দেবার মানুষের অভাব নেই। মন বলে কি কথা নেই ? অজানা বলে কি প্রাণে কোন ভয় নাই গো মারাঠা দেহাতিনী !

আছে, মন বলে কথা আছে, অচেনাকে ভয় আছে। তবু সেই যে এক কথা, আশা, সে যে মরীচিকা। রানীর কথা মনে পড়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের কূলেই সে স্বাদ পেয়েছিল, অপরূপ জলের রাশি লবণাক্ত। মারাঠা দেহাতিনী, আরব সাগরের রুপোলী জলের ঝলকানি দেখে, ছাতি-ফাটা তৃষ্ণায় ছুটে এসেছিল। ঝাঁপ দিয়ে দেখল, এ জলও নোনা, উপরন্তু উথালি পাতালি জলে আছাড়ি পিছাড়ি প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ছায়াকে যারা প্রাণ দেয়, সেই ছায়া যখন রুপোলী ছায়ায় নাচে আর করতালি বাজে, তখন সেই আলোর নীচে কত কালি থাকে, কে, জানে। কিন্তু রানী, মারাঠা দেহাতিনী বা গুরুচরণদের খবর কি কেউ রাখে ? রুপোলী ছায়ার চার পাশে যারা আর এক ছায়া হয়ে বেড়ায়। আরব সাগরে রুপো গলানো তরঙ্গেও বড় তিক্ত স্বাদ।

গায়ে ধাক্কা দিল রণো, ধমকে বাজল, 'শালা ধ্যানে বসেছে। বুজরুকি ছাড়, কী ভাবছিস বল্ দিকি নি ?'

বললাম, 'এই এদের এমনি করে ছুটে আসার কথা।'

রণো যেন ঠেক খেল, ভুরুতে বিদ্যুতের খেলা। একটু চুপ করে রইল, তারপরে নীচু স্বরে যেন দূরে থেকে বাজল, 'তবে যা-ই বলিস, যার যেখানে যাবার, সে এমনি করে ছুটেই যায়। আমরা সবাই ছুটেছি।'

বললাম, 'তোর কথা অস্বীকার করছি না, আমরা সবাই ছুটছি। এর সঙ্গে দরকার, নিজেকে ঠিক মত জানা, লক্ষ আর প্রেরণা।'

রণোর ভুরুতে তেমনি চিকুর হানাহানি, তারপরে বাজ-ডাকা স্বরে বলল, 'তা ঠিক, কেউ ভজে না জেনে, কেউ ভজে চোট্টামি করে। আমি ভজি শালা পীরিতে।'

একে বলে রণোর কথা। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'একটু চা হবে নাকি ?'

রণোর তাতেও সোজাসুজি, 'এখন চা হবে কেন, জিনিস নেই ?'

সুরঞ্জন যেন একটু বেকায়দায় পড়ল। আমার দিকে একবার দেখে বলল, 'থাকবে না কেন। ঠাণ্ডা হয়ে খেতে পারবি তো ?'

রণো চোখ উল্টে বলল, 'খাব গরম জিনিস, ঠাণ্ডা হয়ে থাকব কেন ?'

এমন কী খাবার যে, তার আবার ঠাণ্ডা গরমের ঝকমারি ? রণো আমার দিকে চোখ ঢুলুঢুলু করে হাসল। এটাও রণো পারে। আমাকেই কবুল করতে বলল, 'তুই-ই বল্ না ?'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'বস্তুটা কী ?'

'ন্যাক্কা !'

রণোর বিকারে। তারপরে উক্তি, 'জিনিস বললাম, তাও বুঝতে পারলি না ? ব্যাটা, কারণবারি কাকে বলে জানিস ?'

এই সময়ে সুরঞ্জন উঠে গেল। আমি অবাক হয়ে চমকে বললাম, 'মদ ?'

রণো ঘাড় নেড়ে জবাব করে, 'আজ্ঞে না, মাল।'

হাসি আর ধরে রাখা গেল না। বললাম, 'বম্বেতে এসেও, একটু বদলাস নি, সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীটি হয়ে আছিস। সেই বিড়ি খাচ্ছিস, সেই উড়ুনচণ্ডে চেহারা।'

রণো নাকের পাটা ফুলিয়ে জবাব দিল, 'বদলা-বদলির আর কী আছে। বদলাবার কারণই বা কী ঘটেছে ?'

রণো সোফার ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল। তাকিয়ে রইল ওপরের দিকে। দেখছি, ওর মন আর এখানে নেই। এখানকার বিষয়ে নেই। এখন ওর নিজের সঙ্গে কথা। কপালের ওপর রুক্ষ চুলের গোছা। ওর হাড়পুষ্ট মুখের কিছু অংশে আলো, কিছু ছায়ায়। আপসহীন লড়াইয়ে যে চলে! মদত দেবার মানুষ নেই। এমন একটা রাস্তা, কেউ এসে বিশ্বাস করে, টাকা দিয়ে, রাস্তা খুলে না দিলে, চলা বন্ধ্। ঘরে বসে নিঃসঙ্গ সেনাপতির মত কেবল, ময়দানের ছক তৈরি করা, কল্পনায় সৈনিক-সজ্জা। এখন দেখ, নিঃশব্দ মানুষটির মুখে কোন্ ভাবের খেলা। চেহারায় আচরণে বদলা-বদলির কী আছে। আসল বদলের ধ্যানে আছে, আশায় আছে।

এই হল আর এক রণো, রণেতে আছে। সুরঞ্জন এল, পিছে গুরুচরণ। তার হাতের ট্রে-তে পানীয়ের যাবতীয় সরঞ্জাম। সুরঞ্জনের প্রবেশ, রণোর আসন ছেড়ে উত্থান, তৎসহ সশব্দে হাই তুলে, হাত পা ছোঁড়া।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, বোস্।'

রণোর জবাব, 'না, যাই।'

সুরঞ্জন বলল, 'বাহ্, আনতে বললি যে?'

রণোর তেমনি ঠাণ্ডা জবাব, 'আনতে বলি নি তো। সন্ধ্যের পরে এখন তুই চায়ের কথা বললি, তা-ই বললাম। আমি শালা তোমার ও জিনিস আবার কবে খাই। ওসব লেবেল মারা জিনিসে আমার চলবে না। দিশি লোক, দিশিতেই আছি। আমার জিনিস এখন জুহুর বালির নীচে আছে।'

এবার আমিই অবাক স্বরে বাজি, 'জুহুর বালির নীচে আছে?'

'তুমি তো শালা জম্মো-ন্যাকা, জানবে কী করে? মোরারজী-দাদা এ দেশকে ভাল করবে বলে, শুকনো ডাঙা বানিয়েছে, জান না?'

'হ্যাঁ, তা তো জানি, ড্রাই—।'

হ্যাঁ, সুরঞ্জনের ঘরে যা দেখছিস, বিলকুল চোরাই মাল, বেজায় দাম। আর আমার জিনিস, দিশি লোক, দিশি জিনিস, জুহু সমুদ্রের ধারে বালির তলায় রেখে বসে আছে, এখন সেখানে যাব।

যাবি আমার সঙ্গে?'

আমার চোখে যেন একটু আলোর ঝিলিক লাগল। রণোর দিশি লোক, দিশি জিনিসের জন্য না। আরব সাগরের কূলে, জুহু সৈকতের ঝিলিক। সুরঞ্জনই তার আগে ঠেক দিল, 'আজ ছেড়ে দে রণো। লেখক দুরাত্রি জেগে এসেছে। আজ আর ওকে জুহুতে টেনে নিয়ে যাস না।'

রণো বলল, 'হ্যাঁ, লেখক তো আবার এখন তোর কেয়ার টেকারে, কিছু হলে, জীবনকৃষ্ণদাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। ঠিক আছে, আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে। কলকাতার কথা কিছুই হল না।'

বলে, আমার দিকে একবার চেয়ে, লম্বা হাতটা তুলে, বেরিয়ে গেল। সুরঞ্জন বলল, 'ব্যাটা বরাবর একরকম।'

কিন্তু রণোর বেরিয়ে যাবার মধ্যে, আমি যেন দেখতে পেলাম, গভীর চিন্তামগ্ন একটা অস্থির মানুষ। খানিকটা পথ হারানো অসহায়।

সুরঞ্জন আমাকে বলল, 'একটু চলবে তো?'

বললাম, 'যাতে হয় তো সইবে, আঁতে চাইছে না। কবে থেকে ধরলে?'

সুরঞ্জন পাত্র পূর্ণ করতে করতে বলল, 'ধরাধরি আর কী। বলতে পার, ছকে বেঁধেছি বাসা।'

কথার ধরতাই মিলল না, তাই সুরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সুরঞ্জন বলল, 'বুঝতে পারলে না? রামকৃষ্ণ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরক্ত হয়ে কী বলেছিলেন, মনে আছে তো, 'বাবা, যা খাচ্ছ, তারই ঢেঁকুর তুলছ?' আমারও সেই অবস্থা। যাদের সঙ্গে আছি, খাচ্ছি বসছি কাজ করছি কথা বলছি, তাদের মতই হয়েছি। কাজের পরে যাদের সঙ্গে ওঠা বসা, তাদেরই ছক ধরেছি।'

পাত্রে চুমুক দিয়ে বলল, 'তা বলে, সকলেই যে আমার মত হয়, তা না। জীবনকৃষ্ণদা স্পর্শও করেন না। বিধানও ওসবের মধ্যে নেই।'

এই বস্তুর প্রয়োজন কতখানি জানি না। যারা খায়, তাদের যুক্তি সংসার মানে না। একই বস্তু, সকলের বেলায় সমান না। কারোর কাছে আগুন, কারোর মৌতাত। যে-যেমন করে নেয়।

কারোকে পুড়িয়ে মারে। কারোকে রসিক করে। প্রয়োজনটা বোধহয় বড় কথা না। একে বলে নেশা। যে গ্রহণ করে, সে তার শরীর আর মন দিয়ে গ্রহণ করে। বর্জনের বেলাতেও তা-ই। ছুঁৎমার্গের কথা ছাড়, যাতে যার সাড়া।

তবে সাড়া থাকলেই ভাল। অসাড় হলেই কাল। অসাড় তো কেবল শরীরে না, মনেও বটে। যে-মন বাজে, বাজিয়ে শোনায়। রাঙিয়ে দেখায়। এক কথায় বল, প্রসব করে। তা-ই যদি অসাড় হয়, তবে বিষ বলি।

সুরঞ্জনের বেলায়, এ বস্তু মৌতাতের মধু হোক, তাই প্রার্থনা। আগুন যেন না হয়। নিজের কথা এখনো জানি না, বিচার ভবিষ্যতে।

নীলা এসে বসল একটি সোফায়। বোধহয় রান্নার তদারকে ছিল।

কবুল করা ছিল আগেই, এ কেবল আমার, 'মন চল যাই ভ্রমণে' না। তথাপি, ভ্রমণে আমার চিরদিনের সেই ঘরছাড়া নিখিলের ডাক, যেখানে আমার বিগ্রহেরা ফেরে নানা রূপের রঙে। তীর্থ যে আমার নানা জনপদে, মন্দির হর্ম্য থেকে মৃত্তিকা-কুটিরে, বিগ্রহ লক্ষ লক্ষ, রূপে সে বহু। এক সময়ে, চোখ বুজে মনে হয়, অরূপের আলোর ঝলক আমার চোখে।

তা বলে মিছেই কবুল করি নি। বলেছি, এ যদি আমার রথযাত্রার যাত্রা, তবে কলা বেচতেও আছি। রথ দেখার সঙ্গে আমার কলা বেচার জড়াজড়ি। আরো পোক্ষের করে বল হে, মহাপ্রাণীর দানা খুঁটে নেবে ঠোঁটে। ফেরীওয়ালার ডাক পড়েছে বোম্বাই নগরীতে, রূপোলী ছায়ার আসরে। আরব সাগরের রূপোলী তরঙ্গের ঝলক, চলকে চলকে, এ নগরখানিও রূপোলী। এ রূপোলী নগরের রূপের রোশনাই যত রূপোলী পর্দায়। সেথায় ছায়া হয়ে হাতছানি দেয় যত, বহুরূপী বহুরূপিণী। তাদের

রূপের রঙে, দুনিয়া আহা মরি!

পর্দায় যাঁরা ছায়াদের প্রাণদান করেন, তেমনি একজন জীবনকৃষ্ণ। বঙ্গের এই ফেরীওয়ালাকে ডেকে এনেছেন তিনি। অতএব, এক রাত্রি পার হতে, কলা বেচার শুরু। দু-দিন কেটে গেল জীবনকৃষ্ণদার সঙ্গে, কাজের কথায়, আলোচনায়। এ তো আর যেমন তেমন কাজ না, ফেরীওয়ালার মাল কেমন, বাজারদাম কেমন, সেই হিসাবে দরদস্তুর করা আছে। তবে কী না, ক্রেতাদের চাল বরাবরই একটু ভার ভারিক্কি। বিক্রেতা হাত কচলে, দুঃখের হাসিটা লাজে লাজানো করে, 'বাবু আর দু পয়সা বেশি দেন। দশ জনে মিলে বানাই নি গো, একা ঘরে একলা। মজুরির হ্যাপা ডেকে দেখাতে পারি নি। কেন না, এ মজুরি হাতে দাঁতে না, আঁতে মাথে একলা।'

সে যাই হোক, দর-দস্তুরেই সব শেষ না। তারপরে আছে দলিল-দস্তাবেজ। ফাঁকি-ঝুঁকির কারবার না, রীতিমত লেখাপড়া চুক্তির ব্যাপার। ঘামতেল মাখা হয়ে যাবার পরে, পিতিমে খানি দেখতে বড় সোন্দর। কিন্তু তার আগে কাদা কচলানি দেখেছ তো? তারও আগে, বাঁখারি আর খড়ের বাঁধন আছে। তখন মনে হয় না, এত হন্দ কর্ম করে, এত খড় বাঁখারি কাদার দলার ওপরে, ঝকঝকে প্রতিমাখানি জেগে আছে। সংসারের তাবত কাজের এই নিয়ম। তেতো পোড়া দিয়ে শুরু মিঠিতে শেষ। তবে হ্যাঁ, যদি মিঠে থাকে!

তবে সৎ লোকের সঙ্গে কারবার, জীবনকৃষ্ণদা মানুষটি ভাল। সজ্জন, স্বল্পভাষী, অমায়িক, আপন ভাবেতে আছেন। নাম-ডাকের সঙ্গে, পাল্লা দেওয়া গৃহখানি চোখ জুড়ানো। ধনীর ধন দেখলে মন আর চোখ একটু ছম-ছম করে। রণো হলে অন্য কথা বলত। আমার মত ফেরীওয়ালা তা বলতে পারে না। আর, জীবনকৃষ্ণদার নাম জগৎজোড়া। ফেরীওয়ালাকে এখানে, নিজের সৌভাগ্য মেনে, সব থেকে কম দরে বিকিয়ে, সব থেকে সেরা হাসিটা হাসতে হয়। সংসারের এও এক অমোঘ নিয়ম।

তা হোক, যাঁর সঙ্গে কারবার, ফেরীওয়ালার সঙ্গে তাঁর আঁতের মিল হলেই, দাঁত দেখাতে রাজী। জীবনকৃষ্ণদার সেটুকু আছে। পেট একটু কম ভরেছে, জাতটুকু আছে পুরোপুরি। এমন না

যে, পেট ভরল না, জাতও গেল। তা ছাড়া এই ফেরীওয়ালার খুশি আর ধরে না, আর এক কারণে। মনে মনে তাজ্জব, দু চোখে আর বিস্ময় ধরে না! জীবনকৃষ্ণদার দরবারে দেখ, যত রুপোলী সংসারের ফুলটুসি ফুলকুমারী, বহুরূপী রূপকুমারেরা! এঁরা যে রক্ত-মাংসের মানুষ-মানুষী, সে কথা আবার কবে ভেবেছিলাম হে!

কেবল দেখা না, আলাপও বটে! যেখানে সেখানে না, আরব সাগরের রুপোলী কূল বলে কথা। এখানকার ফুলকুমারী রূপকুমারদের কথা আলাদা। ছায়াদের কায়ায় দেখব, আগে ভাবি নি। চোখে যখন দেখি নি, তখনই বাঁশির সুরে কত কিস্‌সা শুনেছি। এ'তে ও'তে শিরিঁ-ফরহাদ প্রেম, কা'তে কা'তে নাকি লয়লা-মজনু পিরীতি। শুধু সেই কিস্‌সা কহানিতেই নাকি রুপোলী জগতের বেলা কেটে যায়, নায়ক-নায়িকাদের প্রেম জর-জর দিল্‌, কর্মীদের হাল হাপিস করার দাখিল। সেই যে কী বলে ভিন্‌দেশি কথায়, যার নাম 'রোমান্স'—কুমার-কুমারীদের সেই রোমান্স নিয়ে, হেথায় ফিস্‌ফাস্‌, হোথায় গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর। যাদের তাদের কথা তো না, রুপোলী সংসারের নায়ক-নায়িকাদের কথা।

কেবল রুপোলী সংসারের নানা কর্মীদের কেন টানাটানি। ইস্টিশনের প্লাটফরোমে, রাস্তা রাস্তা কে কিনারে, জুতা সাফাই-ওয়ালা ছোকরাদের বয়ান শোন গিয়ে, ঘর ঘর মে, দপ্তর দপ্তর মে, যেথায় তোমার প্রাণ চাহে, ছোকরা-ছুকরিদের গাল গপ্পো গুল্‌জারি শোন গিয়ে, এক কথা। রুপোলী নায়ক-নায়িকাদের প্রেম-কথা, অমৃত সমান। তবে এ কথা বললে শুনব না, এ কিস্‌সায় গুলজার কেবল বুম্‌বই, কলকাতার রুপোলী জগতেও এখানকার কথা, এদের আলোচনা। অনেক শুনেছি।

সেই তানারা এখন আমার সামনে বসে। কেবল দেখাদেখি না, বাত পুছ কত রকমের। ছেলেবেলায়, রুপোলী জগৎখানি ছিল রূপকথার জগৎ। তার নায়ক-নায়িকারা সোনার জলে চান করে, সোনার থালে খায়। কত কল্পনা। এখন সামনা-সামনি তাদের দেখেও আমার পেত্যয় যায় না, সত্যি রক্ত-মাংসের মানুষ কী না! যা বল, তা বল, তোমাকে মানতে হবে, সত্যি এরা রূপবান,

রূপবতী, ভাষণে মিষ্টি। কারোর কারোর জ্ঞান-গম্যি রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কথা বলে সুখ, মিশলে মেজাজ আসে। রূপ-কুমারীরা শত হলেও মেয়ে। তাদের বাত-পুছ একটু কম সম্‌। রূপ থাকলেও তার ঝালটাও একটু বেশি, বিশেষ রুপোলী জগতের তারা ফুলটুসি। কিন্তু কুমারদের কথা আলাদা। আলাপের প্রথম ধাপেই, তোমাকে বন্ধু বলে ডাক দিতে পারে।

এ সব দেখে-শুনে, আমার গুমোর হবে, এ আর আশ্চর্য কী। সহজে আমার গ্যাদা ঘোচানো যাবে না। সবাই যাদের ছায়া দেখেছে, কায়া-কল্পনায় মস্‌গুল, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা খানা-দানা বাত-পুছ, এ বড় আত্মসুখ। বিশেষ, লাখ টাকার কমে যাদের ঠোঁট নড়ে না, চোখের পাতা নাচে না, আট-দশ লাখে কিংবা তার বেশিতে পুরোপুরি খেলে, তাদের দেখাটাও জীবনে একটা অভিজ্ঞতা বটে!

ভেবেছিলাম, জীবনকৃষ্ণদার কাজ দু দিনেই হবে। তা না, কলা বেচায় আর একটু বেশিই লাগল। আলোচনা আর শেষ হতে চায় না। এদিকে যত আলোচনা, ওদিকে তত আলাপ-পরিচয়, নয়া নয়া মানুষের সঙ্গে। ইতিমধ্যে রণোর দেখা পাওয়া যায় নি। কিন্তু কলকাতার আরো কিছু পুরনো মুখের দেখা মিলেছে। তার মধ্যে এক পুরনো বন্ধু বিমান। সেই যাকে বলে 'টাইপ', তা-ই। রণো একদিকে, বিমান আর একদিকে।

রণোর স্বপ্ন ছবি, নিজের মনের মত। বিমানের স্বপ্ন গল্পে, ওর নিজের বচনে, 'শালা এমন গল্প ছাড়ব, পর্দা ফেটে যাবে।'

এর পরে আর বলবার মত কথা থাকে না। আরক্তচক্ষু বিমান যেন টগবগিয়ে ফুটছে, কথার আর শেষ নেই। মানুষটাও ছোট-খাটো, হাতে-পায়ে যেন যন্ত্র লাগানো, সর্বদাই তা চলছে। মানুষটাকে দেখলে, আর গলার স্বর শুনলে, মেলানো দায়। গলার স্বর শুনলে মনে হবে, অট্টহাস্যের অরণ্যের তান্ত্রিক, বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার হুঙ্কার। এর মধ্যেই যখন চোখে মুখে হাসির ঝলক লাগে, তখন মনে হয়, দুখুচেটে শিশু একটা।

জীবনকৃষ্ণদার স্টুডিওর অফিসে বসেই কথা। ভয়ে ভয়ে বিমানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতায় তো লেখা-টেখা চলছিল মন্দ না, এখানে চলে এলে কেন হঠাৎ?'

বিমান একেবারে ব্যোম্‌কে উঠল, 'হঠাৎ ? শালা ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই। তোমাদের কলকাতাকে চিনতে আর আমার বাকী নেই। খালি বড় বড় কথা, ওদিকে ছুঁচোর কেত্তন। দূর দূর !'

বিমানের কলমের ঝোঁকটা একপেশে, কিন্তু সেদিকে জোরটাও নেহাত কম না। তবে কলকাতার যে-জগতের সঙ্গে ওর কলমের যোগাযোগ, সে জগৎটা আমার তেমন চেনাশোনার মধ্যে পড়ে না। সেটাও কলকাতার রূপোলী জগতের চৌহদ্দির মধ্যে। কথার প্রতিবাদ করার সাহস আমার নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, 'তা এখানে ভাতের হালটা কেমন ?'

বিমানের জবাব, 'মুদ্দোফরাসের মতন। তবে কলকাতা তো না। এখানে শালা মুদ্দোফরাস হলেই বা বিমান বাম্‌নাকে কে দেখছে।'

কথাটা শুনলাম এক রকম, তথাপি কৌতূহল ঘুচল না। বিমানের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বুঝতে পারলি না ? বোম্বাই ফিল্মি সংবাদ আর কেচ্ছা লিখে পাঠাই কলকাতার কাগজে।'

সেই কলকাতাই ! কিন্তু খবরদার, সে কথাটি বলতে যেও না। কেবল জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তাতে কি চলে ?'

'মাথা খারাপ ! শালা ধোঁয়ার খরচ ওঠে না।'

'তবে ?'

'ওই জীবনকৃষ্ণদা কিছু দেন মাসে মাসে।'

শোন এবার বাত। বলি, 'তা হলে জীবনকৃষ্ণদার ইউনিটেই—'

বিমান সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে হাঁকে, 'না না, ইউনিট ফিউনিট না। মাঝে মাঝে গল্প-টল্প মাথায় এলে লিখে দিই। কিন্তু হবে না কোনদিন, জানি।'

'কেন ?'

'কেন আবার, বিমান বাম্‌নার গল্প ছবি করতে হলে শালা ধক্‌ চাই, ধক্‌ বুঝলি ? এ কি তোর মত মিঠে মিঠে গল্প ?'

দোহাই, আর নিজেকে নিয়ে টানাটানিতে যেতে চাই না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণদার ধক্‌ নেই, তবু কিছু যোগান তো দিয়ে যাচ্ছেন। বিমান ব্রাহ্মণ তার কাজ চালিয়ে যাক না। ওর হাল হদিস যতটুকু

জানা আছে, তাতে পরিবার-পরিজনের কেউ ওর প্রত্যাশী না। ওর বাবা-মা কেউ কলকাতার বাসিন্দা না, গ্রামে বসত। সম্পন্ন গৃহস্থ। বিমান বোম্বাই কলকাতা ছেড়ে, সেখানে গিয়ে থাকলেও, খেয়ে-পরে ওর জীবনটা কেটে যাবে। এমন কি, ছাঁদনাতলা চষে, বামে একটি বামা থাকলেও। কিন্তু সে সব কথা বলবে কে ! মন গুণে যে ধন। মাথায় রয়েছে, পর্দা ফাটাবে !

তবে মাথায় কি আর এমনি এমনি রয়েছে। এর পিছনে যে, অনেক দিবা, অনেক নিশির চিন্তা আর শ্রম রয়েছে। পর্দা কি আর সত্যি ফাটবে ! কিন্তু থোড় বড়ি খাড়া আর না। পর্দায় নতুন গল্পের জন্ম হবে, এই আকাঙ্ক্ষা। সেই খুকি রাধে, খোকা খায়, খুকি কাঁদে, খোকা জপায়, এমন গল্প আর না। এই হল বিমানের কথা। একা বিমান না, হয়তো আজকের অনেকের মনের কথা। তবে বিমানের বলার রকমটা আলাদা, ভঙ্গিতে জোড়া পাবে না। তার জন্য বম্বে আসার দরকার ছিল কী না, এ কথা পুছ করি, তেমন সাহস আমার নেই। বাংলায় যার কদর নেই, তাকে এই নগরী নেবে ?

নেয় নি, এমন বলব না। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার, কফি-ঘরের সেই মুখচোরা লাজুক ছেলেটির কথা মনে পড়ে। সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী, একদল বন্ধুর সে পালের গোদা। গল্পে-সাহিত্যে নতুন রীতি-প্রকরণ নিয়ে তার মাথা-ব্যথা। বিশেষ করে ছোট গল্পের আন্দোলন। যত দূর মনে পড়ে, সে পত্র-পত্রিকাও চালাত। তারপর কবে কোন্‌ এক লগ্নে সে এল এই নগরীতে। বিমানের মত পর্দা ফাটাবার পাগলামি তার নেই। কিন্তু সে পর্দা কাটিয়ে চলেছে। আরব সাগরের পারে, রূপোলী জগতের হাল-হদ্দ তার জানা। এখানে কোন্‌ রঙের কী রোশনাই, সে রহস্য তার জানা। রূপোলী পর্দার ভেল্‌কি সে জানে। তবে হ্যাঁ, বিমানের সঙ্গে তার মূলে জাত আলাদা। এ নগরীর রূপোলী পর্দার চাবি-কাঠি তার হাতে আছে। বিমান এই চাবিকাঠিটার খোঁজে নেই। বিমান নয়া চাবিকাঠি গড়ার তালে আছে। একমাত্র এই নগরীর রূপোলী পর্দার দেবতা জানেন, বিমানের দ্বারা তা কখনো ঘটবে কী না।

তবে আমাকে কবুল করতে হবে, রণো বিমানদের ভবিষ্যতে কী

বিমান একেবারে ব্যোম্‌কে উঠল, 'হঠাৎ ? শালা ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই। তোমাদের কলকাতাকে চিনতে আর আমার বাকী নেই। খালি বড় বড় কথা, ওদিকে ছুঁচোর কেত্তন। দূর দূর!'

বিমানের কলমের ঝোঁকটা একপেশে, কিন্তু সেদিকে জোরটাও নেহাত কম না। তবে কলকাতার যে-জগতের সঙ্গে ওর কলমের যোগাযোগ, সে জগৎটা আমার তেমন চেনাশোনার মধ্যে পড়ে না। সেটাও কলকাতার রূপোলী জগতের দৌহিদ্দির মধ্যে। কথার প্রতিবাদ করার সাহস আমার নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, 'তা এখানে ভাতের হালটা কেমন ?'

বিমানের জবাব, 'মুদ্দোফরাসের মতন। তবে কলকাতা তো না। এখানে শালা মুদ্দোফরাস হলেই বা বিমান বাম্‌নাকে কে দেখছে।'

কথাটা শুনলাম এক রকম, তথাপি কৌতূহল ঘুচল না। বিমানের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বুঝতে পারলি না ? বোম্বাই ফিল্মি সংবাদ আর কেচ্ছা লিখে পাঠাই কলকাতার কাগজে।'

সেই কলকাতাই! কিন্তু খবরদার, সে কথাটি বলতে যেও না। কেবল জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তাতে কি চলে ?'

'মাথা খারাপ! শালা ধোঁয়ার খরচ ওঠে না।'

'তবে ?'

'ওই জীবনকৃষ্ণদা কিছু দেন মাসে মাসে।'

শোন এবার বাত। বলি, 'তা হলে জীবনকৃষ্ণদার ইউনিটেই—'

বিমান সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে হাঁকে, 'না না, ইউনিট ফিউনিট না। মাঝে মাঝে গল্প-টল্প মাথায় এলে লিখে দিই। কিন্তু হবে না কোনদিন, জানি।'

'কেন ?'

'কেন আবার, বিমান বাম্‌নার গল্প ছবি করতে হলে শালা ধক্‌ চাই, ধক্‌ বুঝলি ? এ কি তোর মত মিঠে মিঠে গল্প ?'

দোহাই, আর নিজেকে নিয়ে টানাটানিতে যেতে চাই না। কিন্তু জীবনকৃষ্ণদার ধক্‌ নেই, তবু কিছু যোগান তো দিয়ে যাচ্ছেন। বিমান ব্রাহ্মণ তার কাজ চালিয়ে যাক না। ওর হাল হদিস যতটুকু

জানা আছে, তাতে পরিবার-পরিজনের কেউ ওর প্রত্যাশী না। ওর বাবা-মা কেউ কলকাতার বাসিন্দা না, গ্রামে বসত। সম্পন্ন গৃহস্থ। বিমান বোম্বাই কলকাতা ছেড়ে, সেখানে গিয়ে থাকলেও, খেয়ে-পরে ওর জীবনটা কেটে যাবে। এমন কি, ছাঁদনাতলা চষে, বামে একটি বামা থাকলেও। কিন্তু সে সব কথা বলবে কে! মন গুণে যে ধন। মাথায় রয়েছে, পর্দা ফাটাবে!

তবে মাথায় কি আর এমনি এমনি রয়েছে। এর পিছনে যে, অনেক দিবা, অনেক নিশির চিন্তা আর শ্রম রয়েছে। পর্দা কি আর সত্যি ফাটবে! কিন্তু থোড় বড়ি খাড়া আর না। পর্দায় নতুন গল্পের জন্ম হবে, এই আকাঙ্ক্ষা। সেই খুকি রাধে, খোকা খায়, খুকি কাঁদে, খোকা জপায়, এমন গল্প আর না। এই হল বিমানের কথা। একা বিমান না, হয়তো আজকের অনেকের মনের কথা। তবে বিমানের বলার রকমটা আলাদা, ভঙ্গিতে জোড়া পাবে না। তার জন্য বম্বে আসার দরকার ছিল কী না, এ কথা পুছ করি, তেমন সাহস আমার নেই। বাংলায় যার কদর নেই, তাকে এই নগরী নেবে ?

নেয় নি, এমন বলব না। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার, কফি-ঘরের সেই মুখচোরা লাজুক ছেলেটির কথা মনে পড়ে। সাহিত্য আন্দোলনে অগ্রণী, একদল বন্ধুর সে পালের গোদা। গল্পে-সাহিত্যে নতুন রীতি-প্রকরণ নিয়ে তার মাথা-ব্যথা। বিশেষ করে ছোট গল্পের আন্দোলন। যত দূর মনে পড়ে, সে পত্র-পত্রিকাও চালাত। তারপর কবে কোন্‌ এক লগ্নে সে এল এই নগরীতে। বিমানের মত পর্দা ফাটাবার পাগলামি তার নেই। কিন্তু সে পর্দা কাটিয়ে চলেছে। আরব সাগরের পারে, রূপোলী জগতের হাল-হদ্দ তার জানা। এখানে কোন্‌ রঙের কী রোশনাই, সে রহস্য তার জানা। রূপোলী পর্দার ভেল্‌কি সে জানে। তবে হ্যাঁ, বিমানের সঙ্গে তার মূলে জাত আলাদা। এ নগরীর রূপোলী পর্দার চাবি-কাঠি তার হাতে আছে। বিমান এই চাবিকাঠিটার খোঁজে নেই। বিমান নয়া চাবিকাঠি গড়ার তালে আছে। একমাত্র এই নগরীর রূপোলী পর্দার দেবতা জানেন, বিমানের দ্বারা তা কখনো ঘটবে কী না।

তবে আমাকে কবুল করতে হবে, রণো বিমানদের ভবিষ্যতে কী

আছে, জানি না। ওরা আর-এক নয়া জমানার স্বপ্নে আছে। তাতে রুপোলী পর্দা কাপড়ের পর্দা হয়ে দেখা দেবে কী না, কে জানে। একটা চেহারা হয়তো বদলাবে।

বিমান ওর আরক্ত চোখ ঘুরিয়ে, আর নিজের উরুতে চাপড় মেরে বলল, 'তবে জীবনকৃষ্ণদাকে গল্প নিইয়ে ছাড়ব, দেখিস।'

মহাদেবকে ঠাণ্ডা করা ভাল। বললাম, 'তা তুই পারবি।'

বিমানের জিজ্ঞাসা, 'বলছিস?'

বললাম, 'আমার তো তা-ই বিশ্বাস।'

বিমান হো হো করে হাসতে লাগল। ও হাসিকে বলে ক্ষ্যাপার হাসি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত হাসির কী হল?'

বিমানের এমনিতেই চোখ আরক্ত। হাসতে গিয়ে গোটা মুখ। অন্য ঘর থেকে সুরঞ্জন আর বিধান এসে হাজির। এমন অট্টহাসি শুনলে, না এসে উপায়ই বা কী। জীবনকৃষ্ণদার অফিসে বসে আমারই আড্ডা অবশ্য। ভাগ্য ভাল, জীবনকৃষ্ণদা তখন ফ্লোরে গিয়েছেন কাজ করতে।

সুরঞ্জন বলল, 'হল কী, পেটে কিছু পড়েছে নাকি?'

বিমান আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এর কথা শোন্ মাইরি, ওর নাকি বিশ্বাস, জীবনকৃষ্ণদা আমার গল্প নিয়ে ছবি করবে।'

সুরঞ্জন একবার আমার দিকে দেখল। তারপরে বিমানের দিকে। সুরঞ্জন বলল, 'ওর যা বিশ্বাস, তাই বলেছে। তাতে অমন ডাকাতে হাসির কী আছে?'

বিমান ওদের দিকে আর তাকাল না। আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে, চোখ ঘোরাল, বলল, 'জীবনকৃষ্ণদা আমাকে কী বলেন জানিস?'

'কী?'

'আমার মধ্যে নাকি অভিনয়ের গুণ আছে। তাই উনি এখন, আমাকে দিয়ে, অভিনয় করাতে চান।'

কেন জানি না, আমার চোখের সামনে, জীবনকৃষ্ণদার অমায়িক মুখখানি ভেসে উঠল। যদি কারণ জিজ্ঞাসো, বলতে পারব না। বিমান আমার ঘাড়ে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'কি বুঝলি?'

আমি নিরীহ সুরে জ'ব করলাম, 'কলম ছেড়ে অভিনয়।'

'সেটা তো ব্যাটা সোজা কথা, তা ছাড়া?'

তা-ই তো, বিমান যে ভাবনায় ফেলল। আমি কি এখানকার সব ব্যাপার বুঝি? আমি প্রতিধ্বনি করি, 'তাছাড়া?'

বিমান বলল, 'টোপ'।

'টোপ?'

'হ্যাঁ, আপদটাকে বসিয়ে খাওয়াবেন কতদিন? তা-ই এই টোপ, বুঝলি? যদি গেলানো যায়, ফতে। পর্দা ফাটাব ভেবেছিলাম, কলম দিয়ে। এর পরে ভাঁড়ামি করে।'

'ভাঁড়ামি কেন?'

'তবে আর তোকে বলছি কী। আমি যদি অভিনয় করি, সেটা ভাঁড়ামি ছাড়া কী হবে? তবে হ্যাঁ, ওই যে কী বলে, কমেডিয়ান বলে চালানো যাবে।'

বলে, বিমান আবার হাসতে লাগল। অট্টহাসিটা যত জোরেই বাজুক, কোথায় যেন একটা অসহায়ের সুর তাতে জড়ানো। হয়তো সত্যি, কলকাতার লোকে একদিন দেখবে, বিমান এই নগরীর রুপোলী পর্দায়, ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তখন সকলে হয়তো হাততালি দিয়ে হাসবে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আমার হাতেও কি তখন তালি বাজবে!

বিমানের সামনে বসে, এই মুহূর্তে হয়তো মনে হচ্ছে, বাজবে না। কিন্তু অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের, সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকারের কথা কে বলতে পারে? রুপোলী জগতের ইন্দ্রজাল, তার অনেক ভেলকি। হয়তো সেদিন, আমার হাতেও তালি বাজবে। লেখক বন্ধুকে পর্দার বুকে, বিদূষকের ভূমিকায় দেখে, হয়তো আমিও তখন হেসে বাজব, হাততালিতে বাজব। দেখব, আমার বন্ধু আজকের মতই অট্টহাসে, পর্দায় বাজবে। এই অট্টহাসির সঙ্গে একটা অসহায় করুণ সুরের সঙ্গত শুনতে পাচ্ছি, তখন হয়তো তাও শুনতে পাব না।

এই মুহূর্তে বিমানের দিকে চেয়ে মনে হল, রণোর আর এক পিঠ। বিড়ির বদলে, গোদা চুরুট মুখে। ঢলঢলে প্যাণ্ট পেটকোমরে চওড়া বেল্ট দিয়ে বাঁধা। জামাটাও সেই পরিমাণে মোটা আর ঢলঢলে। আরব সাগরের কূলে, বোম্বাই নগরী বলে কথা। সেখানে এমন বেচালে কি চলে? তাও আবার রুপোলী জগতের আওতায়? যাদের পোশাক-আশাক চুল-ফেরতা, সবাই হাতাবার

তালে থাকে।

বিমান হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী রে ধ্যানে বসলি যে।'

চমকে উঠে হেসে বাজি, 'না না।'

বিমানের গলায় এবার অন্য সুর। আমার হাতটা ধরে বলল, 'তবে দ্যাখ্ লেখক, তোকে কিন্তু সত্যি গালি দিই নি। জীবনকৃষ্ণদা তোর যে-গল্পটা নিয়েছেন, ওটা সোনার হাতে লেখা।'

লজ্জা লজ্জা লজ্জা। বিমান আবার এমন সুরে, এমন কথায় ভাবে কেন? তাড়াতাড়ি বলি, 'সোনার হাতে লিখতে চাই না।'

'কিন্তু লেখাটা সোনার মতন। দে, হাম খাই।'

বলে, আমার হাতটা টেনে, প্রায় হাম-ই খেল। এমন সশব্দ দম্ দম্ চুম্বন, এ বয়সে আর জোটে নি। তারপরেই বিমানের বয়ান, 'এবার চল্, আমাকে আজ খাওয়াবি।'

ধরতাই ধরতে না পেরে, আমি আওয়াজ দিই, 'অ্যাঁ?'

বিমানের জবাব, 'অ্যাঁ নয়, তুমি ব্যবসা করেছ, খাওয়াবে চল। তারপর রাত্রে তো হাত পুড়িয়ে রান্না আছেই।'

সুরঞ্জন বলে উঠল, 'তা কী করে হবে। ও তো এখন আমার সঙ্গে বাড়িতে খেতে যাবে।'

বিমান বলল, 'তোমার বাড়িতে তো চব্য-চোষ্য রোজই হচ্ছে। আজ বাইরে, আমার হবে। তুমি তোমার বউকে টেলিফোনে জানিয়ে দাও।'

আমি সুরঞ্জনের দিকে চেয়ে বললাম, 'সেই ভাল। নীলাকে জানিয়ে দাও, তুমিও চল।'

সুরঞ্জন আমার চোখের দিকে একবার দেখল। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। আমি বিমানকে বললাম, 'রণোকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ওকেও ডেকে নিলে হয়।'

বিমান আরক্ত চক্ষু পাকিয়ে বলল, 'না না, খালি বিড়ি ফুকবে আর খিস্তি করবে, ও ব্যাটাকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

এ আবার কেমন কথা। বিমান দু চক্ষে দেখতে পারে না রণোকে? বিধান বসে বসে এক গাদা নেগেটিভ চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। সে বলল, 'দেখিস রে বিমান, রণোর কানে যেন আবার একথা না যায়।'

বিমান প্রায় তড়পে উঠে, 'গেলেই বা, ওকে কি আমি ভয় পাই?'

বিধান নেগেটিভ থেকে চোখ না সরিয়েই বলে, 'ওটাকে ভয় বলে, না কি আর কিছু বলে, তা আমি ঠিক জানি না।'

'জেনে তোমার দরকারও নেই। যা করছ, তা-ই কর।'

বলে, বিমান মুখে একটি মুলোর মত চুরুট গুঁজে দিল। তাতে আগুন ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসল। আমি রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বিমানের কথা থেকে এইটুকু অনুমান করা গেল, রণোকে তার মোটেই পছন্দ না। কলকাতায় থাকতে এমনটি দেখি নি। এ নগরীতে হাল-চালই আলাদা। এখানে এসে রণো বিমানে ছাড়াছাড়ি।

রথ দেখার সময় যখন এল, তখনই একদিন রণো টেনে নিয়ে গেল ওর কোম্পানীর কর্তার কাছে। এই নগরীর রুপোলী জগতের যদি ডাকসাইটে কোন কোম্পানী থাকে, তবে, রণোকে যে কোম্পানী বেঁধে রেখেছে, সেটাই। কোম্পানীর নামে ডাকে গগন ফাটে। জগৎ-জোড়া তার পরিচয়।

কোম্পানীর মালিক নাকি হেলাত বেলাত করে বেড়ান, গায়ে হাওয়া দিয়ে। যা কিছু ক্রিয়া-করণ-পরিচালন, সবই এক এই নগরীর প্রবাসী বঙ-আলী, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়। বলতে গেলে, তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। মহাশয়ের নাম শুনেছি ইতিমধ্যেই। কিন্তু এত বড় মানুষের কাছে, রণো কেন আমাকে নিয়ে যেতে চায়?

রণো বলল, 'বাঙালী লেখকের সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

বড় ভয়ের কথা। শুনেছি, শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী, গণ্ডায় গণ্ডায় বাঙালী পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা পোষেন। স্বয়ং রণোকেই তিনি পোষেন, এর থেকে আর বড় কথা কী। যে-রণোকে টাকা দিয়ে পোষেন, কাজ আদায়ের নাম নেই। এমন মানুষকে কে না ভয় করে। আমি কোন্ ছার, শুনেছি তাঁকে ভয়

করে, এই নগরীর, তাবত্‌ রুপোলী জগতের নরনারী। ভয় না হোক, রেয়াত নাকি জবর।

রণোকে বললাম, 'থাক না, কী দরকার।'

রণো বিড়ি কামড়ে ধরে বলল, 'পরিচয় করে দ্যাখ্‌ না, অভিজ্ঞতা বাড়বে। কিছু ব্যবসাও হয়ে যেতে পারে।'

তা বটে ফেরীওয়ালা মানুষ, বিকোতেই তো আছি। তবে আশা রাখি না। নতুন মানুষ দেখা তো হবে! রণোর কথায়, অভিজ্ঞতা।

গিয়ে দেখলাম, ব্যাপার তাই। জীবনকৃষ্ণদা যে স্টুডিওতে কাজ করেন, তার তুলনায়, এ অনেক বড়। ঢোকার মুখে ভিড় দেখে মনে হল, ভিতরে কারখানা চলছে। বড় বড় টিনের শেডগুলো দেখে, কারখানার কথাই আগে মনে আসে। রণো নিয়ে গেল দোতলায়। দর্শনার্থীদের কামরায়, মহিলা পুরুষের ভিড়। দেখেই আমি করুণ চোখে তাকালাম রণোর দিকে। এদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যদি, মহাশয়ের কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়, তবে রেহাই চাই। বড় মানুষের দর্শন আমার দরকার নেই।

রণো আমার দিকে ফিরে তাকাল না। লম্বা টেবিলের কোণের দিকে টেলিফোন। সেটা তুলে নিয়ে, গন্‌গন্‌ করে বেজে উঠল, 'আমার সেই লেখক বন্ধুকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, নিয়ে এসেছি। তবে মনে হচ্ছে, আজ আপনার দেখা করবার সময় হবে না।···অ্যাঁ? না, ভিড় দেখে বলছি।···আচ্ছা।'

রণো টেলিফোন রেখে দিয়ে, আমাকে ডাকল, 'চল্‌, ভেতরে যাই।'

রণোর ভাব-ভঙ্গি দেখে, অপেক্ষমানরা সবাই তাকিয়েছিল। আমিও তাকিয়েছিলাম। যাঁর নামে সবাই কম্প, রণো কি তাঁর সঙ্গে, এমনি ভাবে? তবে, এও বোধহয়, রণো বলেই সম্ভব। অথচ শুনেছি, জীবনকৃষ্ণের মত ব্যক্তিও নিজেকে খুশি মনে করবেন, যদি শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী এই কোম্পানীতে তাঁকে একটা ছবি করবার অনুমতি দেন।

রণোর পিছনে পিছনে যাই। দেখি গিয়ে, কেমন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। দরজার কাছে, কঠিন মুখ বেয়ারা, চুপ করে দাঁড়িয়ে। একবার কেবল রণোর দিকে চেয়ে দেখল। তারপরে

ঠাণ্ডা ঘরের দরজা খুলে ধরল। প্রথম সম্ভাষণ গরগরে গলায়, 'আসুন আসুন, বসুন বসুন।'

শুনেই যেন কেমন লাগে। সবই যে জোড়া জোড়া ডাক। সইবে তো। পরিচয়ের আগেই সম্ভাষণ, তথাপি রণো পরিচয় বাতলাতে ভোলে না। চ্যাটার্জী অন্য দিকে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, গোল টেবিল ঘিরে যত চেয়ার, তাঁর নিকটতমটি দেখিয়ে, আমাকে আবার বললেন, 'বসুন, এক সেকেণ্ডে একটু কাজ সেরে নিই।'

তা নিন। বসতে বসতে ভাবি, আর যার সঙ্গে চ্যাটার্জী কাজ সেরে নিচ্ছেন, অধমের চোখের মাথা খাওয়া নজর সেদিকেই যেন বাতাসের ঘায়ে গোঁজ খেয়ে পড়ে। উ বাবা, ইনি যে এ নগরীর, রুপোলী ঘরাণার এক নাম-করা ফুলকুমারী। জীবনকৃষ্ণদার আসরে একে দেখিনি। আমি একবার রণোর দিকে তাকালাম। আবার ফুলকুমারীর দিকে। ফুলকুমারী কেমন যেন বিব্রত, আড়ষ্ট। ওলঙ্গবাহার শাড়ির আঁচল খুঁটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চোখের পাতা নামানো।

চ্যাটার্জীর গরগরে গলা শোনা গেল, 'হুম্‌ দেন, হোয়াট'জ্‌ য়ুর এক্সপ্লানেশন?'

একেবারে কৈফিয়ৎ দাবী? তাও এমন দরের ফুলকুমারীর কাছে? এমনটি আমার কল্পনাও ছিল না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা কবুল করতে হবে, চ্যাটার্জীর পক্ষেই যেন এমন কৈফিয়ৎ তলব সম্ভব। এমন চেহারার জুড়ি আজও দেখি নি, ভবিষ্যতে দেখব কী না জানি না। রণোকে জানতাম, ভারতবাসী হিসাবে, বেশ তে-ঢিঙে লম্বা। অমন আরো দেখেছি। চ্যাটার্জীকে দেখলাম, রণোর ওপরে। এমন গৌর অঙ্গ দীর্ঘদেহী, একবিন্দু মেদহীন, বলিষ্ঠ হাড়পুষ্ট বাঙালী, আগে সত্যি দেখি নি। কব্‌জি দেখলে, শিল্পীগুরু নন্দলালের আঁকা অর্জুনের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোয়াল একটু উঁচু, চৌকো ভাবের মুখখানি। ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটিতে, মনে হল, এ পুরুষ সিংহ সদৃশ। চোয়ালে একটু রক্তিম আভা। গলার স্বর যেন চাপা গর্জনের মতন গরগরিয়ে বাজে। এই লোকের সঙ্গে কি না, রণো ওভাবে কথা বলছিল!

তবে ও তো রণদেব! চেহারার জন্য না, ও এমনিতেই, 'বল বীর, বল উন্নত মম শির।' এই চ্যাটার্জীই তো মাসে মাসে একগোছা

টাকা দিয়ে, রণোকে সাদরে বসিয়ে রেখেছেন। গুণীকে গুণমূল্য দিচ্ছেন. কিন্তু কাজ করিয়ে না। রণো কাজের কথা বললেই নাকি এঁনার জবাব, 'আচ্ছা হবে, তুমি চিন্তা-ভাবনা কোর না, তাড়া কিসের ?' আমার বুকের মধ্যে চমকায়। মনে হয় কী সর্বনেশে মানুষ হে ! মূল্য দেন, শ্রম চান না। এঁদের কি মতিগতি।

এদিকে চ্যাটার্জীর সিংহ-চোখের নজরে বেঁধা ফুলকুমারীটি, এমন ঠাণ্ডা ঘরেও যেন স্বেদ-সিক্তা। প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। দেখি কী না, ফুলকুমারীর ভঙ্গিতেও যেন, অপরাধের ভাব। তবে আর ছাই, সেই যে কী বলে, 'স্টারডম'-এর এত কচকচি কিসের।

চ্যাটার্জী যেন হঠাৎ একটু নরম হলেন, ইংরেজিতে যা বললেন, বাংলা তর্জমাতে, 'মনে রাখা দরকার, কোম্পানী তোমার সঙ্গে চুক্তিতে কোন গোলমাল করে নি। কিন্তু তুমি পর পর চারদিন লেট। তোমার জন্য সব কিছু পড়ে থেকেছে, ডিরেক্টর, অ্যাক্টরস, ক্যামেরা, ফ্লোর, টেকনিশিয়ানস। আমি আশা করব, এর পরে আর একদিনও এরকম হবে না। এখন যাও। শুটিংয়ের পরে একবার দেখা করে যেও।'

ফুলকুমারী আনত মুখেই চলে গেল। আমার নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী লাগছিল। কোথাকার, একটা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, বাঙালীর সামনে, এমন একটি তারকাকে এভাবে হুমকানো ! এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর দেখি নি। বড় প্রাণে লাগে যে !

চ্যাটার্জী রণোকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।'

রণো তখন দাঁতে বিঁড় কামড়ে ধরেছে। বলল, 'মাপ করবেন, আপনি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একটু এদিক-ওদিক ঘুরি।'

চ্যাটার্জীর গলার স্বর এখন আর গরগরানো না। তবে নীচু গম্ভীর স্বরের মধ্যে এমন ভাব, গর্জন বেজে উঠতে পারে যে-কোন পলেতে। বললেন, 'সে তো তুমি এখন ফোয়ারে গিয়ে সকলের সঙ্গে গল্প করবে, কাজ-কর্ম করতে দেবে না। তার চেয়ে বোস।'

রণোর ঠোঁট বাঁকা, আর কাটা, 'না। আপনি এখন ফিল্ম লাইনের কত কথা বোঝাবেন এই নতুন মানুষকে, ওসব শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। তার চেয়ে আমি যাই, আপনারা কথা বলুন।'

বলে আমার দিকে চেয়ে, চোখের পাতায় ইশারা করে, বেরিয়ে গেল। চ্যাটার্জী হাসলেন। একেই কি ফ্রিংকস-এর হাসি বলে নাকি। রণো আমাকে সিংহের খাঁচায় রেখে চলে গেল ! ঝকঝকে গোল টেবিল, একপাশে, কম করে আধ ডজন রঙ-বেরঙের টেলিফোন, ঠাণ্ডা ঘর, আর সিংহের মত মানুষ। কারখানার মালিক না হয়ে ইনি রুপোলী জগতে কেন ? মহাশয় বাজলেন, 'তারপরে বলুন, এখানে এসে কেমন লাগছে ? এর আগে এসেছেন ?'

সবিনয়ে জানাই, 'আজ্ঞে না।'

তারপরে এদিক-ওদিক দু'চার কথার পরে, চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লাইনে আসার ইচ্ছা আছে নাকি ?'

এ লাইন, মানে রুপোলী জগৎ। কথার ছন্দ ধন্দ আজকাল এমনি। যা করবে, সব লাইনের কারবার। কিন্তু তাঁতী, খাচ্ছি তাঁত বুনে, বলদ কিনে কি কাল করব ? ফেরীওয়ালার মাল যদি পছন্দ হয়, রুপোলী জগতের কর্তারা কিনতে পারেন। বললাম, 'সে-রকম ভাবে আসার আর কী আছে, ডাকলে আছি।'

চ্যাটার্জী বললেন, 'আপনাদের হাতে কলম আছে, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন। তবে, বাঙালীদের একটা মুশকিল আছে, বিশেষ করে কলকাতার লেখক-টেখকদের কথা বলছি। তারা আবার সবটাই আর্ট করতে চায়।

কথা কোন্ দিকে বহে, ধরতে পারি না। তা-ই মহাশয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। বাঙালী লেখক-টেখকদের সম্পর্কে ওঁর ভাষ্য তো আমার জানা নেই।

চ্যাটার্জী বললেন, 'খালি পথের পাঁচালী মাথায় নিয়ে বসে থাকলে তো হবে না। ফিল্ম হচ্ছে একটা আলাদা ব্যাপার। আপনার বন্ধু রণোর সঙ্গে আমার মতে মেলে না। ওরা সবাই খালি আর্ট করতে চায়। আর্টে চিঁড়ে ভেজে না।'

হুঁ, কথার গতিক যেন টুকুস্ টুকুস্ ধরা যায়। তাতেই ভুবনজয়ী পথের পাঁচালীর ঘাড়ে ঝাপড়। বাঙালীর ঘাড়ে এমন রন্দা মারেন কেন গো মশায়। আমি এ সবের কী-ই বা জানি। অতএব বাতে সেই, শুনতেই আছি।

কথায় কথায় চ্যাটার্জী ক্ষোভের কথা বললেন। নাম করলেন এক খ্যাতনামা বাঙালী সাহিত্যিকের। তাঁকে তিনি কলকাতা

থেকে, এই কোম্পানীতে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। লেখকের মর্জি মতন টাকার বরাদ্দ করেছিলেন। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ওই সেই আর্টের ভাঁড়ামি। আসলে কুঁড়ে, টাকায় দেড়ে। কাজ করবে না। কেবল নাকি গা ঢিস ঢিস, শরীর খারাপ। না হয় তো, কলকাতা থেকে গিন্নীর শরীর খারাপের সংবাদ। গিন্নীর জন্য দুশ্চিন্তা। আরে এত যদি স্ত্রীর চিন্তা, এ নগরীতে কি একটা বউ ভাড়া মেলে না? তা হলেই তো সব দুশ্চিন্তার শেষ হয়ে যায়।

চাটুজ্যে মশায়ের এইরকম বয়ান। বাঙালী মানেই ফাঁকি। আর্ট আবার কিসের? বল এণ্টারটেনমেণ্ট। দশে মিলে কাজ কর, যা করবে, তা ফ্যাক্টরির নিয়মে করবে। এর নাম ইণ্ডাস্ট্রি। ওই সব গড়িমসি আর্ট করা চলবে না। টাকা খোলামকুচি না। অতএব, সেই লেখককে 'রাম রাম' বলে বিদায়। আরে মশাই, কয়েক পাতা হিজিবিজি কাটা ছাড়া লোকটা কিছুই করে নি।

সত্যি-মিথ্যা জানি না। তবে চ্যাটার্জী যে প্রৌঢ়-সাহিত্যিক মহাশয়ের নাম করছেন, তিনি বঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয়। ভাবি, সময়ে কী না হয়। মর্জি মত টাকা দিলেই কি মনের মত কাজ পাওয়া যায়? কিন্তু আমার শোনা ছাড়া বলবার কিছুই নেই। হেথায় বাত দেবার চেয়ে, বাত শোনাই ভাল।

তারপরে চাটুজ্যে মহাশয়ের বয়ানে বোঝা গেল, বাঙালীরা কেবল কুঁড়ে বা আর্টের ভাঁড়ামি করে না। কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, মিথ্যা-ভাষণে জুড়ি নেই। বাঙালী-ই যখন বলেছেন, বাঙালীকে শুনতেই হবে। সব জায়গায় কি প্রতিবাদ চলে, না করা-ই যায়? ভেবেছিলাম বাঙালীর মুণ্ডুপাত এখানেই শেষ। তা বললে তো হয় না। চাটুজ্যে মশায় হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেবেন। কলকাতা থেকে এসেছেন লেখক মশাই, দেখে যান। শঙ্করকুমারের নাম শুনেছেন?

তা আবার শুনিনি! এ নগরীর রুপোলী জগতের এক মস্ত উঠতি তারকা। বঙ্গসন্তান। চাটুজ্যে মশাই ফোন তুললেন, কথা বললেন, 'আমি চ্যাটার্জী বলছি! শঙ্কর কি শুটিং করছে? ও!···পাঠিয়ে দিন আমার এখানে,···হ্যাঁ, মেক-আপ ড্রেস করা অবস্থাতেই চলে আসুক, কিছুক্ষণ শুটিং বন্ধ থাক।'

রিসিভার নামিয়ে, বেয়ারাকে ডেকে চায়ের হুকুম করলেন। কিন্তু শঙ্করকুমারকে আবার কেন? আমার অবিশ্যি দেখতে আপত্তি নেই। এমন সুযোগ ক'জনের হয়। কথার মধ্যেই শঙ্করকুমার উপস্থিত। তারকার গায়ে নবাবজাদার পোশাক, মুখের রঙ্-চঙ্ তেমনি। চেহারাটি সুন্দর, নবাবজাদার মত বটে। এসেই সহাস্যে, 'কী ব্যাপার? এমন অসময়ে ডাকলেন?'

চ্যাটার্জীর আবার সেই গরগরে স্বর, 'বোস! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

কুমারের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তারকার চোখে ঈষৎ কৃপার নজর, মাপা হাসি, আমিও বর্তে গেলাম। তারপরেই চাটুজ্যে মহাশয়ের জিজ্ঞাসা, 'এবার বল তো শঙ্করকুমার, তুমি ওয়াধান ফিল্মসে একটা ছবিতে, হীরোর রোলে চুক্তি সই করেছ?'

তারকার চোখে-মুখে বিস্ময়। চকিতে একবার চোখের কোণে আমাকে দেখে নিল। তারপরে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার তো অনুমতি ছিল—।'

'তা ছিল, কিন্তু একটা কনডিশনে, এক লাখের কমে তুমি কোথাও সই করবে না! আমি তোমাকে প্রথম এক লাখ দিয়েছি।'

তারকার চোখে প্রবল বিস্ময়, 'তাই তো করেছি স্যার।'

চ্যাটার্জীর চোখ দুটি যেন একবার জ্বলে উঠল, ইংরেজিতে যা বললেন, বাংলায় তা, 'একটি থাপ্পড় মারব, বাজে কথা বোলো না। সত্যি করে বল তো, কত টাকায় সই করেছ?'

তারকা লজ্জিত, মনে মনে নিশ্চয়ই আমার মাথা চিবোচ্ছে। কিন্তু আমার যে কী অস্বস্তি, তা কেমন করে বোঝাব। কোন ভদ্রসন্তানই কি এসব ব্যাপারে খুশি হতে পারে?

তারকা আরো অবাক হেসে ভাবে, 'সত্যি আমি এক লাখেতে—'

'আবার? কার কাছে লুকোচ্ছ তুমি জান না।'

চ্যাটার্জীর স্বরে বজ্র, 'এখনো সত্যি করে বল। জানি, ভেতরের ব্যাপার সবই জানি। ওই পাঞ্জাবী ওয়াধান তোমাকে কিছু পাঞ্জাবী ছুঁড়ির মুখ দেখিয়েছে। বোধহয় দেখানোর থেকেও বেশি কিছুই দিয়েছে। সে সব তুমি ওদের ওখানে অনেক পাবে। এদিকে মদও সমানে চালাচ্ছ। লিভার তো বোধহয় পচতে শুরু করেছে। তুমি মরলে, তোমার পচা লিভারে আমিই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালব।

এখন—'

না, আর পারি না। বড় দায়ে বলি, 'আমি এখন উঠি, পরে আবার—'

চ্যাটার্জী হাত তুলে বললেন, 'কোথায় যাবেন মশাই, আপনাকে শোনাবার জন্যই এসব। তা না হলে ভাববেন, খালি মিছে কথাই শুনলেন। একটা বাঙলা ছবিতে একে দেখে ভালো লেগেছিল। একে আমিই কলকাতা থেকে ডেকে এনেছি, হিরো করেছি, ওকে নিয়ে এখন এখানে টানাটানি। আমার খালি একটা অনুরোধ ছিল, ও যেন লাখ টাকার কমে কোথাও না সই করে। তাহলে ও একদিন দশ লাখে উঠতে পারবে। কিন্তু ও জীবনে তো টাকা দেখে নি, লাখ টাকা পেয়েও, লাখ টাকা এখনো ওর কাছে স্বপ্ন। তা ছাড়া ওই যে, কিছু পাঞ্জাবী ছুঁড়ির প্রসাদ পাচ্ছে, তাই এখনো মিথ্যে বলছে।'

তারকা কুমার প্রায় লজ্জাবতী কুমারীর মত হেসে উঠলো। বলল, 'কী যে বলেন আপনি মিঃ চ্যাটার্জী।'

কুমারের দিকে ফিরে, টেবিলে চাপড় মেরে, গরগর করলেন, 'ওসব অশ্লীল শব্দ রাখো। এখন বল, কততে সই করেছ?'

তারকার হাতে এখন চায়ের কাপ। ভাঙে কিন্তু মচকায় না। হেসে বলল, 'জানি না, আপনি কী শুনেছেন, তবে হ্যাঁ, নব্বুই হাজারে সই করেছি। ওয়াধান বিশেষ ভাবে—'

চ্যাটার্জী তারকার হাত থেকে কাপটা টেনে নিলেন। নবাবজাদার পোশাকে চা চলকে পড়ল।

তারকা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, 'এ হে হে, ড্রেসটা—'

'নষ্ট হোক, এখনো সত্যি বল। মিথ্যুক, (অশ্লীল গালাগাল) ওসব কালিঘাটের চালাকি আমার কাছে চলবে না। সত্যি বল। নব্বুই, না, আরো অনেক কম?

কিন্তু আমাকে কেন রেহাই দেওয়া হচ্ছে না? রুপোলী জগতেও এমন অ-রুপোলী কা'ণ্ড ঘটে, কে জানত। এই ভাষায়, তা-ও আবার হিংসা নগরীতে। অপিচ, আমি কেন এর সাক্ষী হে। ছেড়ে দাও। সিংহমশাই, পালাই।

তারপরে শোন, এদিকে জ্বর নামার মত, পারদের দাগে অঙ্ক নামে, নামতে নামতে, সত্তর! কুমারের মুখে রক্তশূন্য হাসি।

চ্যাটার্জী এবার শক্ত মুখে ক্ষান্ত। তার মানে সঠিক অংকটা তিনি আগে থেকে জানেন বলেই এবার ক্ষান্ত। কিন্তু কুমারের অবাক করানো বাত তখনো বাকী। বলল, 'কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী, রত্নমালার মত হিরোইন, ওয়াধানের কাছে মাত্র লাখে সই করেছে, যেখানে তার মিনিমাম দেড়লাখ।'

চ্যাটার্জী'র চোখে-মুখে বিদ্রূপ আর ক্রোধ, 'হ্যাঁ, তাও জানি, আরো বেশি জানি, যেটা তুমি জান না। রত্নমালার কণ্ট্রাক্ট পেপারের পিছনে, ওয়াধানের নিজের হাতে লেখা আছে, সে তার স্নেহের পাত্রী, রত্নমালাকে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের একটি গাড়ি প্রেজেণ্ট করা হবে, বুঝেছ বুদ্ধু? নাউ য়ু ক্যান গো, গেট আউট।'

শঙ্করকুমার হাসতে হাসতে উঠল, হাসতে হাসতেই গেল। কিন্তু হাসির পিছনে যেটুকু রয়েছে, সেই গ্লানিটা যেন আমার মনে বাজতে লাগল। আজ লিখতে বসে দেখছি, দশ লাখ না হোক, সেই তারকার এখন বাজারদর ছ'-সাত লাখ। চ্যাটুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে এখনো তার যোগাযোগ ঠিকই আছে। তথাপি, সেই তারকার উঠতি সময়ের ঘটনাটা এখনো আমার মনে একটা গ্লানি হয়েই আছে।

তারপরে শ্রীযুত চ্যাটার্জী'র বচন, 'দেখলেন তো, মিথ্যে বলিনি! এবার আপনি বলুন, আপনাকে আমি কী মূল্যে পেতে পারি।'

'আমাকে?'

কানে ঠিক শুনেছি তো হে। চাটুজ্যে মশাইয়ের বয়ান, 'হ্যাঁ, আপনাকে আমি চাই। আপনি আমাকে গল্প দেবেন, যাকে বলে কাহিনী। আপনার সবরকম ব্যবস্থা আমি করব, সবরকম সুখ-সুবিধে। টাকার জন্য ভাববেন না। আপনারা হলেন ইয়ং রাইটার, আপনাদের কাছে আশা আছে।'

চোখের সামনে সবই যেন রুপোর ঝলকে ঝলকাচ্ছে। আমার ভিতরে রুপোর ঝলক, বাইরে রুপোর ঝলক। আরব সাগরের কূলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে রুপোর চলকানি। রুপোয় রুপোয়, রুপোলী জগতের, রুপসাগরে যেন দোল খাচ্ছি। কিন্তু এমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন হে? রুপোর আলোয়, রুপের আলোয়, চোখে এমন ধন্দ কেন? যেন রুপোর পাতে পাতে, সোনার কাঠি আংটা

দিয়ে জড়ানো। সোনার তার দিয়ে নয়নমোহর সাজে সাজানো। হাত দিতে গিয়ে মনে হল, সোনা-রুপোর বাঁধন বড় শক্ত। দমে কুলোয় না, যত টানাটানি, তত বাঁধাবাঁধি। কেন, এ কী বস্তু? যেন খাঁচার মত লাগে।

নজর একটু তফাৎ করে দেখি, খাঁচা বটে, সোনা-রুপোর খাঁচা। কিন্তু আমি যে ফেরীওয়ালা। স্বভাব যায় না মলে। নাকি কপালেরই লিখন। একা মনে গড়ি, ফেরী করি। সোনার খাঁচায় নাকন চিকন, মিঠে ফল পানী, বল তো ময়না, হরে কৃষ্ণ। পোড়ার কপালে এমন করে বুলি কপচাবার সুখ নেই। ফেরী করে বেড়াই, বেঁড়িয়ে ক্লান্ত হই। তখন একটা কী সুর বাজে, শুকনো ভাতের স্বাদ তাতে বড় মিঠেন লাগে।

দম ফেলে, হাত জোড় করে হাসি। সিংহমশাইকে বলি, 'আজ্ঞে, সে-সৌভাগ্য করিনি। আমি এ ভাবে কাজ করার যোগ্য না।'

তা বললে তো হয় না। যোগ্যতা অযোগ্যতা চাটুজ্যে মশাইও বোঝেন। তাই অনেক বোঝানো সোজানো। তবু, আমি তো নিরুপায় না, মন নিরুপায়। হরিণকে যদি পুছু কর, 'কোথায় থাকতে চাও হে? মানুষের কাছে পোষমানা হয়ে, না জঙ্গলে?' জবাব পাবে, 'জঙ্গলে।' ফির্ পুছু, 'বনে যে বাঘ আছে, খেয়ে ফেলবে।' জবাব, 'তবুও জঙ্গলে।'

যার যেখানে বাস। বনেতে বাঘ আছে জেনেও, বনের হরিণ বনেই থাকতে চায়। মরণ আছে জেনেও, মানুষ বাঁচে। খাঁচাকে কে কবে চেয়েছে? তথাপি চাটুজ্যে মশাই হতাশ নন। এই নগরীতে থাকতে থাকতে তাঁর গৃহে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন। তার আগে টেলিফোনে ডেকে নিয়ে এলেন রণোকে। রণোকে বললেন, 'তোমার লেখক বন্ধু, তোমার চেয়ে আর এক কাঠি ওপরে। হাসি দিয়ে মাত্ করতে চায়।'

রণো এবার তালে তাল দেয়, 'আপনিও সেটা বুঝেছেন তাহলে? বন্ধুটি আমার সাবলাইম—'

একটি প্রকৃত গালাগাল, যদিও হাসিতে মাখানো মিঠে। কিন্তু চ্যাটার্জীর সামনে কোন্ সাহসে উচ্চারণ করে, জানি না। বাইরে এসে রণোর জিজ্ঞাসা, 'কেমন বুঝলি?'

'খাঁটি।'

'কোন্ হিসাবে?'

'নিজের মতে আর পথে। তারপরে তোমার সঙ্গে না বনে তো, লড়াই কর।'

'আর বাঙালীর মুণ্ডপাত?'

'বোধহয় নিজে বাঙালী বলেই, বাঙালীর ত্রুটি বেশি পীড়া দেয়।'

রণো গম্ভীর, 'হুঁ। তোকে আটকাতে চাইল না?'

'চাইলেন।'

'কী বললি?'

'কী বলব। আমি যে ফেরীওয়ালা, সেটা বললাম।'

রণো নাকের পাটা ফুলিয়ে, শক্ত মুখে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর আওয়াজ দিল, 'শালা।'

বলে, পিঠে হাত চাপড়ে, ঘাড়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। রাস্তায় এমন সময়ে আওয়াজ, 'এই যে রণোদা।'

কালো কুচকুচে, রোগা ডিগডিগে, যাকে বলে একখানি বাঙালী ছেলে। তেল-চকচকে না, এই নগরীর ধুলায় রুক্ষু, মাথার চুলে জটা। পরনে প্যাণ্ট তো না, গোড়ালির ওপরে ওঠা, নড়নড়ে দো-নলা। বোতাম খোলা ময়লা জামা, তাতে বুক আর কণ্ঠার হাড়গুলো যেন হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। শরীরের চেহারায় কিছুটি নেই, কিন্তু ডাগর দুটো চোখ আছে, আর আছে একখানি হাসি। বয়স কত, রোগা চেহারায় বোঝা যায় না, ষোল থেকে কুড়ি?

রণোর ধমক, 'তুই আবার এখানে কেন?'

'বাজারের টাকা দিন।'

রণোর মুখে আর বিরক্তি ধরে না, 'সকালে চেয়ে রাখিসনি কেন?'

জবাব, 'আপনি-ই তো বললেন, বিকালে বাজারের টাকা এখানে এসে নিয়ে যেতে!'

রণোর ধমক, 'কখনো না।'

দিব্যি, 'মাইরি।'

বচন শোন। এদের সম্পর্ক কী? এদিকে রণোদা, ওদিকে বাজারের টাকা, তারপরে আবার মাইরি! কিন্তু রণো সেদিক

দিয়ে গেল না। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এ দাদাকে চিনিস ?'

বেচারী ! ডাগর কালো চোখে চেয়ে ঘাড় নাড়ল। রণো ধমক দিল, 'শীগ্‌গির পেন্নাম কর।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমান যেন ঢুঁ দিতে এল। 'থাক থাক' বলবার সময় নেই, তার আগেই স্যাণ্ডেল স্পর্শ, কপালে হাত ছোঁয়ানো। রণো বাত দিল, 'কলকাতার একজন লেখক রে। জেবনকেষ্টদা ছবি করবেন বলে এঁর গল্প নিয়েছেন।'

আমার না, শ্রীমানেরই ধূলা-রুক্ষ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রণো আমাকে ডেকে বলল, 'আয়।'

চলতে চলতে রণো বলল, 'ওর নাম জীবন না, শুধু কেষ্ট। আমার আপদ।'

আমি কৃষ্ণর দিকে তাকালাম। হাসিখানি যেন বাঁধানো। রণো একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। আমার দরকার ছিল না। রণোর দরকার ছিল। কেবল চা না, কিছু রাম সামোসার অর্ডারও হল। এখানে রাম মানে বিরাট আকারের কথা বলছি। খাবার এলে, রণো প্রথমে তার আপদের দিকে চেয়ে বলল, 'নাও, গেলো।'

এমন করে না বললে কি খাওয়া যায় ? কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে সিঙাড়া নিল। রণো নিজেও নিল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'শ্রীমান আসাম থেকে এসেছেন, এখানে ফিল্মে নামবেন বলে।'

অবাক হয়ে ভাবি, 'আসাম থেকে ?'

কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলল, 'বন্যা হয়েছিল কী না, তা-ই।'

বন্যার সঙ্গে, আসাম থেকে বোম্বাইতে ফিল্মে নামবার জন্য ছুটে আসার সম্পর্ক কী ? জবাব দিল রণো, 'ওর বাবা গেছে ডুবে, দিদি গেছে ভেসে। উনি ভাসতে ভাসতে বম্বেতে। কেন ? না, ছেলেবেলা থেকে নাকি ওনার ফিল্মে নামার শখ। তারপরে একদিন দেখি, এক স্টুডিওর দরজায় ধুঁকছে। তার আগে তো রোজই দু-এক টাকা চাঁদা দিচ্ছিলামই। নিয়ে গেলাম বাসায়। এখন খাটিয়ার ছারপোকা, রক্তচোষা নড়তে চায় না।'

কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হাসিখানি উজ্জ্বলতর। আর একখানি সিঙাড়া তুলে নিল। কেমন ছারপোকা ভাবো। রণো বলল, 'প্রথমে এখানে এসে, কার কাছে যেন গেঁছিলি ?'

কৃষ্ণ বলল, 'জীবনকৃষ্ণদার কাছে।'

কৃষ্ণও বলে জীবনকৃষ্ণদা। রণোর বলার ভঙ্গিটিও তেমনি। যেন জানে না, কেষ্ট কার কাছে প্রথম গিয়েছিল। রণো বলল, 'লেখক দাদাকে ঘটনাটা বল্, কী কী হয়েছিল। দাদা লিখে দেবেন।'

বলা মাত্রই, বলা শুরু ! কৃষ্ণ গলা-খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, 'প্রথমে জীবনকৃষ্ণদার বাড়িতে গেলাম। কুকুর চাকর সবাই তাড়া করল। আমিও তেমনি, দেখা না করে যাব না। তারপরে জীবন-কৃষ্ণদা এলেন, দেখলেন আমাকে, জিজ্ঞেস করলেন কী চাই। বললাম, ফিলেম্ নামব, আমাকে চান্স দিতে হবে। উনি বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। একটা রাগী চাকর বাইরের বেঞ্চে বসতে দিয়ে আমাকে খেতে দিল। ডিম, পাঁউরুটি, চা। খাবার দেখে মনে হল, তা হলে আমি চান্স পাব। তারপরে জীবনকৃষ্ণদা বেরিয়ে এলেন, আমাকে ডাকলেন। ড্রাইভার গাড়ি বের করল। উনি গাড়িতে উঠে, আমাকেও উঠতে বললেন। আমার তো মনে খুব আনন্দ। এরকম ভাবে যে ওঁর গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাবেন, ভাবতে পারি নি।'

কৃষ্ণ একটু থেমে, হাতের সিঙাড়াটা শেষ করল। তারপরে আবার 'একটা মাঠের মত জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, আমাকে নিয়ে নামলেন। মাঠের ওপরে একটা দালান দেখলাম। দালানের গায়ে একটা সাইনবোর্ড 'বেঙ্গলী ক্লাব'। ওদিকে দেখিয়ে জীবনকৃষ্ণদা বললেন, 'ওই যে বাড়িটা দেখছ, সন্ধ্যেবেলা ওখানে গেলে তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' বাড়িটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। জীবনকৃষ্ণদা গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।'

না হেসে পারলাম না। এ যে হাসিরই গল্প। জীবনকৃষ্ণদার এরকম কঠোর বাস্তববোধের কথা আমার জানা ছিল না। রণো বললো, 'তারপরে তোর কী মনে হয়েছিল, সেটা বল্।'

কৃষ্ণ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'বেড়াল তাড়ানো।'

রণো গম্ভীর ! বলল, 'তারপরে সন্ধ্যেবেলা কী ঘটল বল্।'

কৃষ্ণ বলল, 'সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে শুনলাম, সন্ধ্যেবেলা বিজিতকুমার আসবেন।'

রূপোলী জগতের স্মরণীয় নাম, কিন্তু বাঙালী। এই নগরীর সব থেকে নাম-করা চিত্রনট, মস্তবড় অভিনেতা। আজকাল যে

চিত্রনটদের এত কুমার কুমার বাতিক, বছর তিরিশ আগে উনিই তার প্রবর্তক বলা যায়! কৌতূহলিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী করলে?'

কৃষ্ণ বলল, 'সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করলাম। শুনেছি বিজিত-কুমার খুব দয়ালু লোক। সন্ধ্যেবেলায় উনি এলেন, গাড়ি থেকে নামতেই আমি কাছে গেলাম! জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই। আমি মনের কথা বললাম। উনি ধমক দিয়ে বললেন, 'ভাগো বুদ্ধু।'

'তারপর?'

'তারপরে উনি চলে গেলেন।'

রণো খেঁকিয়ে উঠল, 'তারপরেও তুই এখানকার সমুদ্রে না ডুবে, আমার ঘাড়ে চাপলি। নাও, এখন টাকা নিয়ে যাও, বাজার করবে কি মুণ্ডু করবে, করোগে।'

বলে, রণো তাকে টাকা দিল। কৃষ্ণ হাসিখানি ঝকঝকিয়ে আমাকে বলল, 'যাচ্ছি দাদা, বাড়িতে আসবেন।'

কৃষ্ণ চলে গেল। রণোর কোন মন্তব্য নেই। বলল, 'চল, তোমাকে সঙ্গীতপরিচালক সুরঞ্জনের সুখী ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

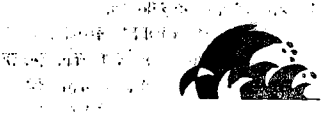

কিন্তু সুরঞ্জনের সুখী ঘরের পরিবর্তে, রণো আমাকে টেনে নিয়ে এল আরব সাগরের কূলে। সুরঞ্জন আর নীলার সঙ্গে, ইতি-পূর্বেই সৈকতবিহার হয়ে গিয়েছে। তীরের নাম জুহু। নামে কেমন যেন মন টানে। সুখী ঘরের থেকে, এ বাইরের অন্তহীন সিন্ধু কূল ভালো। সাগরের পাগল হাসি ফেনায় উপছানো। গর্জনে সুদূরের ডাক। ঘড়ির কাঁটায় সাত ঘটিকা। কিন্তু আকাশের গায়ে এখনো অস্তরাগের রক্তাভা। পশ্চিম দেশ। বঙ্গোপসাগরের আকাশে যখন অন্ধকার নামে, এই সাগরের আকাশে তখন সূর্যদেব অস্ত যেতে গড়িমসি করেন।

তা করুন, এ যে হাট। হাট ভালো লাগে না। বালু বেলার

ওপরে রাস্তায় গাড়ির সারি। মেয়ে-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ, রঙীন জনতার মেলা লেগেছে সৈকতে। বাদাম-চানাচুর-ফুচকাওয়ালা থেকে শুরু করে, ইকড়ি মিকড়ি কী সব বলে। (দোষ নেবেন না গো ভিন্‌দেশীরা, এ বাঙালীর খাবারের নাম মনে রাখার দৌড় বেশি দূর না।) তাবত ফেরীওয়ালার, নানা স্বরে বাজে ও বিকোয়। দোষ তাতে নেই। সব ফেরীওয়ালার নিয়ম তা-ই। আমারো। তবে সেই যে কথায় আছে, মন গুণে ধন। সিন্ধুর কূলে যদি এলাম, নির্জনতা দাও। নগরে যখন যাব, তখন হাট-বাজার মেলা থাকুক। যেখানে যেমন।

কিন্তু এসেছ কার সঙ্গে? রণোর সঙ্গে। কথাটি বলো না। কী বলে, শোন। কী করে, দেখ। দুর্বাসা তো দেখছি, দাঁতে একখানি বুমবুই বিড়ি কামড়ে ধরে, রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে, সৈকতের চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। একদিকে মেরিন ড্রাইভ দূরে, আর একদিকে ধূ ধূ। রণো যেন নাকের পাটা ফুলিয়ে বাতাসে কিছু শুঁকছে। তারপরে বলল, 'যমের অরুচি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

'সূর্য্যি ঠাকুর, আবার কে। দেখছিস না, এখনো যাবার নাম নেই, সাতটা বেজে গেল। চল্। শুরু করে দিই।'

কী শুরু করবে, খানিকটা আন্দাজ করলেও, এখানে এই হাটের ভিড়ে কী করে সম্ভব বুঝতে পারছি না। সমুদ্রের মুখো-মুখি থেকে, ডাইনে চলতে আরম্ভ করল। আমি পাশে পাশে। বলল, 'মেজাজ খারাপ হচ্ছে বোধহয়?'

আমাকেই বলছে, যদিও নজর অন্যদিকে। বললাম, 'মেজাজ খারাপ হবে কেন?'

'রণো হতভাগার সঙ্গে জুহুতে ঘুরতে হচ্ছে।'

বললাম, 'এখনো হয় নি, হলে বলব।'

'তুই বলবি?'

'কেন, বলতে পারব না?'

'শালা জানি, ওটাই তোমার প্যাঁচ। আজ হাজার হলেও মুখটি খুলবে না, কাল থেকে আমাকে দেখলেই পালাবে। ছায়াটি মাড়াবে না।'

কথাটা বোধহয় একেবারে মিথ্যা না। তবু হেসে বাজি, 'তা

কেন ?'

'চোপ ব্যাটা ভিজে বেড়াল। তোর মত যদি আমি হতে পারতাম, এখানে অনেক কিছু করে ফেলতে পারতাম।'

এ হিসাবটা অবিশ্যি আমার জানা নেই। মিলে জুলে থাকতে পারলে ভাল। না পারলে নিজেকে নিজে। কাজিয়ায় রাজী না। এরকম হলে যে এ সাগরকূলের নগরে অনেক কিছু করা যায়, তা আমার জানা নেই। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি, ঘন নারিকেল কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছাঁদের বাড়ি! কোথাও কোথাও, সমুদ্র মুখ করে, ছোট ছোট বাগান। সেখানে চেয়ার-টেবিলে বসে, চা কফি গল্প কথাবার্তা চলছে। এ সময়েই হঠাৎ যেন সৈকতের বালি ফুঁড়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে এল। ময়লা হাফ প্যান্ট আর হাফ সার্ট গায়ে, পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো গড়ন, একটু খাটো। কালো চোখ চকচক করছে, মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। রণোকে দেখে, কপালে হাত ঠেকাল, হাসিটি আরো বিস্তৃত হল। রণোর মুখখানিও হাসিতে ভরে গেল। এমন হাসি ওকে আর হাসতে দেখি নি। ইংরেজিতে বলল, 'এসে গেছ রামু।'

রামুও ইংরেজিতেই বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'জিনিষ আছে তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'পাহারা কেমন ?'

'সে জন্য ভাবতে হবে না। আজ তো আর নতুন না।'

'তা ঠিক, কিন্তু এখনো সেরকম অন্ধকার হয় নি।'

'না-ই বা হল। এদিকে কেউ আসবে না।'

রণো ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'তা হলেই বুঝতে পারছ রামু, আমি কেন এদিকটায় চলে এসেছি।'

রামু একবার তার হাসি চকচকানো চোখে, আমাকে দেখে বলল, 'আপনার তো সবই জানা আছে স্যার।'

রণো বলল, 'তা হলে নিয়ে এস তোমার জিনিষ। এখানেই শুকনো বালিতে বসে পড়ি।'

রামুকে দেখলাম, দুই উঁচু জমির মাঝখান দিয়ে, এক শুকনো বালির খাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। রণো আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

'ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছিস ?'

বললাম, 'যদিও ভেলকি, তবু একটু একটু পারছি।'

'তবে আয়, এখানে বসেই পড়ি।'

রণো উঁচু জমির ধার ঘেঁষে, শুকনো বালির ওপরে, ওর আজানুলম্বিত বাহু সুদীর্ঘ শরীরটা নিয়ে বসে পড়ল। স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে, ঠাণ্ডা বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিল। বলল, আহ্! শান্তি! বুঝলি লেখক, এই আমার ভালো। সুরঞ্জনের মত টাকা থাকলে, অনেক টাকা দিয়ে চোরাই স্কচ্ খেতাম কী না জানি না, কিন্তু আমার ওসব ভালো লাগে না। স্কচ্ টচ্ আমার কোনদিনই ভালো লাগে না। দিশিই আমার ভালো লাগে।'

বললাম, 'না খেলেই বা কী হয়।'

রণো ধমক দিয়ে বলল, 'মেয়েদের মত কথা বলিস না। সংসারে অনেক কিছুই তো না করলে হয়, তবু করে কেন লোকে ? তুই ব্যাটা লেখক আর এটা বুঝিস না, মনের একটা খিদে আছে।'

মানি। পানীয় দিয়ে কি সেই ক্ষুধা মেটে ? হয় তো মেটে। কার কিসে কী মেটে, কে বলতে পারে। কিন্তু এ মুহূর্তে, রণোর সেই উগ্রচণ্ডী মূর্তি আর নেই। ওর মেদবর্জিত খজু লম্বা চেহারাটা যেন বালির ওপরে, অবসাদে ভেঙে পড়েছে। জামা-কাপড় ময়লা। চুলগুলো উসকো খুসকো। মুখে ধুলোর স্তর। বড় বড় চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক। কলকাতায় ওর স্ত্রী আর সন্তান রয়েছে। ওর স্ত্রী বীণাকে চিনি, লক্ষ্মীর মত ঠাণ্ডা সহিষ্ণু মেয়ে। এখন বোধহয় কোন ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে। এখান থেকে রণোও নিশ্চয়ই কিছু পাঠায়। এই রণোও, ওর যা শিক্ষা-দীক্ষা আছে, এবং যে-পরিবারের ছেলে ও, অনায়াসেই একটা ভালো চাকরি করে, ভালোই থাকতে পারতো।

কিন্তু পারল না। যে ঘাড়ে চেপেছে, তাকে তুমি ভূত বলবে কী না জানি না। আমি বলি ওটা সৃষ্টির ব্যথা। একটা আর্তি। একটা ঘোর। সে যখন বেছে শুনে, উপযুক্ত ঘাড়টিতে চাপে, তখন আর তার মুক্তি নেই। এই রণোও তা-ই। রণো ছুটছে। জীবন-কৃষ্ণদার সম্পর্কে যে ওর নানা বিদ্রূপ, তার কারণ আর কিছু না। মঞ্চ আর চিত্রের জগতে, ও হল উজানের মীন। ও যদি উজানগামী না হত, তবে কলকাতার টালিগঞ্জের দরজা ওর জন্য খোলা থাকতো।

খোলাও ছিল। কিন্তু ওর একটি কাজ দেখেই, স্রোতের চলমানরা পিছন ফিরে দৌড়। সেই ছবিটা আজও লেবরেটরির অন্ধকার ঘর থেকে, রুপোলী পর্দায় মুক্তি পায় নি। কাগজে যাকে বলে মণ্ড সফল নাটক, তা ও কোনদিন সৃষ্টি করতে পারে নি। ওর দৃষ্টি অন্যত্র, মন অন্যখানে। আজও বম্বেতে এসে বসে আছে। টাকা পায়, কাজ পায় না। কী বিচিত্র দেশ হে। কী বা নির্মাতাদের মনের কারসাজি।

আমি ওর পাশে বসলাম। রামু এল। তার হাতে একটি বোতল, জল রঙ পানীয়। এবার দেখ, কাকে বলে শুকনো দেশ। সামনে আরবসাগর রুপোলী ঢেউয়ে চলকায়। এখানে বোতল টলটল করে। আইন আছে ফিতেয় বাঁধা কাগজে। যে খান চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি। মনে পড়ে যাচ্ছে, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের ব্রহ্মচর্য বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কেবল ওপরের এই চাক্ষুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভূমি দেখলেই হবে না। ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে, নিকিয়ে চিকিয়ে রাখলেই হবে না। মনে রাখতে হবে, এই ভূমির পাতাল অন্ধকারে, অতি ভয়ঙ্কর বিশাল বিষাক্ত সরীসৃপ আছে। ওকেও নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে।' সরাসরি বয়ানে অবিশ্যি এসব ঠেকে না। আইনের চোখ রাঙানি তার জানা। কিন্তু হান্দ্যাখ্ মোর কলাটা। ওপরের ডাঙা তুমি শুকনো রাখো। তলায় তলায় অন্তস্রোতে বহে।

বোতল দিয়েই, রামু আবার অদৃশ্য। পানীয়র দিশি নামটি আমার এখন মনে নেই। রণো বোতলের ছিপি খুলে, ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল। মুখটা যেন একটু বিকৃত হল। বার দুয়েক ঢোক গিলে, বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নে, একটু খা।'

আমি ভয় পাওয়া চমকে বাজি, 'ওরে বাবা, তোমার ওবস্তু আমার চলবে না।'

রণো বলল, 'জানি এ ব্যাপারেও তুমিও একটি সুরঞ্জন।'

হেসে বলি, 'তুই ভালোই জানিস, সুরঞ্জনের বস্তুও আমার তেমন চলে না।'

'তবু তো উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়। ঠিক আছে শালা, নিতে হবে না। আমারটা আমিই খাই।'

বলে, মহাদেবের মত বিষপান করল আবার। অল্পেতে নেই। পান করা দেখলে মনে হয়, তীব্র পিপাসা। আমিই ভয় পাই। রণো জামার আস্তিনে ঠোঁট মুছে বিড়ি ধরাল। এবার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এখনো রণোর মুখ দেখা যাচ্ছে। পানীয়র ছটা ওর মুখে, চোখে ঈষৎ রক্তাভা। তাকিয়ে আছে দূরের সমুদ্রে। সেদিকে চোখ রেখেই বলল, 'জানলি লেখক, আর এখানে থাকতে পারছি না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম···।'

বলতে বলতে আবার বোতল তুলে গলায় ঢালল। এ গলা যেন রণোর না। অন্য কারোর মোটা গোঙানো স্বর! আবার বলল, 'তিলে তিলে মরে যাচ্ছি!'

কথাটা শুনে, এই আরব সাগরের কূলে বসে, আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমি রণোর মুখের দিকে তাকালাম। ভুরু কোঁচকানো নেই, মুখের ভাঁজে কোন নড়াচড়া নেই। যেন অনেক শান্ত, স্থির, অথচ তিলে তিলে মরার কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রণো, এ ছাড়া কি কোন উপায় নেই?'

রণো গলায় পানীয় ঢালল। বলল, 'বুঝতে পারি না; কী করব। চ্যাটার্জি। আমাকে দিয়ে কোনদিনই কাজ করাবে না, অথচ টাকা দিচ্ছে, আশা দিয়ে রাখছে। জীবনকৃষ্ণদা আমাকে দিয়ে কখনো কাজ করাবেন না। ওঁকে লোকে প্রগতিশীল ডিরেক্টর বলে। এটা কোনো কথা হতে পারে না। ওসব প্রগতিশীলতা হল, ছবির গল্প। গল্পের প্রগতিশীলতা দিয়ে আমি কী করব। আমি চাই ছবি, ছবি তৈরী করতে চাই। সবাক চিত্র মানেই কথা বলে। কিন্তু আমি চাই, ছবি নিঃশব্দে কথা বলুক, ছবি কবিতা হয়ে উঠুক, ছবি মানুষের মনে বিঁধে যাক। আমি প্রগতিশীল গল্প নিয়ে ছবি করতে পারি; কিন্তু আমি ছবি করতে চাই, আর সেটা আদিকালের ভঙ্গিতে না। তোদের কনটেন্টের সঙ্গে ফর্ম বদলায় না? সেই ফর্মটা কী, তা অনেকেই বোঝে না। বিশ্বাস করে না। ভাবে ওদের টাকা আমি খোলামকুচির মত নষ্ট করব।—'

একটানা অনেকগুলো কথা বলে, রণো আবার বোতল তুলে গলায় ঢালল। ও এমন একটা জগতের কথা বলছে, যে জগতের বিষয় আমি প্রায় কিছুই জানি না। রুপোলী পর্দার সৃষ্টির বিষয়ে

ওর যা সমস্যা, তার কোন সম্যক ধারণা আমার নেই। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, এটা রণোর জীবন-মরণেরই সমস্যা। ছবি তৈরি করা ওর কাছে টাকার স্বপ্ন দেখা না, বড়লোক হওয়া না। অধিকাংশের কাছেই যেটা আসল চিন্তা।

অন্ধকার নেমে এল। আমরা স্পষ্টভাবে, কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দিগন্তহীন সমুদ্র। এখানে যখন একজন নৈরাশ্যের পাঁচালী গায়, তখন অন্ধকারেও আরব সাগরের তরঙ্গে ফেনিলোচ্ছল ফসফরাসের ঝলকানো হাসি কেন। জীবনের রহস্য কি তবে এই ফেনিলোচ্ছল হাসিতে রয়েছে। জানি না। কিন্তু রণোকে কী বলা যায়, বুঝি না। চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড শক্তি যেন, অন্ধ আর অবশ হয়ে পড়ে আছে।

রণো একটা বিড়ি ধরাল। সাগর গর্জনের আবহ সঙ্গীতের বুকে, ওর মোটা গম্ভীর গোঙানো স্বর আবার শোনা গেল. 'বুঝলি লেখক, থাকব না এখানে আর। এখানে আমাকে কেউ আমার মত কাজ করতে দেবে না। চ্যাটার্জী তো নয়-ই, জীবন-কৃষ্ণদাও না। জীবনকৃষ্ণদা একবার আমাকে একটা ছবি করতে বলেছিলেন, একটা অত্যন্ত এলোমেলো গল্প, সুপারভিশন ওঁর— প্রতি পদে পদে চিত্রনাট্য উনি দেখে নেবেন, হয় তো ফ্লোরে এসেও আমাকে নানা ভাবে উপদেশ দেবেন। আমি তা পারি না। সুরঞ্জন, বিধান ওরা সবাই আমাকে অফারটা এ্যাকসেপট্ করতে বলেছিল। করি নি। যে-কাজ আমি আমার নিজের মন থেকে করতে পারব না, তা আমি করতে চাই না। আমি কাজের স্বাধীনতা চাই। বড় স্টারদের নিয়ে, আমি আমার ছবিকে জাঁকজমকে ভরিয়ে তুলতে পারব না। কিন্তু—কিন্তু তোকে এসব কথা বলে কী হবে লেখক, তুই আমার এই বস্তু একটু চেখে দেখলি না শালা।...'

বলতে বলতে রণো আবার বোতল তুলে গলায় পানীয় ঢালল। কিন্তু এ আবার কী কথা! বেশ তো সমস্যা দুঃখ ধান্দার কথা বলছিল। তার মধ্যে আবার অন্য সুর বাজে কেন। আসলে কান পেতে শোন, অন্তরের গভীর রাগিনী যখন বাজে, তখন দুই ভাবে তালে মেলে না। কিন্তু আমার তো মিলছে। রণোর সৃষ্টির সমস্যা না বুঝতে পারি, ওর দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। তবু বললাম, 'তুই যদি বলিস, তা হলে আমি খাব, কিন্তু আমি

কি এ বস্তু গলায় ঢালতে পারব। তোর মত শক্তি তো আমার নেই।'

এবার শোন গর্জন, 'শালা! শালা আমার শক্তি দেখাচ্ছে। আমার যদি শক্তিই থাকবে, তবে আমি এ দেশে পড়ে আছি কেন। কই, তোকে তো এখানে অনেকে ডেকেছে, তুই তো আসিস নি। এই যে চ্যাটার্জী তোকে অফার দিল, তুই দিব্যি কেস্‌টো মার্কা হাসিটি দিয়ে, মাথা নাড়িয়ে চলে এলি, আমি তো তা পারি নি। তুই এলি, মাল ঝাড়ীল, এবার কেটে পড়বি। আমার কাজটা তো তা নয়। আমাকে এদের চাকরি করতে হবে। এদের হাত-ধরা হয়ে থাকতে হবে। তোকেও ওরা সেই ভাবে পেতে চায়। তুই কখনোই তা নিবি না। আর আমার শক্তির কথা বলছিস।'

আবার ঢক ঢক করে গলায় ঢালল। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'তোর রাস্তাই ঠিক। বাঙলা দেশে ফিরে যেতে হবে। আমার জায়গা বম্বে না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে, দরজায় দরজায় ঘুরে, ভিক্ষে করে, যে ভাবেই হোক, আমাকে কাজ শুরু করতে হবে। এভাবে আমি আর বসে থাকতে পারছি না। আর দু' একটা মাস দেখব, তারপরে ফিরে যাব। এখানকার রুপোর জেল্লা আর রূপ আমার মনে ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। স্টুডিওগুলোতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। ওরা নিজেরাই জানে না, ওরা কী করছে। অবিশ্যি আমি বলছি না, এখানে কেউ কিছু করছে না। কিন্তু অধিকাংশই বোঝে টাকা আর সেক্স্। না না, এখানে আর না, এবার চল কলকাতা।'...

এখন রণোর গলায় যেন নতুন সুর বাজছে। আশার সুর। কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আপাততঃ বম্বে ওর জায়গা না। কলকাতার মাটি খুঁড়েই ওকে আপন ধন আবিষ্কার করতে হবে। অন্ধকারে সমুদ্রের ফেনপুঞ্জ হাসি যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ সময়ে দূর থেকে দুটি ছায়া এগিয়ে এল। কথায় বলে, চোরের মন বোচ্‌কার দিকে। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। শুকনো ডাঙার দেশে বসে, রসে গলা ভেজানো হচ্ছে। পুলিশ আসছে না তো? রণো ডেকে উঠল, 'রামু।'

অন্ধকার থেকে জবাব এল, 'ইয়েস স্যার।'

'হুজ্ দেয়ার ?'

'য়োর ফ্রেন্ড স্যার।'

যাক, বাঁচা গেল। কিন্তু দোস্তটি কে ? নিশ্চয়ই রসের সন্ধানী। মূর্তিটি দেখে মনে হচ্ছে, বেশ লম্বা, পাতলুন-সার্ট শোভিত ! দূরের আলো এখানে একটু ফিকে রোশনাই দিয়েছে। রণো হাঁক দিল, 'কে রে ?'

জবাব এল, 'হামি রে হামি, তেরে রতন।'

রণোও বাজল তেমনি সুরেই, 'আরে শালা, পাঁচলাখিয়া রতন-কুমার, তুই এখানে কেন ? মাতাল হয়েছিস নাকি ?'

রতন নামক মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। কিন্তু পাঁচ লাখিয়াটা কী বুঝতে পারছি না। একি বম্বের সেই রূপকুমার রতন নাকি ? কাছে এসে, তার নিজের মত বাঙলায় বাত দিল, 'কেনো হামি মাতাল হোবে ? এখোন তো মাতাল বনবে। মেজাজ বিলকুল খারাপ, তো সী বীচে চলে আসে। কোই দেখতে পায় তো মুশকিল। ইধারেই আসতে লাগে। রামুর সাথে দেখা হোয়ে গেল, বোললো রণোবাবু ইধার আছে। হামি ভাবে, ঠিক হ্যায়, আজ কাণ্ট্রিলিকার পিয়েগা।'

রণো বলল, 'কেন বাবা, আবার এসব শখ কেন ? তোর মত স্টারের পেটে এসব সইবে না। স্কচ না হলে তোদের চেহারা বদলে যাবে।'

রতনকুমার ধপাস করে বালির ওপর বসে বলল, 'হটাও শালা চেয়রা, এক রোজ কাণ্ট্রিলিকার পিনেসে যদি চেয়রা বদল হোয়ে যায়, তো যানে দো ! এ রামু, এক বোতল লাও ইয়ার।'

চমৎকার ! রসিক জানে রসের সন্ধান। রামুকেও চেনে। রতন আবার বলল, 'দেখ্ রণো, এখোন রতনকুমার পাঁচ লাখ টাকায় ছবি করে। কিন্তু এই সী বীচেই তো দারু পীতে শিখেছি। যখোন হামি রতনকুমার হোয় নাই, তখোন তো কাণ্ট্রিলিকার পিয়েছি। হামার ঘরে ভি কাণ্ট্রিলিকার থাকে।'

বোঝা গেল, ইনিই তা হলে সেই রতনকুমার ! আত্মপরিচয়ে নিজেই ভাষে। অস্পষ্ট হলেও, কুমারের গোরা রঙটি বোঝা যাচ্ছে। কপালে এলানো চুল ? কোনদিন কি ভেবেছি হে, এমন একজন রূপকুমারকে বালিতে চেপে বসে, দেশি মদ্য পান করতে

দেখব। রণো বলল, 'সে তো তোর শখ। ঘরের সেলারে, স্কচের পাশে দিশি রেখেছিস, স্রেফ লোক দেখাবার জন্য ! খাস ক'দিন ?'

রতন বলল, 'ফ্রিকোয়েণ্টলি, আপন গড রণো। কাণ্ট্রিলিকারের আলোক্ মেজাজ, দ্যাট'জ্ ইন্ মাই ব্লাড।'

ইতিমধ্যে রামু আর একটি বোতল এনে রতনকুমারের হাতে তুলে দিল। রতনকুমার বলল, 'গুড !'

রণো আমাকে দেখিয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে আমার এই বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে বাঙলা দেশের একজন প্রখ্যাত (এবার রণোকেও আমার একটি গালাগাল দিতে ইচ্ছা করছে।) লেখক। জীবনকৃষ্ণদা এর একটা গল্প কিনেছেন।'

রণো আমার নামটা বলতে, রতনকুমার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলে উঠল, 'আহ্হা ! আপনার নাম তো আমি শুনেছি। আপনার গল্পে কাজ করার জন্য, আমি তো জীবনকৃষ্ণদার কাছে চুক্তি সই করেছি।'

করমর্দন করে বললাম, 'শুনে খুব খুশি হলাম।'

রতন তাতে থামল না। বলল, 'আহ্হা, আপনার উপন্যাসে তো অথর নিজেই হিরো। চমৎকার, দাদা আপনার সঙ্গে আমি একটু মিশব। দু'দিন আমার কাছে থাকুন !'

রণো গর্জে উঠল, 'এই শালা, এখন তোদের ওসব ফিল্মি বাত রাখতো। মাল টানতে এসেছিস, তা-ই টান। লেখকের সঙ্গে পরে কথা বলে নিবি। তবে এ লেখক তোর থেকে ঘাগী মাল, দেখিস যদি কিছু বাগাতে পারিস।'

রতন বাংলায় বলল, 'জরুর বাগাবে। হামি দাদাকে একদম কার্বন কপি করবে, দেখে লিস্।'

বলে, বোতলের ছিপি খুলে, আমার দিকে এগিয়ে দিল। আবার ইংরেজিতে বলল, 'দাদা, এবার আমার বোতলটা আপনি উদ্বোধন করুন।'

যে যার নিজেতে আছে। হেসে বলি, 'আপনি পান করুন, আমার এটা চলবে না।'

'সে কি দাদা, আপনি রণোর বন্ধু, আপনার এসব চলে না ?'

বললাম, 'পারি না।'

রণো এখন ওর পুরনো সুর খুঁজে পেয়েছে। বলল, 'অথচ ও

পারে সবই। এ ভাবেই ওকে বুঝতে শেখ রতন, ব্যাটা ঘোরেল ঘুঘু।'

আহ্! কী সুন্দর বিশেষণ আমার প্রতি। না হেসে পারি না। রতন বলল, 'তা হলে দাদা আমার বাড়ি চলুন, আপনার যা ইচ্ছা, তা-ই পান করবেন।'

আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'ব্যস্ত হবেন না। এটা আমি খুব প্রয়োজনীয় মনে করছি না।'

রণোর ধরতাই সঙ্গে সঙ্গে, 'কিন্তু আমরা মদ খেয়ে মাতলামি করব, সেটা দেখা ওর খুব প্রয়োজনীয়। একে বলে লেখক।'

আর একে বলে রণো। একে বলে রণোর বাত। জানি বিষ নেই, খাঁটি মধুতে একটু তিক্ততা থাকে, উষ্ণতাও থাকে। সেটাই নিয়ম। অতএব, রতনকুমার, 'উইথ য়োর কাইন্ড পারমিশন' বলে, রণোর মতই গলায় পানীয় ঢালল। পকেট থেকে বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বের করে, আমাকে দিল, নিজে নিল। সেই ফ্যাচাকল না খ্যাচাকল বলে, তা-ই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল। এক লহমায় রুপোলী পর্দার নায়কের মুখখানি দেখলাম। অস্বীকার করার উপায় নেই, সুন্দর আর সুপুরুষ চেহারা। 'কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মত।' সত্যি, কে জানতো, লক্ষ পুরুষের মন মাতানো, কোটি মেয়ের প্রাণ মাতানো, রুপোলী পর্দার এই নায়ককে দেখব এমন পরিবেশে। তা তোমার সেই কী বলে, রুপোলী জগতের আঁতেলেকচুয়েল, তারকাদের সম্পর্কে তারা যতই ঠোঁট উল্টাক আর নাক কোঁচকাক, সাগর সৈকতের আঁধারে, এই বালির ওপরে থেবড়ে বসা, দেশী চোলাই, চোরাইও বটে, সুরার বোতল নিয়ে বসা তারকাটিকে দেখে, আমার মন গলছে। পাঁচ লাখ টাকা তো সে ভিখ্ মেগে নেয় না। তোমরা দাও। তবে তো নেয়। যারা দেয়, তারা যে কী দায়ে দেয়, সিটি কি কেউ বোঝে না! তবে বলি, কলকাতায়, কলকাতার দরিদ্র রুপোলী জগতে, কোন্ পরিচালকের টাকার দক্ষিণা সব থেকে বেশি? সে টাকার অঙ্কও তো কম না। অনেক তারকার থেকে, অনেক বেশি। কেন? যে কারণে রতনের পাঁচ লাখ, সেই কারণেই। কারণ কলকাতায় সেই পরিচালকের ছবি বিকোয়, তাঁরই নামে-ডাকে। তাঁর ছবিতে তিনিই তারকা, যারে কয় ইস্টার। হিসাব করে দেখ গিয়ে, দুয়ে দুয়ে

চারই হয়। কলকাতার সেই পরিচালক এই আরব সাগরের কূলে এলে, পাঁচ কেন, আরো অনেক বেশি লাখেও বা বিকোবেন। এই কলের এই রকম কারবার।

রতনকুমার তার বিদেশী রাজা মাপের সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল রণোর দিকে। জিজ্ঞাসার ভাষা এইরকম, 'লিবে?'

জিজ্ঞাসার কারণ আছে। জবাব এই রকম, 'আ বে স্সালা পাঁচ লাখিয়া, আমি তোর মত নেশার নামে ফুটানি করি না। আমি আস্লি নেশা করি।'

রতনকুমার বালির ওপরে প্যাকেট রেখে দিয়ে বলল, 'উ তো হামি জানে। ইস্ মে তুমার বিড়ি সে কম্তি নাশা হোয় না।'

'আবে রাখ্ তোর নাশা।' রণোর জবাব।

দু'জনেই একসঙ্গে, বোতল তুলে গলায় ঢালল। একই পানীয় দু'জনে, বড় আনন্দে গলায় ঢালতে পারে। কিন্তু ধোঁয়ার বিপরীত। তা হোক। রতনকুমারের দোষ দিতে পারি না। যার যে রকম চলে। তারপরেই রতনের নতুন জিজ্ঞাসা, 'তো রণো, তুমার ছবি কব্ বন্ছে।'

রণোর জবাব, 'চিতায় উঠলে।'

এতটা নাউ নুচি নেবুর মত বাঙলা বুলি, রতনকুমারের জানা নেই। জিজ্ঞেস করল, 'চিতায় কী হোয়?'

রণো বলল, 'বুঝলি না? বার্নিং ঘাটের আগুনে যখন আমাকে পোড়ানো হবে, তখন আমার ছবি হবে।'

রতন বলে উঠল, 'তোবা তোবা। উ হোয় না, উ হোয় না। কেনো তুমি বারনিং ঘাটে যাবে।'

'তা না হলে আমার ছবি হবে না।'

'না না রণো, এটা ঠিক বাত হোয় না। তুমি ছবি বানায়, হামি কাজ করবে, মগর বাঙলা পিক্চার।'

রণোর ভাষা, 'শালা, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। পাঁচ লাখিয়া কাজ করবে আমার ছবিতে! পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারব না।'

তারকার জবান, 'কেনো রণো, হামি তুমাকে জবান দিয়েছে, তুমার ছবিতে হামি টাকা চায় না।'

রণো তাতেও দমে না, বলল, 'তোমাকে হাওয়াই জাহাজে

যাওয়া-আসা করাব, কলকাতার ফাইভ স্টার হোটেলে রাখব, তাতেই আমার দম বেরিয়ে যাবে চাঁদ।'

কিন্তু রতনকুমারের কথা কেবল কথার কথা না। তা-ই সে যুক্তিতে যাঁচে, 'তো কী হোয়, হামি ট্রেনে পী'স্‌ফুলি ট্রাভেল করতে পারে? ক্যালকাটা সে তুমার ঘরে হামাকে রাখতে পারে? আই হ্যাভ নো অবজেকশন, মগর নতিজা দেখতে হোবে।'

এবার দেখ রণোর আচরণ। আলো আঁধারে দেখতে পেলাম, ওর একটা হাত উঠে গেল রতনকুমারের মাথায়। চুলগুলো আস্তে নেড়ে দিয়ে, নরম গলায় বাজল, 'জানি রে রতন, তুই যা বলছিস বুঝতে পারছি। তুই ট্রেনে যাচ্ছিস শুনলে, বম্‌বে-কলকাতার সমস্ত স্টেশনে ভিড় লেগে থাকবে। আর কলকাতায় আমার বাড়িতে? তুই থাকবি? পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু রতন তুই যা ভাবছিস, তা কবে হবে, তা আমি জানি না।'

রণোর হাতটা ঝরে পড়ল রতনের কাঁধে। দু'জনেই বোতল তুলে গলায় ঢালল। রতন এবার গম্ভীর স্বরে বাজল, 'রণো, বম্‌বে তোমার প্লেস্‌ না। তুমাকে কোই কাজ দিবে না। এভরিবডি তুমাকে লিয়ে হাসে, জোক করে, তুমার মিস্টার চ্যাটার্জী ভি। থোড়া দিন পহ্‌লে, এক বিগ প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটর মিস্টার চ্যাটার্জীকে বাতাচ্ছিল, কেনো সে রণোবাবুকে ধরে রেখেছে। হামার সামনে বাত্‌, দুখ্‌ না পায় রণো, তো মিস্টার চ্যাটার্জী হাসি করলে, বাতালে, দুম্‌বা কো গোস্ত্‌ বান্‌তা, কোই দিন খায়েগা। তো বিগ প্রডিউসার বাতালে, রণোবাবু দুম্‌বা ভি নহি।'

এই নিষ্ঠুর কথাগুলো রতনের গলায় বাজল এক গভীর ব্যথা গম্ভীর স্বরে। রণোর হাতটা রতনের কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর মত গুণী ছেলের, কথাগুলো কোথায় বেজেছে, একটু অনুমান করতে পারি। আর তা পারি বলে, একটা অসহায় ব্যথা আর ক্ষোভে, আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। রণো সহসা কোন কথা বলল না। রতন গলায় বোতল উপুড় করে ধরল। রণো তাও করল না। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, পাথরের মত স্থির হয়ে রইল। দেখছি, আরব সাগরের ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গের ফসফরাসে হাসির ঝলক। একটু আগে,

রণোর সঙ্গে এসব কথাই হচ্ছিল। কিন্তু ওকে নিয়ে, এই হাসি-ঠাট্টার নিষ্ঠুর দিকটা আলোচিত হয় নি।

রণো হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। বোতল তুলে গলায় ঢালল। আধ ফুট লম্বা বিড়ি ধরাল। বলল, 'ঠিক বলেছিস রতন, বম্‌বে আমার জায়গা না। তুই আসবার আগে, আমার এই লেখক বন্ধুর সঙ্গে, এসব কথাই হচ্ছিল। আমি ডিসিসন নিয়েছি, খুব শীগগির কলকাতায় ফিরে যাব। যেমন করে হোক আমি কাজ আরম্ভ করব।'

রতন বলে উঠল, 'ভেরি গুড।'

রণো আবার বোতল গলায় ঢেলে বলল, 'আর আজ তোকে এই জুহু সী বীচে বসে বলে যাচ্ছি, ওই মিস্টার চ্যাটার্জী, কিংবা তোর ওই বিগ প্রড-ডিস্ট্রিবিউটর, একদিন আমার কাছে ছুটে যাবে।'

রণোর গলা শোনাল যেন, ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কোন শপথ বাক্য উচ্চারণ করছে।

[জুহু সী বীচের এ কথা আজ যখন লিখছি, তখন কি আমার বলা উচিত হবে, বেশ কিছু বছর আগে, রণো যখন সেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিল, তা ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ওর প্রতিভা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ না, বিশ্বের দরবারে ওর প্রতিভা আজ স্বীকৃতি পেয়েছে।]

রতন বোতল শূন্যে তুলে আওয়াজ দিল, 'হেইল্‌ রণো! উসি দিনের রাস্তায় হামি দেখে।'

বলে, বোতল একেবারে শূন্য করে গলায় ঢালল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'দাদা এখোন আপনার একটু রণোর হেলথ্‌ টেস্ট করা দরকার। হেই রামু।'

অন্ধকার থেকে জবাব এল, 'ইয়েস স্যার।'

রতন আওয়াজ দিল, 'জেরা দেখ্‌ ভাল্‌ করো জী। কিক্‌ নহি দে রহে।'

রামু ছুটে এসে শূন্য বোতল রতনের হাত থেকে নিয়ে, হিন্দীতেই জবাব দিল, 'চিজ্‌ তো খারাপ নহি দিয়া স্যার। ঠিক হ্যায়, আভি লে আঁতে।'

রতন আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লিন দাদা।'

এতে আমার 'না' নেই। কিন্তু এই সমুদ্র সৈকতে বসে, গলায় বোতল ঢেলে, রণোর স্বাস্থ্য পানে আমার 'না।' তবে এবার দেখছি, রতনকুমার মোগল হয়ে উঠল। বোতল আনতেই, ছিপি খুলে আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লিন দাদা, এক সিপ্। বেশি না।'

আমি নিরুপায়ের ভঙ্গিতে, রণোর দিকে তাকালাম। ওর বয়েই গিয়েছে, ফিরেও দেখল না। কিন্তু রতনে আমার কিঞ্চিৎ মন মজেছে। বাঙালীরই তো কথা, উপরোধে নাকি ঢেঁকিও গিলতে হয়। তবু বললাম, 'এ জিনিস এ ভাবে কখনো খাই নি।'

রতন বলল, 'কিছু হোবে না দাদা, ওনলি ওয়ান সিপ্।'

বোতল হাতে তুলে নিলাম। ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা। উঁচু করে ধরে, মুখে ঢালতে না ঢালতেই মনে হল, জিভ্ পুড়ে গেল। মুখে ধরে রাখার চেয়ে, তাড়াতাড়ি গিলে ফেলতে হল। তাতেও মনে হল, গলা জ্বলে গেল। মুখ ভরে উঠল লালায়। চোখে জল এসে পড়ল। আহ্, সুধার কি স্বাদ হে। রণোর কথা না হয় আলাদা। এই পাঁচ লাখিয়া তারকা কী করে পারে। তাড়াতাড়ি বোতলটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে, রুদ্ধ গলায় বললাম, 'ধন্যবাদ, নিন।'

রতনের খুশি গলা বাজল, 'থ্যাংকু দাদা, কোই ট্রাবল ?'

বললাম, 'হরিবল্।'

রতন হেসে বাজল। আর রণো গরগরিয়ে উঠল, 'শালা।'

ওটাও আমাকেই। কারণ শেষ পর্যন্ত যে এই অমৃতের বিষের স্বাদ নিতেই হল। কিন্তু রণোর হাত থেকে তা নেওয়া হয় নি। অতএব ও বিশেষণটি আমার প্রাপ্য। রণোই আবার ওর পুরনো সুরে বাজল, 'গুলি মারো এ সব কথায়। তা হ্যাঁরে পাঁচ লাখিয়া, তোর ফুলটুসি···(অশ্লীল বিশেষণ) কোথায় ?'

কিন্তু রতনের তাতে কোন বিকার নেই। বলল, 'রাত ন'বাজে তক্ রীনার শুটিং আছে। ইস্‌কে বাদ খালাস।'

রণো বলল, 'তারপরে রীনার বাড়িতে তোমার গমন হবে, দু'জনে সারারাত্রি মাতামাতি করবে।'

নাহ্, রণোর মুখে দেখছি কোন কথা আটকায় না। কিন্তু রীনা নামটি যেন খুবই শোনা শোনা লাগছে। শোনবারই কথা।

তিনি এই নগরীর রুপোলী জগতের নামী তারা। যেমন লাস্যে, তেমনি হাস্যে, রীনা তারকা রূপসী উর্বশী। এই ফেনিলোচ্ছল আরব সাগরের মতই তার যৌবনের তরঙ্গে রুপোলী জগতের ভক্তেরা মুগ্ধ। জানা গেল, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সেই তারকা ছায়া, তারপরে কায়ায় ফিরে আসবে। চোখে দেখি নি, শুধু চিত্র দেখেছি। কিন্তু মাতামাতির কথাটা কী ?

রতনের জবাবে তার ধরতাই পাওয়া গেল, 'মাতামাতি কা কী আছে বোলো রণো। রীনা ঘরে ব্যাক করবে, ড্রিংক চালাবে, হাসবে আর রোবে, হামাকে সামাল্‌তে হবে।'

রণোর বাজখাই গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, তুমি তো শালা রোজ সামলাতেই যাও। সারা রাত ধরে সামলে, ভোরবেলা বাড়ি ফেরো। আমার আর কিছু জানতে বাকী নেই।'

রতন খানিকটা অসহায় স্বরে বলল, 'সবকোই এক বাত বলে। মগর রণো, তুমি বিশওয়াস্ করে, হাম আর পারে না।'

'তবে তোমার যাওয়া কেন ?'

'সে বাত্ তুমার জানা আছে রণো।'

'মহব্বত ?'

'ইসকো মহব্বত বোলে কি ঔর কিছু বোলে, হামি জানে না। তুমি জানে, রীনা কী রোকোম পাগলামি করে। হামাকে না পেলে, সারা রাত ঘুম্‌বে, মাতাল হোয়ে গাড়ি ড্রাইভ করবে। আসলি মে কী জানো রণো, রীনার একঠো হাজব্যাণ্ড দরকার। উস্‌কি সাদী হোনা চাহি।'

রণো বলল, 'তবে সেটা সেরে ফেললেই পারিস।'

'হামি ?' রতন বোতল তুলে গলায় ঢেলে বলল, 'তবে আর তুমাকে কী বোলে। হামার যদি সাদী করবার হোত তো, বহুত পহলেই হোত। তুমি বোলে মহব্বত, হামি বোলে প্যার, দোস্তি কা প্যার।'

রণো তৎক্ষণাৎ হুম্‌কে বাজে, 'শালা দোস্তি কা প্যার! একটা মেয়ের বাড়িতে রাতের পর রাত কাটিয়ে, এখন দোস্তি কা প্যার বোঝাতে এসেছে ? তোমাদের শালা চিনি না ? কে এখন মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইবে ?'

রতন বলল, 'কেনো, এখোনো বহুত ভারি বড় আদমি লোগ্

উসকি পিছনে ঘুমুচ্ছে। রীনা এক দফে আওয়াজ দিলে আভি সাদী হোয়ে যায়।'

রণোর সেই হুমকানো স্বর, 'কেন করবে? সে জানে, রতন-কুমারের সঙ্গে তার সাদী হবে।'

রতন মাথা নেড়ে বলল, 'কোভি নহি। তুমি উস্‌কে পুছ্‌ করে, হামি কোভি বোলে নাই, উস্‌কে সাদী করবে, উ ভি বোলে না।'

'বলবে কেন? ও জানে, তোর সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। এ কথা আবার বলতে হয় নাকি?'

'মাইরি (এ দিব্বিটাও জানে দেখছি!) রণো, তুমি বোঝো না। হামি নিজে রীনাকে কেতো বলেছে সাদী করতে। বোলে, হামার সাদী হোবে না। হামি কিসিকো হ্যাপী করতে পারবে না। হামার জীবনটা এ্যায়সাই বিত্‌ যাবে।'

রণোর কোন কথা শোনা গেল না। দু'জনেই বোতল তুলে গলায় ঢালল। আমি নতুন কথা শুনছি। রুপোলী জগতের আর এক দিকের কথা। এই চোখের সামনে ফোনিলোচ্ছল তরঙ্গের যেমন আর একটি দিক আছে। প্রাণপূর্ণ তৃষ্ণা নিয়ে, এই রুপোলী ছটার অগাধ জলে চুমুক দিলে, তার স্বাদ তিক্ত লবণাক্ত। এত জল, তবু তৃষ্ণা মেটে না। এত রূপ, এত রুপা, এত ঝলক, চলক, তবু সুর বাজে হতাশার রাগিনীতে। চোখের জলও গলে নাকি? সে সব তো জানি শুধু পর্দাতেই গলে, সেখানেই শুকিয়ে যায়। থাকে শুধু হাসি, অজস্র হাসি। তবে এমন কথা শুনি কেন।

রণো বাজল, 'তবে মরো গে শালা। তোদের এ ছাড়া কোনো গতি হবে না। টাকার পাহাড়ে শুয়ে, কাঁটার খোঁচায় মরবি। মন নিয়ে তোদের কারবার হয় না। খেয়ে খেয়ে তোদের বমি হওয়া ছাড়া আর কী হবে।'

রতনের স্বর যেন গোঙানো। বলল, 'হ্যাঁ, এ জীবনটা লিয়ে কী কোরবে, জানে না।'

রণো বলল, 'কী আর করবি, বুড়ো বয়সে, এ বয়সের মালা জপবি, তখন বেবাক রঙ ফরসা।'

রতন যেমন চমকে উঠে বলল, 'বোলে না বোলে না রণো, হামার শুনতে ডর লাগে।'

রণো গলায় বোতল ঢেলে বলল, 'যমে ছাড়ে নারে। জীবনের যা-কিছু পাওনা-গণ্ডা, সব এখানেই শোধ হয়ে যায়।'

রতন কিছু বলল না। বোতলে চুমুক দিল। আর আমি পাঁচ লাখ টাকার তারকার ভয়ের কথা ভাবছি। এমন করে কোন তারকার কথা ভাবিনি। কারোর মুখ থেকেও শুনিনি। এই যে আজকের এই জীবনটা, ঢেউয়ে তরঙ্গে দুরন্ত গতিতে গর্জমান, তা একদিন শান্ত নিস্তরঙ্গ স্থির হয়ে যাবে। হয় তো নিঃসঙ্গও হয়ে পড়তে হবে। একটি নিরিবিলি নির্জন শান্ত জলাশয়ের মত। সেই ভবিষ্যতে, জলাশয়ে দোলা লাগবে না, ঢেউ খেলবে না। কিন্তু কানে বাজবে তরঙ্গের গর্জন, চোখের সামনে ভেসে উঠবে দুরন্ত চকিত অল্প কতগুলো দিনের ছবি। তখন কি ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠবে বুকে। চোখ ভেসে যাবে জলে? ভাবতে ভয়-ই তো লাগে। একমাত্র মুক্তি বোধহয়, নিরিবিলি নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে একটি নিবিড় শান্তিকে খুঁজে নেওয়া। নিস্তরঙ্গ নিরিবিলিতেই যা সম্ভব।

রতনের হঠাৎ আমার দিকে খেয়াল পড়ল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কিছু বোলেন দাদা। জীবনকৃষ্ণদা আপনার যে স্টোরিটা লিয়েছেন, উস্‌কে হীরোকে ক্যারেকটর ক্যায়সা আছে।'

রণো জবাব দিল, 'কিছু না। তোকে গরু চোরের মতো মুখ করে, একটা মেয়ের সঙ্গে খালি প্রেম করে যেতে হবে।'

রতন উচ্চারণ করল, 'গরু চোরের মতো? সেটা কী হোয়?'

'কী আবার। তোমার ভাবখানা হবে, যেন সব সময়েই চোর দায়ে ধরা পড়ে আছ। এই লেখক শালা যা করে। আর ওই ভাবটি করতে পারলেই, মেয়েরা জখম।'

এবার আমিও হেসে বাজি। চোর দায়ে ধরা পড়া ভাবের পুরুষের প্রেমেই যে মেয়েরা পড়ে, এত দিন তা জানা ছিল না। তাও রণোর ভাষায়, প্রেমে পড়া মানে জখম। রণো আমাকে ধমক দিল, 'থাক শালা আর হাসতে হবে না।'

রতন বলল আমাকে, 'হামি কী একটা কথা বোলে দাদা, চলেন, হামি আর আপনে পুগা নহি তো মাদ্রাজ চলে যায়। কিছু রোজ থাকে, বাতচিত কোরে, আপনে আমার গেস্ট। আপনার সঙ্গে ঔর ভি স্টোরি লিয়ে হামি ডিসকাস করবে।'

রণো বেজে উঠল, 'হ্যাঁ, যা রে যা লেখক, ক'দিন ফূর্তি লুটে

আয়।'

রতন বলল, 'ফুর্তি কেনো রণো?'

রণো হেঁকে বাজল. 'ফুর্তি নয় তো কী রে শালা। লেখককে লিয়ে গিয়ে তুমি রাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাবে, যাতে তোমাকে হীরো বানানো যায়। আর যত বিদেশী ছবির গল্প মারার ফন্দী শিখিয়ে দেবে। তোমাদের জানি না?'

রতন মাথা নেড়ে বলল, 'না না, রাইটার দাদাকে হাম সেরকম কোই বাত বোলবে না।'

'চুপ কর।' রণো ঝেঁজে বলল, 'তুই একটা বাংলাদেশের লেখককে বগলদাবা করে পুণা-মাদ্রাজ নিয়ে যাবি, আর কাজ না বাগিয়ে ছাড়বি? তার ওপরে তুই এখন প্রোডাকশনে টাকা খাটা-বার তালে আছিস।'

রতনের তথাপি মাথা নাড়া। বলল, 'না না, এ রকম কোনো কথা হোয় না। দাদা হামাকে হামার ক্যারেকটর সন্‌ঝিয়ে দেবে, ঔর কুছ্‌ কহানি ভি শুনাবে, ঔর দোনো মিলে বহুত আচ্ছা মারবে। রাইটার দাদা কো সাথ্‌ হলি ডে মানাবে, বম্‌বে ফিলম্‌ ওয়ার্লডকে বাহার যাবে।'

রণো তথাপি ঝাঁজে বাজে, 'আর কাঁড়ি কাঁড়ি মদ খাবে। তারপরে তুমি শালা যেখানেই যাবে, সেখানেই ছুঁড়িদের ভিড় লেগে যাবে, তখন কে কাকে দেখে।'

রতনের তেমনি মাথা নাড়া। কিন্তু রণোর 'তখন কে কাকে দেখে'-এর মানে কী। মনের কথা নিজের মত করে ব্যক্ত করতে ওর জুড়ি নেই। তা বলে, ওর কথায় যারা 'ছুঁড়ি'—(রণো কিছুই বাকী রাখল না।) তাদের নিয়ে আমিও মেতে যাব নাকি? প্রাণের ভয় বলে আমার কিছু নেই? রতনকুমার যা পারে, তার যা সাজে, পশরা মাথায় নিয়ে আসা ফেরীওয়ালা তা পারে না। সাজে না তো বটেই।

রতন বলল, 'তব্‌ তুম ভি সাথ চল রণো।'

'মাথা খারাপ। পাঁচ লাখিয়ার সঙ্গে দিন-রাত্তির! মারা যাব।' বলে, বোতল তুলে, একেবারে শূন্য করে ঢেলে দিয়ে, পাশেই বালির ওপর ঝুপ করে ফেলে দিল বোতল। প্রায় গোঙানো স্বরে বলল, 'তার চেয়ে যা, লেখককে নিয়ে যা। তোকে নিয়ে ওর নতুন কিছু

একস্‌পিরিয়েন্‌স গ্যাদার হবে।'

রতনও বোতল শূন্য করে বালির ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'ও কে। কব্‌ যাবেন দাদা বোলেন, দো দিন হামাকে টাইম দিতে হোবে।'

যাক্‌, তবু এতক্ষণে কথার স্রোত আমার দিকে বাঁক নিল। যদিও আমারই যাওয়া নিয়ে কথা। বললাম, 'আপনার সঙ্গে যেতে পারলে খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমার হাতে আর তেমন সময় নেই, ফিরতে হবে।'

রতন বলল, 'তিন-চার রোজ কি লিয়ে চলেন।'

নিরুপায়ে হাসি। রতনকুমারের কথার মধ্যে এখন পানীয়র ঝোঁক লেগেছে। ঝোঁকটা মেজাজেও। আবার বলল, 'প্লেনে যাবে আসবে, টাইম কে লিয়ে কোনো ফিকির নাই। ঠিক আছে দাদা?'

নিরীহ অনুনয়ে বলি, 'এর পরে যখন বম্‌বে আসব, তখন আপনার সঙ্গে যাব।'

রণো তাড়াতাড়ি, প্রায় জড়ানো স্বরে বলে উঠল, 'চেপে ধর রতন, ব্যাটা কাটছে। পাঁকাল মাছ।'

বলতে বলতেই রণো উঠে দাঁড়াল। ওর লম্বা ঋজু শরীরটা যেন একটু টলমল। কোঁচা লুটোচ্ছে বালিতে। রতন বলল, 'দাদাকে হামি ছাড়বে না, ম্যানেজ করবে।'

ভয় পাব কী না, বুঝতে পারছি না। রতনকুমারের ম্যানেজের রকম-সকম আমার জানা নেই। লুঠ করে নিয়ে যাবে না তো! ঝাপসা অন্ধকার থেকে রামু আবার ভেসে উঠল। তার গলা শোনা গেল, 'নো মোর স্যার?'

রণোর এখন মাতাল স্বর, 'আরো? কেন বাবা, আজ কি এখানেই ফেলে রাখতে চাও? মন্দ না অবিশ্যি। কিন্তু আমার ঘরে যে বউয়ের বাড়া মানুষ আছে, সে আমাকে খুঁজতে এখানে চলে আসবে।'

সে আবার কে হতে পারে। রামুর বাঙলা কথা বোধহয় বুঝতে পারল না। রতন উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, 'সে কে হোয়?'

রণো বলল, 'কেন, আমার কেন্টমানিক?'

তাও তো বটে। ভুলেই যাচ্ছিলাম, রণো একলা না, ওর কেন্ট

আছে। আমিও উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি এখানেও আসতে পারে নাকি ?'

রণোর লম্বা শরীরটা যেন বাতাসের ঝাপটায় টাল খেল। বলল, 'পারে মানে ? অনেকবার ধরে নিয়ে গেছে। একেবারে প্রেমিকা যাকে বলে। মারো ধরো বকো, হারামজাদা কথা শোনে না। বলে, রেঁধে-বেড়ে একলা খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতে ও পারবে না। শুনলে বীণাটাও বোধহয় হিংসে করত।'

ওর স্ত্রীর কথা বলছে। ইতিমধ্যে রতনকুমার তার পাতলুনের উরতপকেট থেকে বের করেছে বেশ মোটাসোটা একটি চামড়ার ব্যাগ ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল কয়েকটি করকরে কাগজের টাকা। তবে কাগজের শব্দ আর টাকার শব্দ আলাদা, শুনলেই কানে বাজে। ডেকে বলল, 'লাও রামু।'

রামু কাছে এসে হাত বাড়িয়ে করকরে নোট নিয়ে, গুণে দেখে বলল, 'বহুত জায়দা দিয়া সাব।'

রণো ঝুঁকে গলা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চুপ রামু, রতনকুমারের ব্ল্যাক টাকা। য়ু বেটার ইনসিস্ট্ ফর মোর।'

ঝাপসা অন্ধকারে মনে হল, কালো রামুর শাদা দাঁত, দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঝলকাচ্ছে।

রণোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, সে একেবারে সাহেবি কেতায়, রতনকুমারের দিকে ঝুঁকে সম্মান জানাল, শব্দ করল, 'থ্যাংকু স্যার। মেনি থ্যাংকস্।'

রণো পা বাড়িয়ে বলল, 'এখন চল তো পাঁচলাখিয়া, আমাদের পৌঁছে দেবে তোমার গাড়িতে।'

রতনকুমারের গলার আওয়াজও বেশ মোটা। বলল, 'হাঁ চোলে। গুডনাইট রামু।'

'গুডনাইট স্যার।'

আমরা তিনজনেই জুহু তীরের আলোর সীমায় ফিরে চললাম। এখন ভিড় অনেক কম। আলোর ঝলকও কম। কখন যেন আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। লক্ষ্য পড়ে নি। সেই আলোয় দেখি, অস্পষ্ট নারকেল গাছে, একটু বাতাস লেগেছে। কিন্তু রতনকুমার সোজা রাস্তার পথিক না। কেন না, রুপোলী জগৎ তার অনেক স্বাধীনতা হরে নিয়েছে। তাই দেখি, একেবারে হোটেল

সারির, নিচের আঁধার-কোল ঘেঁষে, কোণ বরাবর গাড়ি দিয়েছে রাস্তার দিকে। যেদিক দিয়ে লোক চলাচল নেই। রাস্তায় উঠে, বাঁয়ে খানিকটা গিয়ে ঠেক। তারপরে দেখ, কাকে বলে ময়ূরপঙ্খী নাও। আমার চোখে সেইরকম। এই নগরীতে এসে ইস্তক, এয়ার ও'য়ার নানা প্রকারের আরামদায়ক নয়ন ভোলানো গাড়িতে উঠেছি। রতনকুমারেরটি সবার সেরা লাগছে। বাইরে থেকে দেখেই মনে হচ্ছে, অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায়।

এ গাড়ির হাতের যন্তর আবার বাঁয়া। রতনকুমার দরজা খুলে আগে উঠে, অন্যদিকের দরজা খুলে দিল। ভিতরে এখন বাতি জ্বলছে। আশেপাশে আরো কয়েকটি গাড়ি, কিছু নরনারী ছিল। হঠাৎ মনে হল, তাদের তাবত নজর এদিকে। নারীর উৎফুল্ল কণ্ঠে ইংরাজীতে যা শোনা গেল, তার মানে করলে দাঁড়ায়, 'বলেছিলাম, এটা রতনকুমারের গাড়ি! ওই দেখ্ রতনকুমার।'

রণো বাজল জড়ানো স্বরে, 'মরণ তোর মেয়ে। আর আগ্ বাড়িস নে, কেটে পড়। সব কাঁচা খেকো দেবতা।'

বলেই, আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'দেখছিস কী, ওঠ তাড়া-তাড়ি। এখুনি সব এসে পড়বে।'

আমি ঠেলা খেয়ে উঠলাম। রণো আমার পাশে বসে, দরজা বন্ধ করতে না করতেই এঞ্জিনে আওয়াজ উঠল। তিনজনে সামনে বসতে কোন অসুবিধা নেই। রতনকুমার দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার আগেই, মনে হল ছায়ার মত কারা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। রতনকুমার দিল দৌড়। তবু ডাকাডাকি হাত তুলে। কোথা থেকে আলো এসে পড়ল তার গায়ে। পাশে আমরা দুটো ভূত। রতনকুমারের মুখে হাসি। দেখি সে হাত তুলে সবাইকে তখন প্রীতি জানাচ্ছে। তারপরেই গাড়ি চলে যায় দূরান্তে, শহরের অভ্যন্তর দিকে। চলে না, ভাসে, যেমনটি বলেছিলাম, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মত। রতনকুমারের গাড়ি, চালক নিজে, চলেছি তার সঙ্গে, এমনটা কোন দিন ভাবি নি। এই নগরের ছবি দেখি বা না দেখি, তবু মনে হয় কেমন একটা খুশি কৌতূহলের দোলায় দুলছি। এই মন দোলানোটা বোধহয় অনেকটা শিশুর মত। যে শিশু থাকে সকল সাবালক ব্যক্তির মধ্যেই।

গাড়ি এসে দাঁড়াল এমন জায়গায়, মূলে নগরীর বাইরে বলতে পার। তবু সে আলো জ্বালানো শহর। রণো দরজা খুলে নামতে উদ্যত হয়ে বলল, 'লেখককে কোথায় নামাতে হবে জানিস তো ?'

রতনের গম্ভীর স্বর বাজে, 'জানে, সুরঞ্জনের ঘর।'

কিন্তু রণোর বাড়ি কোন্‌টা, দেখতে পাচ্ছি না। রতনকুমারের নজর সেদিকে ঠিক, ঠিক জায়গায় এসে নোঙর করেছে। হঠাৎ দেখি একটি লাইট-পোস্টের পাশ থেকে শাদা দাঁতের ঝলক দিয়ে এগিয়ে এল কৃষ্ণচন্দ্র। বলল, 'এতক্ষণে এলেন রণোদা। খুঁজতে যাব ভাবছিলাম !'

রণো ধমকে বাজে, 'তা যাবে না ? তা না হলে আর আমার হাড় জ্বালানো হবে কেমন করে। গিলেছ ?'

কৃষ্ণর কৃশ মুখের চিকচিকে হাসিটি একবার খেলে গেল আমাদের দিকে চেয়ে। বলল, 'আপনাকে না খাইয়ে আমি খাব ?'

রণোর স্বরে ভেজা ভাব পাবে না, বলল, 'মরণ ধরলে আর কী হবে। আজ আর জ্বর আসে নি তো ?'

কৃষ্ণের শীর্ণ মুখের হাসিটা করুণ। বলল, 'বুঝতে পারি নি।'

'মরো গে।'

রণো গাড়ির দিকে ফিরে হাত তুলে বিদায় নিল, 'চলি রে লেখক। রতন ওকে পৌঁছে দিস।'

রতনকুমার গাড়ি ছাড়বার আগে, কৃষ্ণ বলে উঠল, 'ভাল আছেন রতনদা ?'

রতনের মন যেন আর এখানে নেই। তার সেই সুরহীন মোটা গলা শোনা গেল, 'ভাল। তুমি ভাল আছো কিষ্ট।'

যাক্‌, পাঁচলাখিয়ার সঙ্গে বাত করে সর্বহারা কৃষ্ণ। সবাই তার দাদা। সবাই চেনা। তারপরেও কৃষ্ণ আমাকে ডেকে বলে, 'নামবেন না লেখক দাদা, চলে যাবেন ?'

বললাম, 'রাত হয়েছে। আর একদিন আসব। তোমাদের বাড়িটা কোথায় ?'

কৃষ্ণ আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই লাইট-পোস্টের পাশ দিয়ে যে গলি গেছে, তার মধ্যে।'

এ রাত্রে ঠাহর করা মুশকিল ! রতনকুমারের পঙ্খীরাজ ভাগল। কোন্‌ দিকে ভাগে, বুঝতে পারি না। দিনের বেলাতেই যেখানে রাস্তাঘাট ঠাহর করতে পারি না, এই রাতের মায়াপুরীতে আরোই অসম্ভব। রতনকুমারের গম্ভীর মোটা গলায় ডাক শোনা গেল, 'দাদা।'

বললাম, 'বলুন।'

'আপনাকে হামি রীনার ঘর লিয়ে যানে চাই।'

সর্বনাশ ! এখন এই রাত্রে, রুপোলী পর্দার ফুলকুমারীর আস্তানায় ? সুরঞ্জন আর নীলা চিন্তা করবে। তা ছাড়া, নিজেকে তো একটু জানি ! জলের মাছকে ডাঙায় টেনে নিয়ে যাওয়া কেন। কথা বলতে পারব না। কারণ বলার কিছু নেই। একটু আগেই, যে কথা শুনেছি, রতন আর রীনার কথা, তাদের মাঝখানে বসে আমার খাবি-খাওয়া ছাড়া, কিছু করবার থাকবে না। অনুনয়ের সুরে বাজি, 'আজকে রাত হয়ে গেছে, আজ ছেড়ে দিন।'

রতন এক হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে, আর এক হাতে দিব্যি সিগারেট ধরাল। ফ্যাচকলের চকিত ঝলকে তার মুখ রক্তিম দেখাল। দৃষ্টি বাইরের দিকে। যেন রুপোলী পর্দারই ছবি। বলল, 'কেনো দাদা, ই ক্যায়া ভারি রাত ? দশ তো বাজে। আপনার ভুখ্‌ লাগে ?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, ভুখ্‌ লাগে না। সুরঞ্জন চিন্তা করবে।'

আবছা আলোয় দেখি, রতনকুমারের মাথা দুলে যায়। বলল, 'সুরঞ্জনকে হামি টেলিফোন করে দেবে, শোচনে কা কোনো জরুরত নাই।'

এ সহজ ঝোঁকের কথা না, পানীয়ের ঝোঁকের কথা। কতটা গাঢ়, তা বুঝতে পারি না। কিন্তু একে বোঝাব কেমন করে, ফুলকুমারীর দুয়ারে আমার কাঁটা। আমি সেখানে কোন রকমেই বাজব না। রতনকুমার আমাকে কেন বিড়ম্বিত করতে চায়। কিন্তু ময়ূর-পঙ্খীর পালে যে বাতাস লেগেছে রীনার কূল ধরে, তা বুঝতে

পারছি। সুরঞ্জনের বাড়ির রাস্তার কিছু কিঞ্চিৎ চেনা চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়ি বলি, 'শুনুন রতনকুমার এখন আপনার বন্ধুর কাছে আপনি যাচ্ছেন যান, আমি অন্য সময় যাব।'

রতনকুমারের গলা শোনা গেল, 'অন্য সোময় না, হামি চায় আপনি আভি চলে। আফিস ঔর স্টুডিওতে দেখাটা কুছ না, উ দুসরা রীনা আছে। দাদা, আপনি একজন রাইটার, হামি চায়, আপনি রীনাকে এখোন দেখেন।'

রাইটারের কী বিড়ম্বনা! অস্বীকার করব না, মানুষ দেখতে ভালবাসি। চাখতে? তাও। তবে ভুল করো না গো মশাইরা, মন দিয়ে চাখার কথা বলছি। প্রাণের আস্বাদন দিয়ে। যদিও, চেয়েও, পারি নি। চিরদিন রূপেই আমার চোখ ভুলেছে। তারপর বিস্ময়ে আর রহস্যে, বুকের কাছে হাত জোড় করে চুপ করে থেকেছি। মনে হয়, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, কোথায় যেন আমার মাথা নত হয়ে যায়। রীনার মতো রূপোয় বাঁধানো, রূপকুমারীকে দেখতে আমার অসাধ নেই। কিন্তু স্থান কালের কথাটা যে ভুলতে পারি না। একটু আগেই তার সম্পর্কে যে কথা শুনেছি, সঙ্কোচ-বোধ সেইজন্যই বেশি। না হয় রূপকুমারী রীনার রাত্রের রূপ না-ই দেখলাম। অন্য সময়েও আমার লেখকের চোখ তাকে দেখে ধন্য হতে পারবে। আবার না বলে পারলাম না, 'দেখুন, আমার দেখাটা, একজন সাধারণ মানুষেরই। সেই চোখকে লেখকের চোখ তৈরি করে আলাদা কিছু দেখা যায় না।'

রতনকুমার যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইজ ইট দাদা?'

বললাম, 'হ্যাঁ, লেখকের চোখ বলে আলাদা কিছু নেই। দেখার চোখ সকলেরই এক। মনটা অবিশ্যি আলাদা।'

রতন বলে উঠল, 'দ্যাট দ্যাট, হামি মনের কথা বোলে। আপনি একবার রীনাকে দেখেন, আপনার মন দিয়ে দেখেন, আপনি সমঝাবেন, কী একটা ক্যারেকটর। আপনি রাইটার আছেন।'

আবার সেই রাইটার। যে দেখে, সে-ই লেখে না। কিন্তু যে লেখে, সে-ই কি দেখে। তা বোধহয় না। হাসি কান্না, রাগ দুঃখ, শোক সুখ, সকলের মনে আছে। মানুষ তো ভিন্ন না। আন্ মানুষের কথা আলাদা। অন্যকথায় বলি, মানুষ সব সমান। যেমন যেমন ঘটনা দেখে, সকলের এক জায়গাতেই বাজে। লোকে এক-

সঙ্গে কাঁদে কেন। রাগে কেন। হাসে কেন। দেখার প্রতিক্রিয়া সকলের সমান। হ্যাঁ, কথা আছে তারপরেও। দেখা আর প্রতিক্রিয়া—আঁচরাৎ শেষ, সেটা এক রকম। কিন্তু কেউ কেউ ভাবে। যাকে ভাবায়, তার কথা আলাদা। তখন তার মনে মনে দেখা। তখন তার চোখে দেখার, তাৎপর্যের সন্ধান। তাৎপর্যের সন্ধানীর চোখে তখন অনেক কিছু বদলে যায়। উচ্ছল হাসির পিছনে সে, ফেনিলোচ্ছল লবণাক্ত চোখের জলের ধারা দেখতে পায়। দুর্জয় রুদ্ধকে দেখে ভীরুর রূপে। শক্ত পায়ে চলা মানুষটাকে মনে হয়, সারা জীবনটা যেন লোকটা খুঁড়িয়ে চলেছে। এই দেখাটা অনেক পরের দেখা। এই দেখাটা সেই দেখা, যখন একজন একলা ঘরে, আপন মনে, কলম নিয়ে কাগজে দাগ বুলিয়ে দেখে, বলে। তখন সে লেখক, তখন তার দেখাটা অনন্য। একমাত্র তখনই। অন্য সময় না। অন্য সময় সবাই সমান। সকলের দেখা এক।

আমি কি গলা বাজিয়ে বলব নাকি, আমি তো মানুষ নই হে, লেখক। এমন দুর্ভাগ্য যেন কখনো না হয়, কারোর না হয়। আগে মানুষ। তারপরে বাদ বাকী, তা তুমি যত বড় কীর্তিমান হও গিয়ে। কীর্তিমানে আমার টান আছে, তার আগে আছে মানুষের টান। অগ্রে তা না থাকলে, কীর্তিমানে আমার প্রয়োজন নেই। তবে, মানুষ ছাড়া কে বটে কীর্তিমান। অতএব, লেখক না, রূপকুমারীকে দেখব মানুষের চোখেই। কিন্তু দশজনের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা মানুষ, নিয়ম-কানুন, স্থান-কাল পাত্র-পাত্রী মেনে চলতে হয়। রূপকুমারীর ঘরে যাবার এই কি সময়? রতনকুমার যেতে পারে। তাকে যা মানায়, আমাকে তা মানায় না। কিন্তু আর কি রতনকুমারকে নিরস্ত করা যাবে।

না। সে সময়ও নেই। দেখছি, পঙ্খীরাজ দাঁড়াল এক বন্ধ গেটের সামনে। পঙ্খীরাজের যন্ত্রে বাজল ব্যস্ত হাঁক। একটু পরেই গেটের পাল্লা খুলে গেল। রতনকুমার গাড়ি চালিয়ে দিল ভিতরে। বাগান ঘুরে দাঁড়াল গিয়ে গাড়ি বারান্দায়। আলো জ্বলছে সেখানে। অট্টালিকার আয়তন তেমন বড় মনে হচ্ছে না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছোট একটা বাড়ি। রতনকুমার গাড়ি থেকে নামতে নামতে ডাকল, 'কাম্ দাদা।'

অগত্যা। সামনে সাজানো-গোছানো ঘরে আলো জ্বলছে।

চোখে ভুল দেখছি না তো। বিশ-বাইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। কিন্তু সে তো রূপকুমারী রীনা না। যদিও একে রূপকুমারীই বলা যায়। পোশাকে-আশাকে তো বটেই, শ্যামাঙ্গিনীর রূপেও কিছু কম না। ভঙ্গিতে লাস্য, হাসিটি মিষ্টি। ভাষ্যেও বেশ বিদিশি কেতাবী ; 'হ্যালো স্যার, গুড ইভ্‌নিং। কাম্‌ ইন।'

রতনকুমারও তেমনি ভাষে, 'গুড ইভ্‌নিং হাসিনা। হোয়ার ইজ য়ুর দিদি ?'

হাসিনা যার নাম, তার চোখে যেন হাসির ইশারার ঝিলিক। হাসিনা নামের সঙ্গে হাসির কোন সম্পর্ক আছে কী না জানি না। থাকলে বলি, নামটি সার্থক। হাসিনার হাসিটি কেবল ঝলকানো না, মাধুরী মেশানো। চোখের পাতা কাঁপিয়ে, ইংরেজিতেই বলল, 'দিদি তাঁর শোবার ঘরে আছেন।'

রতনকুমারের মুখ লাল, চোখও কিঞ্চিৎ রক্তিম। ঘরের আলোয় তাকে এখন আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল এলিয়ে পড়েছে। ভুরু-কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে—।'

কথা শেষের আগেই হাসিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা-ই।'

ইশারায় কথা, নিজেদের মধ্যে জানাজানি। কেবল রতনকুমারের রক্তাভ মুখে যেন একটু দুশ্চিন্তার ছায়া নামে। হাসিনা বলল, 'আপনার বাড়িতে এবং সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় টেলিফোন করেছেন, পান নি। আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'জুহুতে, রণোর সঙ্গে। তোমাকে এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি কলকাতার একজন লেখক। জীবনকৃষ্ণদা এঁর একটি গল্প নিয়েছেন, আমি আর রীনা তাতে কাজ করব !'

ইতিপূর্বেই হাসিনার কৌতূহলিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। হাসিনা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল ! জবাবে আমিও। রতনকুমার আমাকে জানাল, 'হাসিনা হল রীনার সেক্রেটারি।'

চমৎকার। রূপকুমারীর এমন ফুলকুমারী সেক্রেটারি না হলে কি মানায় ! আমি তো ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছিলাম, হাসিনা বুঝি ভবিষ্যতের অপেক্ষমানা রুপোলী পর্দার ছায়াচারিণী। হাসিনা

আমাকে ইংরেজিতেই অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, দয়া করে বসুন।'

রতনকুমার বলল, 'না, দাদা এখানে বসবেন না, আমার সঙ্গে রীনার ঘরেই যাবেন। অবস্থা কেমন ?'

'স্তব্ধ সমুদ্র।'

চমৎকার জবাব, যদিও গূঢ় ভাষায়। হাসিনা কথা বলতেও জানে। উপযুক্ত সেক্রেটারি। অনুমান করি, রীনার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। রতনকুমার আমাকে ডাক দিল, 'কাম্‌ দাদা।'

এই তো গোলমাল। রীনা শ্রীমতী এখন শোবার ঘরে। অবস্থা স্তব্ধ সমুদ্রবৎ। ব্যাপার সঠিক কিছু অনুমান করতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমি না হয় রীনার সচিবের সঙ্গে এ ঘরে বসেই একটু কথাবার্তা বলি। বললাম, 'আপনিই যান না, আমি এ ঘরেই একটু বসি।'

রতনকুমার আবার বাঙলায় বাজে, 'সে হোয় না। আপনি হামার সাথ্‌ আসেন।'

নিরুপায় হয়ে একবার হাসিনার দিকে তাকাই। হাসিনা হেসে ঘাড় দোলায়, বলে, 'যান আপনি।'

হাসিনাকেই জিজ্ঞেস করি, 'আমার যাওয়াটা কি খুব শোভনীয় বা জরুরী ?'

হাসিনার জবাবের আগেই, রতনকুমার আমার হাত ধরে টানে। ইংরেজিতেই বলে, 'বী ইনফর্মাল দাদা, কাম্‌ উইথ মী। আয়াম রেসপনসিবল ফর য়ুর প্রেস্টিজ।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। এ দেখছি আর এক রণো। সম্মানের ভয় করি না, স্বস্তি-অস্বস্তির ভয়। অসহায় চোখে একবার সচিব হাসিনার দিকে তাকাই। সে হেসে ঘাড় কাত করে। আমাকে সাহস যোগায়। সামনের বিশাল ঘর পার হয়ে চলি রতনকুমারের টানে। এর নাম বসবার ঘর। গরীব গৃহস্থের পুরোপুরি খান দুয়েক বাড়ির সমান। সোফা সেট রকমারি। একদিকে মস্ত পিয়ানো। অন্যদিকে রেডিওগ্রাম। আর একদিকে লাইব্রেরি কর্নার। তার পরের দরজা পেরিয়ে, এক করিডর। রতনকুমার টেনে নিয়ে চলে বাঁ দিকে। খানিকটা গিয়ে একটি ঘরের পর্দা তুলে ধরে। সেই সঙ্গে আমার হাতে টান দিয়ে বলে, 'কাম্‌ ইন দাদা।'

তখন পর্দার ফাঁকে, আমার নজর ঘরের দিকে। বোধহয় রতন-কুমারের গলায়, অপরকে ডাকতে শুনেই, ফিরে তাকাল একজন। যার পরনে রয়েছে ঢিলে সালোয়ার, (হায়, চোখ গেল, চোখ গেল,) কামিজের বোতাম নেই। শোফার ওপর উপুড় হয়ে আধ শোয়া। ঘাড় ফেরানো দরজার দিকে। চোখের দুটি রক্তিম। ঢুলুঢুলু ? তেমন বুঝতে পারছি না। খোলা চুল কাঁধে, গালের পাশে, কিছু বা কপাল ঢেকে। হাতের সামনেই, কারু-কার্য খচিত কাঠের নিচু টেবিলের ওপরে বোতল, দেখলেই যার গুণের কথা বলা যায়। গেলাসেও সেই পানীয়, সোডার জলে মেশানো, জলের বুদ্বুদ ঊর্ধ্বগতি খর দীপ্তি দেখলে বোঝা যায়। এ মুখ আমি পর্দায় দেখি নি। কাগজের পাতায় হাজার বার ছবি দেখেছি।

রতনকুমার বলতে গেলে, জোর করে টেনেই আমাকে ঘরে ঢোকাল। অনুমতি নেবারও দরকার মনে করছে না। বিশেষ রূপোলী পর্দার ইনি একজন জাদুকারিণী, মহিলা তো বটেই। চোখের নজরে যতটা পড়ে, অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি। অবিশ্যি নজর ফিরিয়েছি পলকেই। এ কক্ষে, যাকে বলে শয়নঘর, রতন-কুমারের হয় তো অবারিত দ্বার। আমাকে কেন ?

এবার বাত পুছ সব হিন্দী ভাষায়। রতনকুমার একবার নায়িকার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কাছে নিয়ে এলাম এঁকে। জীবনকৃষ্ণদা ও'র গল্প নিয়েছেন, যার নায়িকা করবার কথা তোমার। আমাদের একটু বসতে বল।'

আমি তাকিয়েছিলাম রতনকুমারের মুখের দিকে। রতনকুমার রীনার দিকে। রীনার গলা যেন রুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা, 'তাই বুঝি ? আসুন বসুন দয়া করে।'

আমি সংকুচিত লজ্জায় হেসে, রীনার দিকে ফিরে, হিন্দী ভাষার গুরুচণ্ডালি করে বললাম, 'বসছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

কিন্তু বলেই থমকে গেলাম। দরজার কাছ থেকে যা চোখে পড়ে নি, এখন সামনে এসে মন চমকে যায়। দেখি, রূপসীর রক্তিম চোখ ভেজা, গালে জলের দাগ। সে তখন আবার বলল, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে রতন।'

রতনকুমার সহজ গলায় বলল, 'যেখান থেকে টেলিফোন করা যায় না। তুমি চোখ আর গাল মোছ।'

রীনা উঠে বসবার চেষ্টা করল। তেমন সার্থক হল না। কামিজের হাতা বুলিয়েই চোখ আর গাল মুছল। তবু বলি, চোখ গেল, চোখ গেল। সেই পাখীটা কেন এই বলে ডাকে ? যাকে দেখতে চায়, তাকে দেখতে পায় না বলে ? নাকি তার রূপের আগুনে চোখ জ্বলে যায় ? আমার 'চোখ গেল' সেজন্য না। হয় তো রূপের কথা কিছু আছে, কিন্তু কামিজের বোতাম ঘর খোলা শরীরের দিকে এই চোখের নজর পড়ে কেন। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই, তেমন হল যে। আমি কেন চোখের মাথা খাই না।

রীনা আমার উদ্দেশে আবার বলল, 'আপনি দয়া করে বসুন।'

বসবার জায়গা অনেক নেই, তবু আছে, এবং রীনার কাছ থেকে তা দূরে না। তার শোবার বিলাতি পালঙ্ক ঘরের অন্য পাশে। আমি কি নিরুপায়। কেন এখানে, এ ঘরে, এ মেয়ের সামনে, তার কোন জবাব নেই। তথাপি এক সোফায় বসতে হয়। অতঃপর রীনার আবার বাত, 'রতন, শুনেছি বেহুস্তে টেলিফোন নেই।'

এবার আমার লম্বা সোফার পাশে, রতনকুমারও তার আসন নিয়ে বসল, 'বেহুস্ত সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

ফুলকুমারীর শরীরে ঢেউ লাগল, একটু-বা হাসিতে বাঁকানো ঠোঁট। তেমনি ভাঙা ভাঙা রুদ্ধ স্বরে বলল, 'তবে, শুনেছি সেখানে খুব সুখ। সেখানে সরাবও পাওয়া যায় কী না, আমি তা জানি না।'

রতনকুমার বলল, 'তা যায়। আমি জুহুতে ছিলাম।'

রীনার আফসোসের স্বর, 'আহ্‌হা', 'এখান থেকে অনেক দূরে। সঙ্গে কে ছিল, জানতে পারি ?'

রতনকুমারের জবাব, 'রণো আর এই দাদা। রণোকে তার বাড়ি পৌঁছতে গেছলাম।'

রীনার চোখ এবার আমার দিকে। কথা রতনকুমারের সঙ্গে, 'কিন্তু দাদার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, উনি তোমাদের সঙ্গে জুহুতে ছিলেন।'

রতনকুমার বলল, 'তার কারণ, দাদা মোটেই স্পর্শ করেন নি। পান করেছি আমি আর রণো।'

রীনার রক্তাভ টানা ডাগর চোখ তখনো আমার দিকে। আমার

কাছে, আমার বিব্রত জিজ্ঞাসা, আমি কেন এখানে। আমি কি রুপোলী পর্দার সামনে নাকি হে। ব্যাপার যেন সেই রকম। বাত পুছ দুয়েতে, আমি শুনি আর দেখি। তবে পর্দার কথা না, দুজনের জিজ্ঞাসা আর জবাবদিহি।

রীনা চোখ ফিরিয়ে তাকাল রতনকুমারের দিকে, জিজ্ঞাসা, 'আমাকেও সেখানে নিয়ে গেলে না কেন?'

রতন বলল, 'তুমি তখন ফ্লোরে।'

'আমি বাড়ি ফিরে আসার পরেও দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে।'

'তা গেছে। রণো সঙ্গে ছিল, তোমাকে আগেই বলেছি। তা ছাড়া আমার মত তোমার সবখানে যাওয়া চলে না।'

'তোমাকে সেখানে কে নিয়ে গিয়েছিল?'

রতনকুমার জবাব দিতে এক পলক দেরি করল, তারপরে বলল, 'কেউ না, নিজের ইচ্ছায়।'

রীনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, বিচিত্র এক গোঙানো শব্দ করল। বলল, 'আহ্, তাই বল।'

বলেই, গেলাস তুলে, এক চুমুকেই পানীয় শেষ করল। বোতলের গায়ে ছাপ, সে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, স্কটল্যান্ড থেকে এসেছে। গড়ন পেটনখানিও চোখ ভোলানো। কিন্তু এই কি প্রথম খুলে বসা হয়েছে? তা হলে কী পরিমাণ জঠরস্থ হয়েছে, ভাবতে ডর লাগে। তারই প্রতিক্রিয়া কি, চোখ ভেজা, গালে জল?

রীনার ঘাড়টা যেন হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, বলল, 'প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার মনে করার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। আমি এবার বিদায় নিতে চাই।'

রীনা হঠাৎ নতুন হয়ে উঠল। এবার নিজেকে সোজা করে তুলে বসল, কিন্তু হায়, আমার চোখ যায়। সচিব হাসিনা এসে তো একটা উত্তরীয় তার কন্যার গায়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। রীনা বলে উঠল, 'অসম্ভব অসম্ভব! রতন, কেউ এখানে আসছে না কেন?'

সে তার রক্তিম পদযুগল কার্পেটের ওপর নামাতে উদ্যত হয়।

সেই সময়েই একটি মাঝ বয়সী লোকের আবির্ভাব। হাতে তার ট্রে, সাজানো দুটি গেলাস, কয়েক বোতল সোডা। লোকটির পোশাক আশাক মোটেই ভৃত্যের মত না। কিন্তু আচরণে তাই। রীনার ভুরু বাঁক খেল। জিজ্ঞেস করল, 'এত দেরি কেন রহমান?'

রহমানের অপরাধী স্বর, 'আমি মেহমানদের নজর রাখতে পারি নি। হাসিনা বিবিজী বলতেই এসেছি।'

বলে, সে ট্রে থেকে গেলাস আর সোডা নামিয়ে রাখল টেবিলে। সোডার বোতলের মুখ খুলে দিয়ে, নিজেই বোতল নিয়ে পানীয় ঢালতে গেল। রীনা বলে উঠল, 'থাক, তুমি যাও। একটু কিছু খাবার ব্যবস্থা দেখ।'

রহমান ট্রে হাতে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু শ্রীমতী সচিব হাসিনার নামটা মুসলমান বলে মনে হয়েছে। এখন দেখছি, ভৃত্যের নামও তা-ই। রীনা নামের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। যদিও, একটি ধ্বনি ছাড়া, রীনা শব্দের আর কি অর্থ হয়, সঠিক জানি না। এ নামের কোন মানে আছে কী? হিন্দু মুসলমান বোঝবার কোন উপায় নেই। অথচ সচিব এবং ভৃত্যের নাম মুসলমান।

রীনা ততক্ষণে বোতলের ছিপি খুলে, নিজের হাতে গেলাসে পানীয় ঢালছে। তার বড় বড় নখ রাঙানো। করতলও রাঙানো কী না, জানি না। দেখায় যেন সেইরকম। কিন্তু এই আসরে আর আমাকে কেন। রীনা দেখছি, নতুন দুটি গেলাসেই সোনালী রঙের পানীয় ঢালছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকেও দিচ্ছেন?'

রীনা বলল, 'নিশ্চয়ই। অবিশ্যি আপনার অনুমতি ছাড়াই।'

বললাম, 'আমি কিন্তু বিদায় নিতে চেয়েছিলাম।'

রীনার রঙহীন ঠোঁটে হাসি, যদিও ওষ্ঠ রঙীন। বলল, 'এসেছেন একজনের ইচ্ছায়, বিদায় আমার ইচ্ছায়। এখন তা-ই হওয়া উচিত নয় কী?'

সর্বনাশ, এদের সকলের বাত্-সাত্ রকম-সকম এক রকম দেখছি। এখন আমি এ ফুলকুমারীর ইচ্ছাবন্দী। তার চেয়ে বেশ তো ছিল, চোখ গলানো গালের জল, ভাঙা রুদ্ধ স্বর, দুজনের মধ্যে কথা। এখন গলার স্বরে সুর লাগছে। পরিস্থিতি বদল

হতে বসেছে। কবজির ঘড়িতে সময় প্রায় এগারো। বললাম, 'আপনাদের এ আসরে, আমি ঠিক সুবিধা করতে পারব না।'

এবার কথা রতনকুমারের, 'জুহুতেও সুবিধা করতে পারেন নি, এখানে কেন পারবেন না দাদা। রণো আমাকে বলেছে, সুরঞ্জনের সঙ্গে আপনার আসর বসে।'

বললাম, 'সেখানে আসরের কোন প্রশ্ন নেই। আমি ওর বাড়িতেই রয়েছি, ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি।'

রতনকুমার বলল, 'তখন পানীয়ের গেলাসও আপনার হাতে থাকে। একটু হাতে ধরুন, রীনা আপনাকে দিচ্ছে।'

রীনা তখন গেলাসে সোডা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। আমি গেলাস ধরবার আগেই, রতনকুমার আবার, এবার বাঙলায় বলল, 'দাদা, রীনা আছে দশ লাখিয়া হিরোইন, হামি পাঁচ লাখিয়া রতন।'

আমাকে হাত বাড়িয়ে গেলাস নিতেই হয়। রীনা রতনকুমারের বাঙলা বোঝে, বলে, 'তার জন্য আমাকে খাতির করবে প্রডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটর। ইনি আমার মেহমান।'

তবু একটু সহবত কথায় আছে। মনে করি, মনেও আছে। কিন্তু দশ লাখ। বলতে ইচ্ছা করে, টাকা যে সত্যি খোলামকুচি গো! একে ভাগ্য বলে, না প্রতিভা বলে, আমি জানি না। এমন নারীর হাত থেকে পানীয়ের গেলাস নেওয়া, সৌভাগ্য বলে মানতে হবে। রীনা গেলাস তুলে দেয় রতনকুমারের হাতেও। তারপর পূর্ণ করে নেয় নিজের গেলাস। মাথা নুইয়ে ভঙ্গি করে, দীর্ঘ চুমুক দেয়। মুখে রক্তের ছটা ফুটে ওঠে। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসবার ভঙ্গি করে বলে, 'কিন্তু দশ লাখের আগুনের জোর কত, তা তো জান রতন।'

রতন হাত তুলে বলল, 'ওসব কথা থাক। আমি কিন্তু টাকা ভালবাসি।'

রীনা বলল, 'জানি রতন, টাকা আমিও চাই, অনেক, অনেক টাকা। কেন না, সবাই জানে, আমার বাবা সামান্য তবলচি ছিল, মা সামান্য বাঈজী। আমি এগারো বছর বয়সে ফ্লোরে গিয়ে ঢুকেছিলাম, এখনো সেখানেই রয়েছি। কিন্তু তোমরা পুরুষরা টাকার সঙ্গে অনেক কিছু পাও! আর আমরা? শুধু টাকা,

আর কিছুই না।'

রতনকুমারের কোন জবাব নেই। যদিও আশা করেছিলাম। রীনার সে আশা ছিল কিনা, জানি না। দেখলাম, আবার সে দীর্ঘ চুমুক দিল গেলাসে। চোখ বুজে কয়েকবার ঢোক গিলল। কিন্তু আমার কাছে নতুন সংবাদ। দশ লক্ষে যে একটি চিত্রে কাজ করে, তার জনক জননী ছিল সামান্য তবলচি আর বাঈজী। এগারো বছর বয়সে সে রুপোলী পর্দায় এসেছিল। এখন তার বয়স কত কে জানে। নায়িকার বয়স নেই, শুনেছি। কথা শুনে মনে হল, এগারো বছর বয়স থেকে কোন এক বন্দীগৃহে যেন সে আটকা পড়েছে।

রতনকুমার কথা ঘোরাতে চাইল। বলল, 'দাদার যে গল্পটা জীবনকৃষ্ণদা করবেন, সেটা তুমি জান?'

রীনা চোখ খুলে, আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। বলল, 'না, এখনো গল্প শুনি নি। নতুন গল্প নেওয়া হয়েছে, সে কথা শুনেছি। শুনেছি, উনি খুব নাম করা লেখক।'

এবার আবার আমার বিরাগ। তার চেয়ে, রীনার জীবনের কথা ভাল। রতনকুমার বলল, 'আর গল্পটা হল দাদার জীবনের কাহিনী। রণো আমাকে বলেছে।'

রণো আবার এ কথা কখন বলল, শুনি নি। তাড়াতাড়ি বলি, 'ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। জীবনের কথা বলা খুব সহজ না।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল রীনা, 'খুব ঠিক কথা, খুব ঠিক কথা। বললেও তা সহজ হয় না। আচ্ছা রাইটার সাহেব, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, জীবনের সব কথা কি কখনো বলা যায়?'

কঠিন প্রশ্ন, যদিও আমি সব থেকে সহজ জবাবটাই রীনাকে শুনিয়ে দিই, 'বলতে পারা উচিত, তবে খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই।'

তারপরেই রীনার প্রশ্ন, 'আপনি পেরেছেন কখনো?'

অকুণ্ঠে জবাব দিই, 'পারি নি।'

রীনার রক্তিম চোখের তারা কটাক্ষ করল রতনকুমারের প্রতি। তারপরে আবার আমার দিকে। আমি একবার রতনকুমারের দিকে দেখলাম। তার চোখে একটি চকিত ইশারা যেন খেলে গেল।

ভুরুতে ঈষৎ কাঁপন। কিন্তু ব্যাপার ঠাহর হল না। রীনা গেলাসে চুমুক দিয়ে পাত্র শূন্য করল। আবার ঢালল। রতনকুমার বলল, 'ধীরে রীনা, ধীরে।'

রীনার গলায় আবার সেই রুদ্ধ গোঙানি স্বর ফিরে আসছে যেন। বলল, 'এখনো কি আমাকে শিখতে হবে? রতন, আমি মদ খেতে শিখেছি তোমার আগে।'

'জানি, কিন্তু সেজন্য বলি নি। কেন বলেছি, তুমি জান। তুমি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবে।'

'মদে কি আউট হই?'

রতনকুমার চুপ। তার সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হল। রীনা পাত্রে চুমুক দিল। বলল, 'তোমরা দুজনেই আমার কাছ থেকে এত দূরে বসেছ কেন রতন? একজন কেউ আমার কাছে এস। নয় তো দুজনেই এস।'

আমি আবার রতনকুমারের দিকে তাকালাম। রীনা হঠাৎ হেসে উঠল। কথার স্রোত কোন্ দিকে বহে বুঝতে পারি না। কিন্তু রীনার কাছাকাছি দাবী কেন, বুঝতে পারছি না। এমন কথা, ফুলকুমারীদের মুখে শোনা যায়, ভাবি না কখনো। রতনকুমার বলল, 'দাদা তোমার কাছে বসতে পারেন।'

কেন? এ আবার কী খেলা। এ খেলার নাম আমার জানা নেই। ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে যে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, রীনা রক্তিম চোখে আমাকে অপলক দেখছে। তার ঠোঁটের হাসিটা বড় ভয়ের। ভুরু কাঁপিয়ে বলল, 'রতন, রাইটার সাহেবকে তুমি ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ?'

রতনকুমার বলল, 'নিশ্চয়। দাদাকে জোরে টেনে নামালেই হয়।'

সেটা আবার কী? রীনা সুরে সুর মিলিয়ে আওয়াজ দিল, 'ঠিক বলেছ। তুমি যদি ওঁকে রাইটার বলে পরিচয় না দিতে, তা হলে আমি ধরেই নিতাম, উনি একজন আর্টিস্ট।'

তোবা তোবা! কী আমার দুর্গ্রহ হে। এ নগরে এসেছিলাম ফেরীওয়ালা হয়ে, পশরা বিকোতে। সংযোগটা রূপোলী পর্দার সঙ্গে বটে। তা বলে রূপোলী পর্দার বুকে ছায়াচারী! আমাকে দেখে রূপকুমারের ভাবনা। তার ওপরে, রতনকুমারের মত, রূপ-

কুমার আমার পাশে আলো করে বসে আছে। দু হাত দূরে রীনার মত ফুলকুমারী। হেসে বললাম, 'আপনাদের কল্পনার দৌড় অনেকখানি।'

রীনা বলল, 'কল্পনা নয় সাহেব, চোখে দেখে বলছি। সত্যি, আপনাকে কেউ কখনো ছবিতে কাজ করতে ডাকেন নি?'

সে রকম পাগল বন্ধুর দেখা যে কখনো মেলে নি, তা বলব না। তবে সে সব পাগলামিই। এদের মনেও যে সে পাগলামি জাগতে পারে, ভাবতে পারি নি। তবু আমি আওয়াজ দিই অন্যরকম, বলি, 'না, কেউ ডাকে নি। কেনই বা ডাকবে বলুন। তা হলে তো অনেককেই ডাকতে হয়।'

রীনা মাথা নেড়ে বলল, 'মোটেই না। আমার চোখ আছে, অনেক দিনের পুরনো চোখ মনে রাখবেন। ছবির জগতে কাকে দিয়ে কী হয়, আমি বুঝি। আপনার চোখ, আপনার চুল, আপনার হাসি, আপনার মুখ—।'

রতনকুমার বলে উঠল, 'একটু বেশী মিষ্টি।'

রীনা তার সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আর একটু দুষ্টুমি মাখানো।'

এবার মরো গিয়ে তুমি লজ্জায়। ধিক্কার দাও গিয়ে নিজের এই বাঙলা মার্কা চেহারাকে। কারোর কিছু আসবে যাবে না। কেবল শব্দ করে হাসতে পারলাম।

রীনা আবার বলল, 'জীবনকৃষ্ণদার উচিত, আপনাকে ছবিতে কাজ করানো। তাঁর চোখে পড়ে নি?'

রতনকুমার বলে উঠল, 'দাদার গল্পেই দাদাকে হিরো করতে পারলে হয়, আর রীনা হিরোইন।'

বিদ্রূপ? রতনকুমারের দিকে তাকিয়ে দেখি। সে আমার দিকে চেয়েই বলে, 'ঠাট্টা করছি না দাদা, খুব ভাল দেখাবে।'

রীনা যোগান দিল, 'সেরকম হলে, আমি খুশি হতাম।'

আমি হেসেই বললাম, 'এ আলোচনায় আমি অস্বস্তি বোধ করছি। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা যাক।'

রীনা হেসে উঠল। কিন্তু খিলখিল করে না, কেমন একটা গোঙানো ভাবে, শরীর কাঁপিয়ে। তারপরেই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তাকাতে পারি না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। আমার যে চোখ গেল। বুকের দুয়ার এমন হাট করে খোলা কেন।

আবার ভয় হল। রীনা টলছে, পড়ে যাবে না তো। ভাবতে ভাবতেই দেখি, সে আমার আর রতনকুমারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। হাতে গেলাস। রতনকুমারই বলে উঠল, 'বসো রীনা, পড়ে যাবে।'

বলে, সে একটু সরলো। রীনা আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে পড়ল। স্পর্শ বাঁচানোর প্রশ্ন নেই। মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রীনা বলল, 'রাইটার সাহেব, জীবনের অনেক ঘটনার কথা বলা যায়। মনের কথাই বলা যায় না, তা-ই না?'

আমার এখন বুক দুরু দুরু। রতনকুমারের দিকে তাকাই। পরমুহূর্তেই দেখি, রীনা যেন হাসছে, তার শরীর কাঁপছে, সে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রতনকুমার তাকে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল, ডাকল, 'রীনা।'

রীনা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'তুমি কেন রাত্রি ন'টার সময় আসো নি রতন?'

রতন বলল, 'সে কথা তো তোমাকে বলেছি রীনা।'

রীনা মাথা নেড়ে কান্নার স্বরে বলে উঠল, 'না না, ও কথা আমি শুনতে চাই না। আমি জানি, আমাকে নিয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমাকে নিয়ে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

রতনকুমার বলল, 'তোমার কোটি কোটি দর্শক কোনোদিনই ক্লান্ত হবে না।'

রীনা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'কিন্তু তাদের সকলের সঙ্গে আমি শুতে যাবো না।'

আমার শ্রবণ কি এখনো স্থির আছে? আমার শ্রবণ কি নতুন জন্ম নিচ্ছে? কোনো নারীর মুখে এ কথা কখনো শুনি নি, শুনবো, এ চিন্তাও ছিল না। ভয় আর বিস্ময় অথচ একটা উৎকণ্ঠিত কষ্ট আমার মনের মধ্যে মিশ্রিত ক্রিয়া করছে। আমি রতনকুমারের দিকে তাকালাম। রতনকুমারের মুখে বিব্রত ব্যথার অভিব্যক্তি।

রীনা তখন প্রায় ফিস ফিস করে বলেছে, 'দশ লাখ টাকা ওরা আমাকে আজ দিচ্ছে, একটা ছবির জন্য। এগারো বছর বয়স থেকে আমাকে নিয়ে খেলেছে, আমার রক্তে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

বলতে বলতে হঠাৎ হাতের গেলাস ছুঁড়ে ফেলল। ঝনঝন করে চূর্ণবিচূর্ণ হল। আমি সভয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। রতন-

কুমার আমাকে ইশারায় শান্ত হয়ে বসতে বলল। রীনা ঝরঝর কান্নার স্বরে বলল, 'আমি এখন একটা রাস্তার কুত্তি ছাড়া কিছু না।

রতনকুমার রীনাকে নিজের বুকের কাছে তুলে নিয়ে ডাকল, 'রীনা প্লিজ।'

রীনা রতনকুমারের ঠোঁট তার আতপ্ত রক্তিম ঠোঁট দিয়ে গ্রাস করল, শোষণে চুম্বনে আলিঙ্গনে মত্ত হল। কী করতে হবে, কী বলতে হবে, জানি না। অনেক মানুষ দেখেছি, এই এক অহংকার ছিল মনের কোণে। আর যেন তা কোনদিন না করি। শেষ পর্যন্ত চিরদিন যা করেছি, আজও তাই করি। অবাক হয়ে, নিজের বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে, সেই বিচিত্রের কাছে মাথা নত করে থাকি। আমি বুঝতে পারছি, আমার বুকের কাছে প্লাবনের কলকল ধারা। মানুষের এমন দুর্ভাগ্য কি আর কখনো দেখেছি।

এ সময়েই আবির্ভাব হল সুরঞ্জন আর নীলার। দৃশ্য দেখেই, সুরঞ্জন ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আমাকে কথা বলতে বারণ করল। নীলার চোখে বিস্ময়, ভয়। ওদের পিছনে সচিব হাসিনা। সুরঞ্জন আমাকে হাতের ইশারায় উঠে আসতে বলল। আমি উঠে গেলাম। যাবার আগে দেখলাম, রীনা নিজের কামিজ ধরে টানছে, ছেঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রতনকুমার তার আলিঙ্গনের মধ্যে অর্ধশায়িত।

সুরঞ্জনের সঙ্গে বাইরের ঘরে এলাম। সুরঞ্জন বলল, 'ভাগ্যিস রণোর বাড়ি গেছলাম। তা না হলে জানতেই পারতাম না কোথায় গেছ। আর একটু হলে থানায় খবর দিতে হত।'

নীলার দিকে এখন তাকাতে পারছি না। বললাম, 'রতনকুমার জোর করে টেনে নিয়ে এল।'

সুরঞ্জন বলল, 'বুঝেছি। এখন চল।'

হাসিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এক চরিত্র, এক ঘটনা না। রাণী, কৃষ্ণ, সুরঞ্জনের বাড়ির হরিরেণ, সেই মারাঠি তরুণীতেও শেষ না। এমন কি রীনা রতনকুমারেরও না। এ নগরীতে থাকাকালীন, এমন চরিত্র আরো মিলেছে। এমন ঘটনা আরো অনেক। যারা রুপোলী পর্দার ছায়া হতে পারে নি। হতে চেয়েছিল। এমন কি, রণো, সুরঞ্জনের মত মানুষের আশ্রয়ও, ছিকের ভাগ্য, এক আধটি বেড়ালের। সস্তা নোংরা হোটেল-বয়, অথবা দরিদ্র বস্তি, কিংবা পেভমেণ্টে যারা নিজেদের ছায়া আর চেয়েও দেখে না। সে কাহিনী বলতে গেলে, বেদব্যাসের মত সময় আর স্থান চাই। রণোর একটা কথা-ই মনে পড়ে, 'এই আপদ ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলোর ঘটনা নিয়ে কোনদিন কি ছবি হবে না? এর চেয়ে আর মজার ছবি কী হবে?'

তা বটে। রুপোলী পর্দার স্বাদটা ওরা একরকম জানে। এই নগরীর প্রহরিণী, হাসি-ফেনিলোচ্ছল সাগরের, রুপোলী জলের স্বাদ যে লবণাক্ত, ওদের মত কে জানে?

তাও জানে। হয়তো অনেকেই জানে। রূপকুমার ফুলকুমারী থেকে ছবির গড়নদার পর্যন্ত। তাও দেখেছি, শুনেছি। মধ্যরাত্রের সুরার প্রলাপে শুনেছি। শেষরাত্রের নির্লজ্জ নগ্নতায়, চোখের জলের দুরন্ত কাঁদনে দেখেছি। যারা পারে নি, যারা পেরেছে, তাদের অন্ধকার আর আলো, একটা কোথায় যেন মেশামেশি করে আছে। শেষ পর্যন্ত, তিক্ত স্বাদের বিষ, আকণ্ঠ ভরেছে সকলের। কারোরটা হাসি আর ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে আছে। কারোরটা লুকিয়ে রয়েছে অন্য জীবনের অন্ধকারে।

দশ দিন কেটে যাবার পরে, একদিন সুরঞ্জনের স্ত্রী, নীলার চোখে দেখলাম, কৌতূহলের ঝিলিক। ভুরুতে একটা বিস্ময়ের বাঁক। সারা বেলায় দেখা ছিল না। সাঁঝবেলাতে প্রথম সাক্ষাতে, নীলার ঠোঁটের কোণের হাসিটাও কেমন যেন রহস্যে নিবিড়। জিজ্ঞেস করল, 'লিজা কে?'

ঘরে তখন বিধান সস্ত্রীক। স্বয়ং দুর্বাসা রণো—রণবীর। সুরঞ্জনের চোখমুখের ভঙ্গিটাও ভাল না। সবে মাত্র কলকাতা-ত্যাগী এক কমার্শিয়াল শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ফিরছি। নীলার জিজ্ঞাসাটা যেন কোন অর্থ বহন করল না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

বিধান এদের মধ্যে ভালমানুষ গোছের। ওর স্ত্রী রমাও তা-ই। তথাপি নীলার হাসি আর জিজ্ঞাসাটাই সকলের মধ্যে সংক্রামিত। কেবল রণো ছাড়া। সে-ই হুমকে আওয়াজ দিল, চিনতে পারছ না? লিজা, লিজার বোন রোজা, তাদের বৌদি মেরি, তাদের মা মিসেস গোমেজ…'

আর বলবার দরকার ছিল না। সকলের মুখগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সত্যি আমি মিথ্যুক নাকি? এমন বিস্মরণও হয়? তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের কী হয়েছে?'

রণো বাজল চড়া সুরে, 'তাদের কী হয়েছে, আমরা জানি না। তুমি এখানে আসতে না আসতে, এদের জোটালে কোত্থেকে, সেটি বল তো জাদু?'

রণোর কথাই এমনি। বললাম, 'আরে না না—।'

কথা বলবে কে। তার আগেই রণোর ধমক, 'চোপ। আগে বোস, তারপরে শুনছি তোমার কেচ্ছা।'

সকলেই হেসে বাজল। আমিও হাসতে হাসতে বললাম। রণো আবার বলে উঠল, 'ওই জন্যই আমি বলি চেহারাটাই ভাল্‌গার,

কেষ্টঠাকুর মার্কা। দেখ আসতে না আসতেই, একটা ঘাটিয়ে বসে আছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'এখন মুখখানা দ্যাখ্ রণো।'

'দেখি নি আবার? শালা মুরলীধর।'

নীলা বলে উঠল, 'আমি তো প্রথমে টেলিফোনে গলা শুনে ভাবলাম, কোন হিরোইন কথা বলছে। ইংরেজিতে লেখকের নাম বলে জিজ্ঞেস করল, উনি আছেন নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে বলছেন? জবাব এল, আমি লিজা বলছি বলুন, তা হলেই বুঝবেন। আমি বললাম, উনি তো এখন বাড়ি নেই, এলে বলব। কিন্তু আপনি লিজা মানে, কে বলুন তো? কোথা থেকে বলছেন? জবাব এল পাক্কা বাংলায়। প্রথমে ভেবেছিলাম, মেমসাহেব। বাংলা শুনে তো আমি-থ। বলল, বলবেন, মিসেস গোমেজ আমার মা, রোজা আমার দিদি, মেরী আমার বৌদি—আমি সে-ই লিজা। উনি যেন দয়া করে একটা টেলিফোন করেন।'

নীলা আমার দিকে তাকাল। আমার চোখের সামনে লিজার মুখটা ভাসছে। নীলার বলার মধ্যে, আমি যেন লিজার হাসি-ঝলকানো চোখ আর কথার ভঙ্গিটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু সবাই যে-ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, তাতে যেন কেমন একটা ঘনীভূত বিস্ময় আর রহস্য। কেন, ঘটনার এমন বৈচিত্র্য কী। রণোর মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে, কী একটা অপরাধ করেছি। সে-ই আওয়াজ দিল, 'বোঝ এখন ব্যাপারটা।'

নীলা আবার বলল, 'আবার অবিশ্যি খুবই জানতে ইচ্ছে করছিল, উনি কে, কী ভাবে লেখকের সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু লজ্জা করল। কিন্তু টেলেফোনে আবার শুনতে পেলাম, কিছু মনে করবেন না, এ ভাবে বললাম, তা হলে হয়তো লেখক মশাইয়ের আমাদের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। আর উনি যদি টেলিফোন করবার সময় না পান, তা হলে কাল আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বলবেন।...আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ফোন-নম্বার ঠিকানা কি উনি জানেন? জবাব এল, হ্যাঁ।

নীলা থামল। রণো শক্ত মুখে শিবনেত্র হয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'এবার বল তো নাটের ঠাকুর, প্রথমে মেমসাহেবি চাল, তারপরে খাঁটি বাঙালী খুকিটি কে?'

আমি হেসে বললাম, আরে না না, মেয়েটি আসলে—'

'মেয়ে!' সুরঞ্জন যোগান দিল। বাকীরা হাসল! এখন তো দেখি, সুরঞ্জন রণোতে বেশ মিল।

রণো হুঁশিয়ারী দিল, 'চাপবার চেষ্টা করো না চাঁদ, ভালয় ভালয় বলে দাও। না হলে বমবে তোলপাড় করে দেব।'

হাসির কথা ছাড়া কিছু না। আমি বললাম, 'এত কিছুর দরকার নেই। এরা আর আমি একসঙ্গে কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছি। কেন, সুরঞ্জনের সঙ্গে তো তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।'

বলে, আমি সুরঞ্জনের দিকে তাকালাম। সুরঞ্জন সোজা হয়ে বসে বলল, 'মায়ের কাছে মাসীর গল্প। সেটা ছিল একটা গোয়ানিজ পর্তুগীজ ফ্যামিলি। আমি হলফ করে বলতে পারি, আজ যে-মেয়েটা টেলিফোন করেছিল, সে কখনো সেই দলের হতে পারে না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

সুরঞ্জনের জবাব, 'আমাকে আর গোয়ানিজ মেমসাহেব চেনাস নি। ওদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন ওরকম বাংলা বলতে পারবে না।'

নীলা তাল দিল, 'চমৎকার বাংলা। আমি নিশ্চিত, লিজা নাম নিয়ে, কোন বাঙালী মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

রণোর তালে তাল বাজল, হাঁকড়ানো সুরে, 'আরে এ তো স্পষ্ট, ওই নামে মেয়েটাকে টেলিফোন করতে বলেছে, যাতে কেউ ধরতে না পারে।'

বিধানের মত নিরীহ শান্ত মানুষও আমার নাম ধরে ডেকে বলল, 'বলেই দাও না, এতে আর কী হয়েছে।'

বিধানগিন্নীও বাজল, 'হ্যাঁ, সেই তখন থেকে আমরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করছি।'

রণো বলল, 'কেউ তো কেড়ে নিচ্ছি না।'

একা রণো ক্ষ্যাপাতেই রেহাই নেই, এখন দেখছি, সবাই সাঁকো নাড়া দিচ্ছে। আমার অবাক লাগছে সকলের চোখ-মুখ দেখে। আমার বচনে কারোর বিশ্বাস নেই। একে বলে, না-হক বিপদ। মানুষের নিজের অভিজ্ঞতার সীমানায় যদি না পড়ে, তা হলেই অবিশ্বাস। বললাম, 'আসলে এ-সব কিছুই না। লিজা মেয়েটি

অনেক কাল কলকাতায় ছিল, ছেলেবেলা থেকেই। অনেক বাঙালী ছেলে-মেয়ে ওর বন্ধু। বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশাও ছিল, তাতেই—'

এখন রণোই, সরকারী বল, বাদী পক্ষের বল, উকীল মহাশয়। বলে উঠল, 'থাক, তোমাকে আর নভেল গুল্ দিতে হবে না। ব্যাটা গল্প লিখে লিখে ভেবেছে, যা তা বানিয়ে বললেই হল।'

সুরঞ্জন এর মধ্যে আর একটু নতুন রসের মিশেল দিল, 'এখানে যে দু-একজন বাঙালী হিরোইন আছে, তারা কেউ না তো?'

সকলের জিজ্ঞাসু নজর আমার দিকে। এদের তুমি বোঝাতে যাবে? বোধহয় ভাষায় কুলোবে না। রণো বাতালো, 'আর সেটি যদি মনোরমা হয়, তা হলে আর দেখতে হবে না। আজ মাঝরাত্রেই এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে।'

নীলা আঁতকানো আওয়াজে বলল, 'কেন?'

রণো বলল, 'জান না? রাত্রে পেটে খানিক দ্রব্য পড়লেই হল। তারপর মাথায় যার চিন্তা, তার কাছে ছুটবে। যখন পৌঁছবে, তখন দেখবে, আঁতুড় ঘরের, প্রথম জন্মদিনের পোশাক। এসেই লটকে পড়বে।'

নীলার আঁতকানো আওয়াজ আর একটু চড়ল। যাকে কেন্দ্র করে কথার উত্থাপন, সেই আমিও চোখ বড় করে তাকালাম। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কি ঘটতে পারে? না কি কোন মহিলার পক্ষে এমন সম্ভব? সুরঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই!'

রণো বলল, 'শুধু তা-ই না। টেনে নিয়ে ছুটতে পারে জুহুতে, তারপর সেখান থেকে শ্রীঘরে।'

আমার চোখের সামনে, জুহুর বাদামি-বালি সমুদ্রতীর ভেসে উঠল। কিন্তু তার সঙ্গে বাকীটা মেলাতে পারলাম না। এ জীবনে পারবও না। নীলা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'অসম্ভব। ভাই বলুন না কে? মনোরমা নাকি?'

এ একমাত্র নবদ্বীপের নিমাই ঠাকুরের দলের কাণ্ডই হতে পারে। সুলতানের কাজী যত সবাইকে বেঁধে মারে, সবাই তত বেশি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। নামেতে কারোর ভুল নেই দেখছি। তথাপি হেসে বলি, 'কিন্তু সে-সব কিছুই না, লিজা একটি গোয়ানিজ মেয়ে। ওর এক দাদা এখানে চাকরি করে। আর এক দাদা কলকাতায়

বিশ্বাস না করলে আর কী বলব।'

প্রায় অসহায় মুখেই, অসহায় হেসে সকলের দিকে তাকালাম। রণো আমার দিয়ে চেয়ে, বাকীদের বলল, 'ব্যাটা বরাবর এসব ব্যাপারে ওস্তাদ, মুখ দেখ।'

তারপরেই ও স্বর বদলে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কাছে তাদের ফোন নম্বর আর ঠিকানা আছে?'

'আছে।'

'নিয়ে আয়, আমি নিজে তাদের বাড়িতে ফোন করব, তা হলেই বোঝা যাবে।'

এমন কাজে আমি বাধ্য না। বিশেষ রণোর পাগলামিতে। কিন্তু সকলে যদি তাতেই খুশি, তা-ই হোক। আমি উঠে গেলাম, আমার ঘরে। ট্রেন থেকে নামার সময়, জামার পকেটে ছিল। তারপরে যতদূর মনে পড়ছে, ছোট ব্যাগের কাগজপত্রের মধ্যে, লিজার লেখা সেই, ডাইনিং কারের বিলের কাগজটা রেখে দিয়েছি। ব্যাগ খুলে, বই কাগজপত্র ঘাঁটলাম। সেই কাগজটি নেই। এবার যেন আমার একটু ঘাম দেখা দিল। সব আছে, সেই ছোট কাগজের টুকরোটি কোথায় গেল? এদের খুশি করতে পারি বা না পারি, কথা রক্ষার জন্য, লিজাদের সঙ্গে আমাকেও টেলিফোনে একবার কথা বলতে হবে বৈ কি। ওদের বাড়ির ঠিকানাটাও যে সেই কাগজে লেখা ছিল।

শেষ পর্যন্ত লিজার কথাই সত্যি হবে নাকি? মিথ্যুক হয়ে যাব? ব্যাগটা উল্টো করে টেবিলের ওপরে ঢেলে ফেললাম। একটা একটা করে কাগজ দেখলাম। কিন্তু ডাইনিং কারের সেই বিলের কাগজের টুকরোটি কোথাও নেই।

এ সময়েই পিছন থেকে রণোর গলা শোনা গেল, 'বুঝেছি বাবা, খুব হয়েছে, এখন এস।'

আমি অস্বস্তির স্বরে বললাম, 'না না, সে-জন্য না। মুশকিল হচ্ছে, ভদ্রতার খাতিরে যে একটা টেলিফোন করব, তারও উপায় নেই। কোথায় হারাল কাগজটা?'

রণো এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে পিছনে নীলা। কিন্তু সেদিকে আমার নজর নেই। আমি আবার নতুন করে খুঁজতে লাগলাম। যদি কোন আশা থাকে, তা-ই নীলাকে শুনিয়ে বললাম,

'রেলের ডাইনিং কারের বিলের পেছনে সব লেখা ছিল।'

নীলার কোন জবাব পাওয়া গেল না। এতক্ষণে বোধহয় ক্ষ্যাপা ঠাকুরের দয়া হল, আমার অবস্থা দেখে। রণো আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'সত্যি নাকি রে?'

বললাম, 'শুধু শুধু মিছে বলব কেন? ওদের নামগুলো ছাড়া আমার কিছু মনে নেই। আর কিছু না, ওরা ভাববে, আমি বাজে কথা বলেছি।'

নিরুপায় হতাশায় ব্যাগ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হতাশাতেই হেসে রণো আর নীলার দিকে তাকালাম। ওরা নিজেদের চোখে চোখে তাকাচ্ছে। আমি বাইরের ঘরে গেলাম। ওরাও এল পিছনে পিছনে। নীলা বলল, 'আমার মনে হয়, কাল আবার ওরাই টেলিফোন করবে।'

না করলেও, আমার কিছু বলার নেই। বললাম, 'তা হলে অন্তত তোমাদের সন্দেহ-ভঞ্জনটা করা যেত।'

রণোর এবার বিচারপতির রায়, 'হুঁ, ব্যাটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সত্যি কথাই বলছে। কাগজটা খুঁজে না পেয়ে, একটু মুষড়েই পড়েছে।'

বিব্রত হেসে বললাম, 'মুষড়ে পড়ি নি।'

রণোর বক্তব্য, 'ওটাকে মুষড়ে পড়াই বলে। তার মানে, ব্যাপার কিছু আছে। কিন্তু বাংলা জানে, এ রকম গোয়ানিজ মেয়ে তো কখনো দেখি নি।'

সুরঞ্জন বলল, 'সত্যি, আমার অবাক লাগছে। সে তো পাক্কা মেমসাহেব দেখলাম। সে জন্যই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।'

রণো বলল, 'ব্যাপার গণ্ডগোল। দেখ আবার সেখানে কী বাঁধিয়ে বসে আছে।'

এরকম কিছু না বললে, রণোর আত্মার শান্তি হয় না। তবে আমার স্বস্তি, ব্যাপারের হাতী ঘোড়া চিন্তাটা, মোটামুটি সকলের মাথা থেকে গিয়েছে। কেবল একটা-ই যা মজা দেখলাম। রণোর সঙ্গেও সুরঞ্জন আর নীলা যে কখনো কখনো জোট বাঁধতে পারে, এটা জানা ছিল না। আসলে ভেদের কারণটা আলাদা। সেটা না থাকলেই, অ-ভেদ।

সুরঞ্জন আবার তালি দেবার তাল করল, 'তবে এসব পরিবারকে

বিশ্বাস নেই, সে কথা আমি আগেই লেখককে বলে দিয়েছি।'

রণো তার ওপরে ধরতাই দিল, 'হুঁ, পগাতে আর বাগাতে আর মিথ্যে কথার কারসাজিতে আর পুরুষদের ভেড়া বানাতে, ওদের জুড়ি নেই।'

যার যার কথা, সে সে বলে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অন্তত আমার পরিচিত গোমেজ পরিবারের সে-পরিচয় আমি পাই নি। আর ভেড়া কি কেবল ওরাই বানাতে জানে? অনেক হিন্দু ও বঙ্গরমণীকেও তো দেখেছি, ভেড়া বানাবার মন্ত্র তাদের, নানা রঙ্গে ভঙ্গে, ঠোঁট ভুরুর ধনুকে, চোখের তারায়। ভেড়া বানাতে, তারাও অনেক জগৎবরেণ্যা পারদর্শিনী। ভারত-পর্তুগীজ মিশেল রক্তে যে-নারীদের জন্ম, তারাই কেবল ভেড়া বানাতে জানে না। আরো খতিয়ে বলো, আসলে যে ভেড়া বনে, তার মধ্যে মেষত্ব না থাকলে কি বানানো যায়? সেজন্য আমরা নারী দেবীর সামনে, যূপকাষ্ঠে মেষ বলির আয়োজন করেছি। সেইখানে আমাদের ধন্দ করা, ছন্দ বানানো। ধন্দটাকে বলো গিয়ে, প্রতীক। সব প্রতীক-ই গূঢ়, ছন্দ। ধন্দ ধরিয়ে পূজা আর সাধনা।

আর ছল চাতুরি মিথ্যা যদি বল, তা-ই বা আর এক শ্রেণীর ওপরে দাগানো কেন? দাগাও তো, আপন মুখ দর্পণে দেখে দাগাও। কিন্তু সে কথা যাক। লিজার লিখে দেওয়া সেই কাগজের টুকরোটা পাওয়া গেল না, সেই একটু মন খুঁতখুঁত। সেটা আর কিছু না। সামাজিক মনের একটা অস্বস্তি। নিজেকে অকারণ মিথ্যেবাদী বানাতে কে চায়।

তবে মনে মনে জানি, এই তো ভাল। পথ চলতি, কাছাকাছি আসা। পথেই যেন দূরান্তরে যাই। পথের দেখা পথেই শেষ। আর তার যা কিছু, সে মনের তারে। হয়তো সে অনেক দিন ধরে বাজে, কিংবা একেবারেই বাজে না। দেখাদেখির শেষ কথাটা সেখানেই। কোন এক গোয়ানিজ গোমেজ পরিবারের কথা হয়তো অনেকদিন ধরে বাজবে। সকলের জন্য যদি নাও বাজে, তবে দুঃখ চাপা একটি আশ্চর্য মেমসাহেব মেয়েকে মনে থাকবে। এই কারণে, সে সকলের মধ্যে, কেমন করে যেন, অ-সকল। সে অচিরাৎ খোলা, ঝাঁটীতি ঢাকা! কারণ, কী যেন একটা সে চাপা দিয়ে রেখেছে, যেখানে চোখের জল আছে। হাসিটা তার সেখান থেকেই

ঝিলিক দেয়।

ভাবি, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কত অচিন দেশ, কত অচিন মানুষ। সেই অচিনের এক সেই গোয়ানিজ পরিবার। তার মধ্যে সব থেকে, অচিনের বিস্ময় লিজা। সে আমার এই ভারতের অচিন কূলের বিস্ময়।

গোটা দুদিন কাটল শুধু নিমন্ত্রণ খেয়ে আর বেড়িয়ে। কে জানত, এত বন্ধু পাব হেথা, এই পশ্চিম সাগর কূলে, এত বন্ধু ছিল। পুরনোর হিসেবে, তাজ্জব। কলকাতার সবাই কি এখানে? নতুন নতুন পেয়ে, মন আরো ভরপুর। নগরী ছেড়ে, দূরান্তরে যাবার কথাটা তোলাই যাচ্ছে না। নগরীর মেলাতেই, মেলা দেখে দিন কেটে যায়। মানুষে মিশে মন পাগল। সমুদ্র কলকল, নারিকেল কুঞ্জের ঝিরিঝিরিতেই রাত্রি যায় দূরে।

ইতিমধ্যে হাসি যত দেখেছি, চোখের জলের হিসেবে, খতিয়ানের পাতা ভারী। রূপোলী জগৎ ছাড়িয়ে, রূপসাগরের নানান কূলে কূলে, এক হিসাব।

দুদিন ধরে, সাঁঝবেলাতে, যতবার তার-ভাষের মন্ত্রে ঝঙ্কার উঠল নীলা ততবার আমার দিকে তাকিয়ে, ছুটে ছুটে গেল। কিন্তু কানে যন্ত্র তুলতেই, ওর চোখের দ্যুতি, মুখের আলো হারিয়ে যায়। গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকায়। নজরে নালিশও আছে। অপূরিত আমার নালিশ এখন আমার ওপর। আকাঙ্ক্ষিত একটি গলা কেন বাজে না? এখন যে ওটা নীলারই দায়। আমি মনে মনে হাসি। এ হাসিটা ডানা ঝাপটানো পাখির হাসি। নীলাকে সে কথা বোঝাতে পারব না।

রাত পোহালে রবিবার। ছুটির দিন। অতএব, আগামীকালের দিলখুস আয়োজনের জল্পনা-কল্পনায় মাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে। আমার ইচ্ছা, রণো বিমানরা সবাই থাক। আয়োজনেরই বা দরকার কী। আরব সাগরের কূল ধরে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

অতএব, রাত পোহাতেই, সাজো সাজো। রণো এল ঘুম-চোখেই। গতকাল রাত্রে বোধহয়, সমুদ্র-কিনার থেকে আর সেই কাকের বাসায় ফেরা হয় নি। কৃষ্ণ বেচারী বোধহয়, চারিদিকে বইয়ের বান্ডিলের মধ্যে, ভাত নিয়ে বসেছিল।

রণো এসে হাঁক দিল, 'চা।'

সেই সময়েই, ডাকের ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজার বাইরে আগন্তুক। গুরুচরণ গিয়ে দরজা খুলে দিল। খবর এল, দুজন মেমসাহেব। লেখক দাদার খোঁজে। দোতলায় ডেকে, বাইরের ঘরে নিয়ে আসা হল তাদের। আমি ঢুকে দেখি, লিজা আর রোজা, দুই বোন। আমার পেছনে নীলা। রণো টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে, সোফায় এলিয়ে বসেছিল। পা দুটো নামিয়ে নিল। মনে মনে বললাম, বোঝ ঠ্যালা। তারে ভাষে না, সশরীরে হাজির। এবার ডানা ঝাপটে কোথায় যাবে যাও।

তাড়াতাড়ি ইংরেজিতেই বাত করি, 'আ রে, কেমন সব, ভাল তো? বসুন।'

রোজার চোখে হাসির দ্যুতি। ও যেমন, তেমনই। কিন্তু লিজাকে এমন বেশে দেখব ভাবি নি। মেমসাহেব আরব সাগরের জলে তৈরী শাড়ি পরে এসেছে। তাতে সোনালী বালির পাড়। চোখে ঠোঁটে যা মাখবার, তা ঠিকই আছে। তবে সিন্ধুর বুকে রক্তিম সূর্যের টিপটা যেন ভাবাই যায় না। টকটকে লাল একটা ফোঁটা দিয়েছে কপালে। চুল আ-বাঁধা ছাড়া।

রোজা বসতে বসতে বলল, 'ব্যস্ত হবেন না।'

লিজাকে বাংলায় বললাম, 'বসুন।'

লিজার চোখে যেন চকিত বিস্ময় ঝিলিক দিল। ভুরু একবার কুঁচকে গেল। না বসে, বাংলাতেই বলল, 'বিরক্ত করলাম না তো?'

বললাম, 'বিরক্ত হব কেন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

পরিচয়ের পালা শেষ হলে, গৃহিণীর দায়িত্ব নিয়ে, নীলাই অগ্রসর হল। লিজাকে বসতে বলল, লিজা বসল। রোজা বিশেষ-ভাবে, সুরঞ্জনের দিকেই বারে বারে দেখছিল। তারপরে বলেই ফেলল, 'আপনার সঙ্গে যে কোনদিন পরিচয় হবে, ভাবতেই পারি

নি। আপনার গানের আমি ভীষণ ভক্ত।'

সুরঞ্জন বিনীত হেসে বলল, 'আমি তো গান করি না।'

রোজা হেসে বলল, 'ওই হল, আপনার মিউজিক আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

লিজা বাংলায় বলল, 'আমারও খুব ভাল লাগে।'

সুরঞ্জন বলল, 'ধন্যবাদ।'

নীলা লিজাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল, সে এরকম বাংলা শিখল কেমন করে। জবাব একই পেল।

সুরঞ্জন বলল, 'আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারি নি।'

নীলা লিজার দিকে চেয়ে বলল, 'এরকম ভাবে শাড়ি পরে আপনি যদি ওইরকম বাংলা বলেন, তাহলে আপনাকে বাঙালী ছাড়া কিছু ভাবাই যাবে না।'

লক্ষ্য করেছি, নীলার সঙ্গে কয়েকবারই রণোর দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছে। রণোর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছি, দুর্বাসা মুনির চোখ, আমার ওপরে বেঁধানো। কখন হুঙ্কার দেবে, কে জানে।

এতক্ষণে রোজা আমার দিকে কটাক্ষ করে বলল, 'আমাদের কথা বোধহয় ভুলেই গেছলেন?'

বললাম, 'না, ভুলব কেন?'

রণোর গলায় খাঁকারি বাজল, না ধমক, ঠাহর হল না। নীলা লিজাকে বলল, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় আপনি টেলিফোন করেছিলেন। আমি কিন্তু ওঁকে সে-কথা বলেছিলাম।'

লিজা রোজা, দুজনেই, অবাক চোখে নালিশ নিয়ে আমার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এবার একটু বেকায়দা। তাই আমার হাসিটা একটু লজ্জায় বিব্রত।

রোজা বলল নীলাকে, 'আমরা ভেবেছি, আপনি হয়তো ওঁকে বলতে ভুলে গেছেন।'

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, ওর ঠিক মনে ছিল, আমাকে বলেও ছিল।'

দু বোনের চোখে বিস্ময় বাড়ল। দুজনে চোখাচোখি করল। রোজা বলল, 'মা অবিশ্যি বলছিল, ও একটা বাউণ্ডুলে ছেলে, কত মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে।'

আমি হেসে বললাম, 'না, মানে—'

তার আগেই রোজা হেসে আবার বলে উঠল, 'মেরীর ধারণা, আপনি কোন স্কুপ নিউজের জন্য এখানে এসেছেন, আমাদের কথা তাই মনে নেই। আর—'

আমি কিছু বলবার চেষ্টা করছিলাম। রোজার চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক। ও লিজার দিকে একবার তাকাল। লিজা যেন ভয়ে ডেকে উঠল, 'রোজা!'

রোজা সকলের দিকে চেয়ে, আবার আমার দিকে তাকাল। বলল, 'লিজার কথা অবিশ্যি আমরা বুঝি না। ও বলছিল, যে যত বেশি মিষ্টি—'

লিজা আর একবার ডেকে উঠল, 'রোজা, কী হচ্ছে?'

রোজা বলল, 'আচ্ছা, সে কথাটা থাক। এ কথা তো বলেছিলি, উনি মুখ ফেরালেই পেছনের কথা সব ভুলে যান।'

রণোর রণরণে গলায়, চাঁছা ছোলা ইংরেজি শোনা গেল, 'একশো ভাগ সত্যি কথা, আমি সমর্থন করি। এবার, আপনি কী বলেছিলেন মিস রোজা, বলুন, তারপরে আমি আরো বলব।'

রোজা ওর রুপোলী তারায় আমাকে একবার বিঁধিয়ে বলল, 'আমি বলেছি, লোকটি হেসে ভোলাতে পারে।'

রণো বেজে উঠল, 'জবাব নেই, ওই যে দেখছেন, মিটি মিটি হাসছে, যেন কতই লজ্জায় পড়েছে, সব মিথ্যা। কেবল ভোলাবার তাল। ওকে আমি বহুকাল ধরে চিনি। মন বলে কিছু নেই, কিন্তু মনভোলানো কথা বলতে পারে।'

লিজা রণোর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'অশেষ ধন্যবাদ।'

রণোও বলল, 'আপনাকেও, আমি বুঝতে পেরেছি, ধূর্তটিকে আপনিও বোঝেন।'

লিজার মুখে এবার রঙের ছটা, চোখের কালো তারায় মেঘ উড়েছে, ঝিলিক দিচ্ছে। বলল, 'আপনার মত না হলেও অনেকটা বুঝেছি। ওঁকেও সে কথা বলেছি।'

মনে মনে বলি, চমৎকার রণো। কোন ব্যাপারেই তোমার জুড়ি মেলা ভার। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায়, গোয়ানিজদের সম্পর্কে কত সমালোচনা, সাবধানী সতর্কীকরণ। এখন দেখছি, সুর তাল সবই ভিন্ পর্দায় বাজছে। কেবল যে রণো, তা না,—সুরঞ্জনও।

সতর্কতা তারও ছিল। তবে রণো বলে কথা। নতুন সুরে গাইল, 'অবিশ্যি আগে আমি আপনাদের এতটা সরল সহৃদয় বলে, বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন দেখছি, আমার বন্ধুটি আপনাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে।'

আমি রণোর দিকে তাকালাম। রণো চোখের পাতা ছোট করে বলল, 'তোকে আমি চিনি না?'

বাবা, রণো চেনে না, চেনে কে? রোজা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একটা টেলিফোন করলে আমরা খুব খুশি হতাম।'

রণোই আবার তাল দিল, 'করবে কোত্থেকে, সেই কাগজ তো হারিয়ে ফেলেছে।'

রোজা লিজা দু বোনেই অবাক অবিশ্বাসে তাকাল। আমি লজ্জিত হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, সেই কাগজের টুকরোটা যে কোথায় রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না, তা না হলে তো—'

'টেলিফোন করতই।' রণোর বাত। লিজা রণোর দিকে চেয়ে যেন খুশি কৃতজ্ঞতায় হেসে উঠল। বলল, 'ওঁর সে কথা মনেও ছিল?'

রণো বিড়ি হাতে নিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ' আপনাদের কথাই তো খালি ভাবত।'

তারপরে অনায়াসে চার ইঞ্চি লম্বা বিড়িটা ধরিয়ে বাংলায় বলল, 'ওই জন্যেই তো বলি, ওর হাসিমুখ দেখলে ভুলে যাই, এক এক সময় প্যাঁদাতে ইচ্ছা করে।'

লিজা হাসতে হাসতে পিছনে হেলে পড়ল। চুলের গোছা ছড়ানো ওর পিছনে। মনে মনে ভাবি, তোমার তুলনা তুমি হে রণো। অবিশ্যি এও জানি, সবই বন্ধু-প্রীতির আলোয় ঝলকানো। তবে, ক্ষ্যাপাকে সাঁকো নাড়াতে দিলে, পারাপার চলবে না।

রোজা বলল, 'যাই হোক, আমরা কিন্তু আপনাকে নিতে এসেছি, মা পাঠিয়ে দিয়েছে। ফ্রেড-এরও আজ ছুটি আছে।'

লিজা চকিতে একবার আমাকে দেখে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ওঁর যদি কোনরকম অসুবিধা থাকে?'

আমি তাড়াতাড়ি একবার সুরঞ্জন আর নীলার দিকে দেখে বললাম, 'হ্যাঁ, আজ আমরা সবাই মিলে—'

নীলা ঠেক দিল, 'না না, তার কোন দরকার নেই। আমরা

যেকোনদিনই যেতে পারব। আপনি আজ এদের সঙ্গে যান। ক'দিন বাদেই তো কলকাতায় ফিরবেন!'

রণো প্রায় হুঙ্কার দিল, 'ওর ঘাড় যাবে।'

সুরঞ্জন বলল, 'হ্যাঁ, আজ ওদের সঙ্গেই যাও।'

একে বলে মানব-চরিত্র। এত ভয়, এত সন্দেহ, কোথায় গেল। দুটি মেয়ে এসে, সব উড়িয়ে নিয়ে গেল। চাক্ষুষের এই পরিণতি। আমি একবার লিজার দিকে তাকালাম। ও তাড়াতাড়ি আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। যেতে অসাধ অনিচ্ছা না। পাছে সুরঞ্জন নীলারা কিছু ভাবে, তা-ই একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলাম। রোজাকে বললাম, 'তা হলে ওঠা যাক।'

নীলা প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান মশাই, আমার বাড়িতে এসে, চা না খেয়ে যাবেন নাকি?'

বলেই, সে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

রণো বলে উঠল, 'এখন যে ওর মন ছুটছে।'

সবাই হেসে বাজল। কিন্তু রণোর চোপা বাঁধব, সে ক্ষমতা আমার নেই।

সুরঞ্জনের এলাকা থেকে, লিজাদের বাড়ি দূরে। শহরের এক ঘিঞ্জি প্রান্তে। ট্রেনে গিয়ে, শহরে নেমে গেলেই, সাধারণ ভাবে যাওয়া সহজ। সুরঞ্জন ওর গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়ে দিল। রোজা আগের থেকেই সামনে গিয়ে বসেছিল। আমি ওকে পেছনে এসে বসতে বলেছিলাম। ও জবাব দিয়েছিল, 'আমি সামনে বসতে ভালবাসি।'

সমুদ্রের বুকে ছিটকে যাওয়া একটা ফালি ডাঙা। তার নাম বোম্বাই নগরী। যত শেষের দিকে যায়, তত সমুদ্রের ধার ঘেঁষে রাস্তা। বালির চরে ঘর বাঁধা যায় না। এ ডাঙা পাথর মাটি বালি প্রকৃতির হাতে গড়া। উঁচুতে নিচুতে চলে। তার সঙ্গে মানুষের হাত পড়েছে, সমুদ্রকে তালে তালে রাখা।

সমুদ্রের দিকেই চেয়েছিলাম। আরব সাগর নাম। কাছে শান্ত, দূরে ফেনিলোচ্ছল রুপোলী হাসি। বাতাস ছুটোছুটি, তার সঙ্গে লিজার শাড়ি আর চুল। এক সময়ে হঠাৎ মনে হল, লিজা তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার তৎক্ষণাৎ আমার দিকে দেখল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ?'

লিজা আবার মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও বলল, 'আমাকে, 'আপনি' করে বলছিলেন কেন ?'

আগে কি ওকে আমি 'তুমি' বলেছি ? মনে করতে পারি না। হয়তো বলব বলে কথা দিয়েছিলাম।

লিজা আবার বলল, 'বেশি ভদ্রতা করলে, এড়িয়ে যাবার কথা মনে আসে।

হেসে, আন্তরিক ভাবেই বললাম, 'এড়িয়ে যাব কেন ?

'তবে কি বিরক্ত ?'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। আমি বললাম, 'একেবারেই না।'

বলে, আমি ওর কপালের রক্তসূর্য টিপটার দিকে তাকালাম। তারপরে ওর মুখ আর সমস্ত শরীরটার দিকে। শাড়ির রঙে জামা। মুখে যা-ই বলি, মন আর চোখের মুগ্ধতাকে ফাঁকি দিই কেমন করে। ট্রেনে ওকে ষে-পোশাকে দেখেছিলাম, তাতে খারাপ লাগে নি। কিন্তু দৃষ্টিকে এমন মুগ্ধ করতে পারে নি। লিজা নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ?'

আমি অকপট মুগ্ধতায় বললাম, 'খুব সুন্দর লাগছে।'

লিজা চোখের পাতা নামিয়ে বলে উঠল, 'উহ্, ভগবান !

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

লিজার নীচু স্বর শোনা গেল, 'এ যে বড় মিথ্যা কথা।'

বললাম, 'একটুও না।'

লিজা মুখ তুলল। ওর চোখকে বিশ্বাস নেই। আমার ডান দিকের সমুদ্রের ছায়া ওর চোখে ! বলল, 'কাছে এলাম বলে, না ?'

বললাম, 'না। এ বেশে তোমাকে যেখানেই দেখতাম, ভাল লাগত !'

'কী করে বিশ্বাস করব ?'

লিজা সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরাল। বাতাসে ওর গলা শোনা গেল, 'কোন কথা শোনা দূরের কথা, টেলিফোনটার দিকে চেয়ে চেয়ে—'

লিজার গলা বাতাসেই হারিয়ে গেল। চিবুকের নীচে ওর শ্যাম-স্নিগ্ধ গলাটা যেন কাঁপছে। এইটুকুকেই আমার ভয়। আমি জানি লিজার চোখ এখন সমুদ্র। ওকে কয়েক মুহূর্ত সময় দিলাম। তারপরে ডাকলাম, 'লিজা !'

লিজা ফিরল না। আঁচল উঠল ওর চোখে। ব্যাগটা পড়ে আছে গাড়ির আসনের ওপর। আরো একটু পরে লিজা ফিরে তাকাল। আর সে সময়েই, রোজার গলা শোনা গেল, আমি আর থাকতে পারছি না !'

চেয়ে দেখি, ও এদিকে চেয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন।'

অবাক হয়ে তাকালাম ! লিজার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। লিজা আমার দিকে চেয়ে, ভেজা হাসি হাসল ! আর চকিতে আমার মনে পড়ে যেতেই, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করে রোজার হাতে দিলাম। রোজা সেটা নিয়ে বলল, 'সেই কখন থেকে আপনাদের খাওয়া দেখছি।'

'সত্যি আমার খেয়ালই ছিল না !'

রোজা ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে বলল, 'আপনার তো কোন খেয়ালই থাকে না ! আপনার বন্ধু রণোবাবু আপনাকে ঠিক চেনে !'

লিজা, বলে উঠল, 'সত্যি !'

বলে, ও আমার দিকে তাকাল। গাড়ি সমুদ্রের ধার ছেড়ে, ঠাসা-ঠাসি ইমারতের সীমানায় ঢুকছে।

সারাটা দিন কাটল যেন একটা চড়ুইভাতির উৎসবে। ফ্রেডকে খুব ভাল লাগল। একটু যেন সংশয়ই ছিল, সে আবার আমাকে

কী ভাবে নেবে। কিন্তু সে একটি হাসি-খুশি যুবক। মুখটা অনেকটা রোজার মতই। বম্‌বেতে এসে, বিল্‌ বেশ মেজাজে আছে। কেবল ঠাকরুণেরই যত বকাবকি, ঝকাঝকি। আমাকে তো মারতে বাকী রেখেছেন। দেখা হতেই খালি এক কথা, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই পাজী ছেলে। ভালবাসার কোন দাম নেই তোমার কাছে। আমাদের একদিন মনেও পড়ল না?'

মনে মনে খুবই খুশি হয়েছেন। আমরা সবাই মিলে গল্প করলাম, রেকর্ডের গান শুনলাম। কেবল লিজার দেখাই কম পাওয়া গেল। ও রান্নার কাজে ব্যস্ত। ঠাকরুণ কতবার বললেন, শাড়িটা ছাড়তে। লিজার তাতে ঘোর আপত্তি। মেরী জোর করে এ্যাপ্রনটা বেঁধে দিয়েছিল।

রোজার বন্ধু, রিজ্‌ নামে একটি যুবকও এসেছে। ভাবতেই ভাব বোঝা যায়। রিজ্‌ যে ওর আঁতের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায়। রিজ্‌ আর রোজা, রেকর্ড বাজিয়ে নাচল। ফ্রেড নাচল মেরীর সঙ্গে। লিজা এসে দুবার তাল দিয়ে গেল, রিজ্‌ আর ফ্রেডের সঙ্গে। তাকিয়ে হাসল আমার দিকে। আর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বঙ্গসন্তানটি মুগ্ধচোখে দেখল। সব থেকে বেশি দেখল ঠাকরুণকে, যিনি, মুখে সিগারেট দিয়ে, পা ঠুকে ঠুকে তাল দিয়ে, গানের সঙ্গে গুণ গুণ করছিলেন। তারপরে এক সময়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'নাচতে পারত বটে সেই বুড়োমানুষটি, ফ্রেডের বাবার কথা বলছি। আমরা সারা রাত নেচেছি। এরা তো একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে।'

বলতে বলতেই ঠাকরুণের নিশ্বাস পড়ে। এবার শোন বাত, মন যায় কোথা থেকে কোথায়। আবার বললেন, কী জানি, কী করছে একলা একলা।'

ঠাকরুণের চোখে অন্যমনস্কতা। মন গিয়েছে সমুদ্রের আর-এক কূলে, গোয়ার এক গৃহের অঙ্গনে। বয়স কী কথা হে। এবে নারী পতি স্মরণ করেন।....

খাদ্য পরিবেশন হল প্রচুর। নিরামিষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে, চারপেয়ে পশু আর দুপেয়ে পাখীর মাংস তো ছিলই। কিন্তু একটি পাত্রের দিকে চেয়ে, আর চোখ ফেরাতে পারি না। কোথা থেকে এল এমন নয়ন ভোলানো। নয়ন থেকেই যে, জিভে সংবাদ যায়। এও কি

সম্ভব, ইলিশমাছের ঝাল দেখছি আমি। চোখ তুলে লিজার দিকে তাকাতেই, ওর শ্যাম-চিকন মুখে ছটা লেগে গেল। আমার এই বিস্ময়টা রোজা মেরীও উপভোগ করল। মেরী বলল, 'লিজা রেঁধেছে।'

আমার চোখের ওপর থেকে লিজাকে মুখ ফেরাতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কি ইলিশমাছ পাওয়া যায় নাকি?'

মেরী বলল, 'যায়। কেন, আপনার বাঙালী বন্ধুর বাড়ি খাননি?'

বললাম, 'না, সে সৌভাগ্য তো হয়নি।'

রোজা বলল, 'তবে, ওই ডিসটা একান্তই আপনার।'

হেসে বললাম, 'তার কারণ, আমি তো একটা কুমীর!'

রোজা হেসে বলল, 'অবিশ্যি লিজাও ভাগ বসাবে।'

সেটাই যা রক্ষে, মিথ্যা ভাষণে নেই, বাঙালী ঝাল হয় নি। নুন কম, মিষ্টি বেশি, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টাটা টের পাওয়া যায়। ইলিশ খাবার সময় লিজা তাকিয়েছিল। বললাম, 'বেশ ভাল।'

লিজা বাঙালী মেয়েদের মত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'মোটেই পারিনি। মিথ্যা কথা!'

'এমন অনেক বাঙালী মেমসাহেবও পারে না।'

লিজা বলল, 'আমি তো আর মেমসাহেব নই, আমি ভারত-বর্ষের একটা মেয়ে।'

কিন্তু লিজা না খেতে বসে, পরিবেশনেই ব্যস্ত। আমি শুধু দেখলাম, ওর দিকে চেয়ে, রিজ্‌ আর রোজার, মেরী আর ফ্রেডদের চোখাচোখি, হাসাহাসি। লিজার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। রাঁধুনির খাইয়েই সুখ।

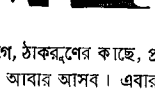

বিকালে বিদায়ের আগে, ঠাকরুণের কাছে, প্রায় দিব্যি গালতে হল, বম্‌বে ত্যাগের আগে, আবার আসব। এবার লিজা একলা আমাকে এগিয়ে দিতে এল। রিজ্‌কে ছেড়ে রোজা এখন বেরোবে না।

সুরঞ্জনের গাড়িটা আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাস্তায় এসে লিজা জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধুর বাড়িতে এখনই ফিরে যাবার দরকার আছে?'

বললাম, 'না।'

'তবে একসঙ্গে একটু বেড়াই।'

'চল।'

আমার পথ জানা নেই। লিজার পথেই চলি। একটা ভাড়াটে গাড়ি ডেকে, লিজা নিয়ে এল, নারকেলের ঘন নিকুঞ্জ সমুদ্রধারে। অচেনা নতুন তীর। মানুষের ভিড় কম।

কথা আমরা বেশি বলতে পারলাম না। সন্ধ্যের মুখে, লিজার চোখে যেন কেমন এক অপ্রস্তুত হাসি মাখানো ঝিলিক। কী যেন বলতে চায়। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পরে বলল, 'ট্রেনে আপনার একটা কথা শুনে, হঠাৎ চোখে জল এসে গেছল, প্রথমবার। সেই কথাটা বলব।'

মনে আছে, একজন বাঙালীকে বিয়ে করে, কলকাতায় ঘর-সংসার পাতার কথা বলেছিলাম। তখনই ওকে প্রথম ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। ওর কাছ থেকে শুনলাম, একটি বাঙালী ছেলেকে ও ভালবেসেছিল। হিমাদ্রি তার নাম। ওর বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই জানত, হিমাদ্রির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। ওর দাদা-বৌদিও তা-ই জানত। এমন কি ওদের সমস্ত পরিবার। আপত্তি সকলেরই ছিল। বিশেষ করে মায়ের। হিমাদ্রিও চেয়েছিল ওকে বিয়ে করতে।

এম. এ. পাস করার পরে, হিমাদ্রি আইন পড়া শুরু করেছিল। রাজনীতি সে বরাবরই করেছে। আইন পড়ার সময়, বেশি মেতেছিল। সেই সময় থেকেই, লিজার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। লিজা যত কাছে যেতে চেষ্টা করেছে, হিমাদ্রি তত সরেছে। তারপরে হিমাদ্রির সরে যাওয়াটা যখন বড় বেশি স্পষ্ট আর রূঢ় হয়ে উঠতে লাগল, তখন ও হিমাদ্রিকে বলেছিল, কেন সে এমন করে সরে যাচ্ছে? হিমাদ্রি জানিয়েছিল, তার জীবনের সঙ্গে, লিজার জীবনের অনেক তফাৎ। হিমাদ্রির জীবন উৎসর্গ বিপ্লবের জন্য। লিজা সেখানে নেই।

লিজার প্রশ্ন, কেন নেই? লিজার জীবনও কি বিপ্লবে উৎসর্গ

করা যায় না? না, হিমাদ্রির তা-ই বিশ্বাস। সোজা বুঝতে পেরেছিল, হিমাদ্রি সত্য বলছে না। ভারতের বিপ্লবে লিজা থাকবে না কেন? হিমাদ্রির এমন বিচিত্র উদ্ভট বিশ্বাস কেন? লিজার নিজের ভাষা, 'আমি আর হিমাদ্রিকে জোর করিনি। কারণ তারপরে জোরটা বড় অপমানের। কিন্তু চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেছল। হিমাদ্রিকে আমার পক্ষে কোনদিনই ভোলা সম্ভব না। আসলে ওর মধ্যে একটা অন্য বাঙালী সত্তা দেখেছিলাম বলেই, অল্প বয়স থেকে, ওর দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারিনি।...তবে হিমাদ্রিকে আমি ভুলব না কোনদিনই। ওর ছেড়ে যাওয়াটাই, জীবন সম্পর্কে আমাকে অনেক বুঝতে শিখিয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

শুনতে শুনতে, লিজা-হিমাদ্রিতেই ডুবেছিলাম। চমকে উঠে বললাম, 'বল।'

'আমি কি সত্যি রাজনীতিতে বাধা?'

'ভারতের কোন রাজনীতিতেই তুমি বাধা হতে পার বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

লিজা হাসল, সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকাল। বিষণ্ণতা ওর চোখে নেই, কিন্তু ব্যথা ধরা একটা হাসির ঝিলিক আছে। সন্ধ্যা-রাত্রের দূরের সমুদ্রের মত, যেখানে গভীর জলাশয়, দূরত্বে দোলে না, কেবল আকাশে মেশে। আমি হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লিজা, আমাকে এ কথা কেন বললে?'

লিজা মুখ ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল। যেন কিছু দেখল। আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে বলল, 'জানি না। লজ্জা করছে, তবু বলি, নির্লজ্জের মত প্রথম দিনই বলতে ইচ্ছা করেছিল। কেন, তা আমি জানি না।,

আমি সহসা আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। আমিও সমুদ্রের দূরে তাকালাম। সেখানেও যেন এই মুহূর্তে আমি লিজাকেই দেখতে পেলাম। আপাতদৃষ্টিতে, এই ভারত-পর্তুগীজ মেশানো মেয়েটিকে দেখলে, ওর পোশাক, চেহারা, বেশবাস, ভাবভঙ্গি, মনে হবে, নিতান্ত মন-রাঙানো, হালকা একটি মেয়ে। এমন কি, ওর কোন কোন কথাও। কিন্তু আমি যেন অনুভব করছি, তার কিছু বেশি না, অনেক কিছু বেশি। ওর মত একটি রূপসী যুবতী

ইংরেজি জানা গোয়ানিজ মেয়ে, স্বাভাবিক ভাবেই, হেসে রঙ্গ করে, জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। যে-জগৎটা আমাদের অচেনা না। কিন্তু লিজা সেই জগতে নেই। এর ভিতরে কোথাও একটা গভীর সমস্যা আছে। আপাতত সে সমস্যা ব্যক্তিগত হলেও, তা সমাজের এবং দেশের প্রশ্নে জড়িত। কারণ, ও বারে বারে একটি কথা বলেছে, ও 'ভারতের মেয়ে'। এ অনুভূতিটা-ই সম্ভবত লিজার সকল সমস্যার মূলে। বাংলা ভাষায় কথা বলা বা তার চর্চাটা নিতান্ত একটা প্রাদেশিক ভাষায় প্রতি আকর্ষণ বলেই না। বোধহয়, আরো গভীর কিছুর সঙ্গে জড়িত ওর হিমাদ্রিকে বিবাহ করতে চাওয়া।

হঠাৎ মনে হল, আমার চোখের সামনে অন্য কিছু। তাকিয়ে দেখি, লিজার দুটি চোখ। ও অনায়াসে জিজ্ঞেস করল, 'একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

লিজার সম্বোধনটা এত স্বাভাবিক মনে হল, কোথাও এতটুকু ধাক্কা লাগল না। বললাম, 'আমার জানতে ইচ্ছা করল। আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি হিমাদ্রিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে কেন?'

লিজা যেন অবাক হল, বলল, 'হিমাদ্রিকে আমি ভালবেসেছিলাম।'

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় আমি লিজার চোখের দিকে চেয়েছিলাম। লিজাও। এক মুহূর্ত পরেই লিজার চোখে যেন চকিত ঝলক হানল। বলল, 'আমি জানি, তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলে। তবে বলি শোন, পুরুষের রূপ গুণ বলতে যা বোঝায়, হিমাদ্রির সবই ছিল। একটি মেয়ে হিসাবে তাকে ভালবাসাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বোধহয় আরো বেশি কিছু চেয়েছিলাম। হিমাদ্রিদের পরিবারে, ওর মা বৌদি, সবাইকে দেখে আমার মনে হত, সেই জীবনের ওপর আমার কেমন একটা আকর্ষণ। ভেব না যেন, তাঁদের দেব-দেবী ব্রত পূজো, এসবের ওপর আমার কোন মোহ ছিল। ভারতবর্ষ কেবল দেব-দেবী ব্রত পূজা দিয়েই ভরা নয়। ওটা যেন একটা খোলশ, বাইরের ব্যাপার। আরো ভেতরে কিছু আছে। হিমাদ্রিকে বিয়ে করে আমি সেই আরো কিছুর তল্লাসে যেতে চেয়েছিলাম।'

লিজা এমন ভাবে থামল, যেন ও আরো কিছু বলতে চাইছিল, বলল না। মাথা নীচু করে যেন একটু হাসল, আবার বলল, 'হিমাদ্রি বলত, আমার কথা নাকি ও সব বুঝতে পারে না, ধারণা, আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণা আছে। পরে অবিশ্যি ও, ওদের স্বজাতি এক ধনী অ্যাডভোকেটের মেয়েকে বিয়ে করেছে, তবে বিপ্লবের রাস্তা থেকে নাকি সরে আসে নি! ও যাই করুক, আমাকে বিয়ে করলে, ভাল হত না ঠিকই। ওর মা বৌদির ওপর আমার যে আকর্ষণ, সেটা তাঁদের বিশ্বাস, কষ্ট সহ্য ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা। আমি কিন্তু ঠিক ভারতবর্ষের কোন হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের ঘোমটা ঢাকা বৌ হতে চাই নি।'

লিজা যেন অস্বস্তিতে একটু হাসল, বলল, 'আমি বোধহয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি সন্ন্যাসিনী হতে চাইনি, সেটা পরিষ্কার, কিন্তু আমি আমার দেশকে জানতে চাই, বুঝতে চাই। সেটা খুব সহজ কাজ না। কেবল বই পড়ে তা সম্ভব না, কেন না, কেবলি মনে হয়, কোথায় কোন্ দূরের ওপারে রহস্যের মত একটা কিছু আছে। না না, আমি ঘরে থাকতে চাই না, আমি আমি—'

লিজা কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। হাসল, যেন স্বপ্নের ঘোরে, ফিস ফিস করে বলল, 'আমিও প্রয়াগের মেলায় যাব, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে মেশে।'

এই মুহূর্তে যেন আমিও একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেলাম। সহসা মনে হল, আমার ভিতরের ভাষা সুর ও স্বরের সঙ্গে কোথায় যেন লিজা একাকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হল, আমার মন যেমন নাচে, 'মন চল যাই ভ্রমণে'র সুরে আর তালে, সেই সুর আর তাল যেন, লিজার ভিতরেও বাজছে। হাতের স্পর্শে ফিরে তাকালাম। লিজা আমার একটা হাতের ওপরে, ওর হাত রেখেছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছ?'

বললাম, 'মনে হয়। কিন্তু লিজা, তোমার পক্ষে এটা সুখ বা স্বস্তি, কোনটাই নিয়ে আসবে না।' লিজা আমার হাতটা যেন আর একটু জোরে ধরল। বলল, 'কিন্তু দুঃখের মধ্যেও কোথাও একটা সুখ আছে। সেই দুঃখটা ভোগ করার শক্তি আমার কাছে।'

লিজা আমার চোখের দিকে তাকাল, ঝুঁকে এল কাছে। সমুদ্রে

তরঙ্গ ভাঙছে, নারকেলের পাতায় পাতায় ঝাপটা ঝিরিঝিরি। লিজা বলল, 'কিন্তু সেই সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। তুমি আমাকে একটা কথা দাও।'

লিজার কথায় যেন রহস্য। কিন্তু আমার বুকের তালে বেতাল। বললাম, 'বল ?'

'যেখানেই থাক, আমাকে ত্যাগ করো না। আমি জানি, তোমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না, আমি এসব উদ্ভট চিন্তাও করি না, চাইও না। যোগাযোগ রেখো। যদি কখনো ছুটে যাই, যেন দেখা পাই।'

আমি কথা বলতে পারি না, কেবল ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও আবার বলল, 'আমার কথা বুঝতে পারছ না, এমন একটা ভাব করো না। আমি তোমাকে নিতান্ত মেয়ে-পুরুষের মিলের কথা বলছি না। কিন্তু তোমাকে আমি চিনি, বুঝি, তুমি আমাকে বুঝবে, শুধু এই কারণে।'

বললাম, 'তোমার যদি শ্রেয়ঃ মনে হয়, তবে তাই হবে।'

লিজা হঠাৎ অবাক হয়ে পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। ও হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল ঘাসের ওপর, আমার একটা হাতের ওপরে মুখ চাপল। একটু পরে হাসির শব্দ বন্ধ হল। কিন্তু টের পেলাম, আমার হাতে, উষ্ণ জলের ফোঁটা পড়ছে। আমি ডাকলাম, 'লিজা।'

লিজা উঠল, চোখ মুছল, কিন্তু হাসিমুখেই বলল, 'কী মিথ্যুক তুমি। আমি যা শ্রেয়ঃ মনে করব, তুমি বুঝি তা-ই মানবে ? তুমি মিথ্যুক, কপট, নিষ্ঠুর। তবু, তোমার কথাটাকেই মাথায় করে রাখলাম।'

তারপরে যে কয়দিন এই নগরীতে রইলাম, প্রায় প্রতিদিন বি কালটা কাটল লিজারই সঙ্গে, নানান নিরালা সাগরকূলে। চলে

যাবার আগের দিন, লিজা জানাল ও আমার সঙ্গে ইস্টিশনে দেখা করতে আসবে না। তাই মাউন্ট মেরীর নীচে, সমুদ্রের ধারে, ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

ফিরে আসবার কয়েক দিন আগেই, রণো বলেছিল, কৃষ্ণটা জ্বরে ভুগছে। আসবার আগের রাত্রে রণো বলল আমাকে, 'আমি জানি না, কেষ্টটা বাঁচবে কী না। খালি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইছে। তুই কি ওকে নিয়ে যাবি ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি ?'

রণো করুণভাবে অনুরোধ করল, 'টাকা-পয়সা সব তোকে আমি দেব। কোনরকমে যদি হাসপাতালে দিয়ে দিতে পারিস। বেঁচে উঠলে না হয় বাংলাদেশ দেখবে।'

এই সেই রণো। বজ্রের হুংকার ছাড়া যে কথা বলে না, তার চোখও যেন কেমন রঙ বদলায়। ও পকেট থেকে টাকা বের করল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে বললাম, 'থাক। তুই ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে যাস, তা হলেই হবে।'

মনে মনে ভাবলাম, ফেরার যাত্রাটা কৃষ্ণ নিয়ে। 'মনশ্চল যাই ভ্রমণে, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' কৃষ্ণ-ই আমার সঙ্গে।

পরের দিন কৃষ্ণকে রণো গাড়িতে তুলে দিল। কৃষ্ণর কালো মুখটা ফ্যাকাশে, ডাগর চোখ দুটো হলুদবর্ণ। কিন্তু আমাকে দেখে যখন হাসল, দেখলাম, হাসিটা তেমনি আছে। অনেকেই তুলে দিতে এসেছিল, সুরঞ্জন, নীলা, বিধান, বিমান। কৃষ্ণ আমার সহযাত্রী, এটা অনেকেরই বোধহয় ভাল লাগল না।

গাড়ি ছাড়বার কয়েক মিনিট আগে লিজা এল। অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো আসবে না বলেছিলে।'

'পারলাম না থাকতে।'

বন্ধুদের সামনে আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। লিজা বলল, 'আমি গাড়ির ভিতরে বসছি। তুমি কথা বলে এস।'

আমি গাড়ির মধ্যে গেলাম। ভাবলাম, লিজা কিছু বলবে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বললাম, 'কিছু বলবে ?'

লিজা যেন অবাক হয়ে বলল, 'না তো। গাড়ি ছাড়বার সময় হলেই চলে যাব। একটু দেখতে এলাম।'

আমি আবার বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে, কৃষ্ণর দিকে চোখ

পড়ল। কৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে হাসল। জ্বরের জন্যই বোধহয় চোখ দুটো ছলছলে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলছ কৃষ্ণ?'

কৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে হাসল। লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?'

বললাম, 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

লিজাকে কৃষ্ণর কথা বললাম। লিজা কৃষ্ণর দিকে দেখে, আমার দিকে তাকাল। দেখলাম, ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখে হাসি। বলে উঠল, 'আমাকেও কি তুমি এমন করে নিয়ে যেতে?'

বললাম, 'তুমি তো কৃষ্ণ নও, তোমাকে এমন করে নিয়ে যেতে হবে কেন?'

লিজার চোখ জলে চিক চিক করে উঠল, অস্পষ্ট গলায় বলল, 'জানি।'

গাড়ি দুলে উঠল। লিজা আমার হাত চেপে ধরল। বলল, 'আসলে এই যে কৃষ্ণকে নিয়ে তুমি যাচ্ছ, তোমার মধ্যে এই মানুষটাকেই দেখতে আর বুঝতে চেয়েছি।'

কৃষ্ণর মাথায় একবার হাত দিয়ে লিজা নেমে গেল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ মুহূর্তে লিজা এসে, বন্ধুদের সঙ্গে বিদায় পর্বটা জমল না। লিজা তাকিয়ে রইল। ওর চোখে জল। ফিরে দেখি, কৃষ্ণর চোখ দুটো জলে ভাসছে।

এই প্রথম অনুভব করলাম, আমার চোখ দুটোও যেন টন টন করে উঠল। দৃষ্টি ঝাপসা, লবণাক্ত স্বাদ আমার জিভে।